বঙ্গভাষা

ও

বঙ্গসাহিত্যের

ক্রমবিকাশ

প্রথম ভাগ
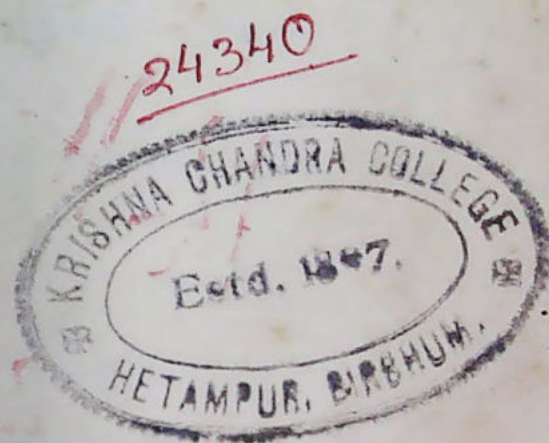
সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ্-ডি

প্রণীত

—

প্রকাশক—শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ্-ডি

বিশ্বকোষ প্রেস

প্রিণ্টার—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন

৯ নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

দাম আড়াই টাকা।

যিনি

মাতৃভাষাকে ‘শিক্ষার বাহন’ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের পথ সুগম করিয়াছেন

যাঁহার

অনুগ্রহে আমার কর্ম্মজীবনের নোতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়

সেই

আমার অহেতুক হিতৈষী পরম শ্রদ্ধাস্পদ

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

এম-এ, বি-এল্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম্. এল্. এ.

মহোদয়ের প্রতি

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

আমার মাতৃভাষা সেবার ফল

তাঁহাকে

...রলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

ভূমিকা।

১৯২৮ সাল। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী (অধুনা মহামহোপাধ্যায়) মহাশয়ের সঙ্গে শান্তি-নিকেতনে গিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। সেখানে যাইয়া বিদ্যাভবনে (Research Institute) ভর্ত্তি হইলাম। তখন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁহার অধীনে থাকিয়াই আমাকে কাজ করিতে হইয়াছিল। পর বৎসর শিক্ষাভবনে (College Department) সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ খালি হইল। পূজনীয় গুরুদেব (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে উক্তপদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাভবনের কাজের ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে জানিয়াও তাঁহারা আমাকে বিদ্যাভবনে রীতিমত কাজ করিবার সম্মতি ও সুযোগ দিয়াছিলেন। এই সুবিধা না পাইলে আমি পি এইচ্-ডি উপাধির নিবন্ধ লিখিতে এবং মাতৃভাষার সেবা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। এক কথায় বলিতে গেলে শান্তিনিকেতনই আমার সাধনা-ক্ষেত্র, গুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় এবং উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র-নাথ ঠাকুর। আজীবন এই কথাটি আমার মনে থাকিবে। আজ আমি এই তিন পরম উপকারককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি এবং শান্তি-নিকেতনকে স্মরণ করিয়া কবিগুরুর ভাষায় বলিতেছি—

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে'
সে-যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।"

শিক্ষাভবনে আমার উপর সংস্কৃত ছাড়া বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পড়াইবার ভার পড়িয়াছিল। মাতৃভাষার সেবা করিতে পারিব ভাবিয়া নিজের অযোগ্যতা সত্বেও এই বিষয় অধ্যাপনার ভার সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলাম। পড়াইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি এসম্বন্ধে অনেক পুস্তক এবং বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। দীনেশ-বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং বিজয়বাবুর 'The History of the Bengali Language' নামক পুস্তক পড়িতে পড়িতে দেখিতেছিলাম, তাঁহাদের পুস্তকে বিস্তর ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এই সকল সমাধানের জন্য যে-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম, তাহারই ফল সাধারণের এবং সুধী-সমাজের নিকট উপস্থিত করিলাম।

পুস্তকরচনাকালে যাঁহাদের সাহায্য ও উপদেশ লাভে উপকৃত হইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে আমার শিক্ষা-গুরু পরম ভক্তিভাজন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ্-ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্, এবং বঙ্গীয় শব্দকোষের সঙ্কলয়িতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিবার সময় সবচেয়ে বেশী সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি বিদ্যোৎসাহী কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট। আমি বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ছাপাইতেছি জানিয়া তিনি সর্ব্বদা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং যখনই দেখা হইয়াছে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পুস্তকের ছাপা শেষ হইতে আর কত দেরি? আমি উত্তর দিয়াছিলাম, চার-পাঁচ মাসের মধ্যে শেষ হইবে। কিন্তু নানা কারণে বড় বেশী বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কাজেই লজ্জায় গত পূজার পর হইতে আমি আর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই নাই। আজ পুস্তকখানির প্রথম ভাগের ছাপা শেষ হইল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমার এই সামান্য পুস্তক তাঁহার করকমলে সমর্পণ করিয়া সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

পুস্তক রচনার সময় আমি যে সকল গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অনেককে পুস্তক প্রকাশের অনুরোধ করিয়া কোনো সাড়া পাই নাই। অবশেষে বিশ্বকোষ-প্রেসের স্বত্বাধিকারী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় তখন ছিল না। এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার যে পরিচয় হইয়াছে তাহা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সহৃদয়-সৌজন্য এবং অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি অতি অল্প খরচে পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধন করিয়াছেন।

অর্থাভাবে পুস্তকখানি ইচ্ছামত ছাপাইতে পারিলাম না। অনেক কিছু বাদ দিয়াছি। পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিবর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা রহিল। পুস্তকে অনিচ্ছাকৃত নানারূপ ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে; সুধীবৃন্দ সংশোধনে সাহায্য করিলে চির-কৃতজ্ঞ থাকিব। অনেক চেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানি নির্ভুল করিয়া ছাপাইতে পারিলাম না, আশাকরি সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

আশুতোষ কলেজ,
কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল। } শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

সূচীপত্র।

অষ্টম স্তবক

নবম স্তবক

দশম স্তবক

বঙ্গভাষা

ও

বঙ্গসাহিত্যের

ক্রমবিকাশ

—:০:—

প্রথম স্তবক

বঙ্গদেশ

প্রাচীন কালে বঙ্গ বলিতে বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে বুঝাইত এবং তজ্জন্য এখনো পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা বাঙ্গাল নামে পরিচিত। ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগেও যে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে বাঙ্গাল বলা হইত তাহার প্রমাণ পাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম পূর্ব্ববঙ্গের নাবিকদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—

"কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥"

—(নাবিকদিগের রোদন)।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে বঙ্গ বলিতে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকেই বুঝায়। ঋগ্বেদে বঙ্গ শব্দের কোনো উল্লেখ নাই। ঐতরেয়-আরণ্যকে সর্ব্বপ্রথম এই শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—

"প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ং-স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।—২।১।১॥

আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিমসীমান্তের পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। কালক্রমে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল দেশই জয় করিলেন। বিজিত প্রদেশ-সমূহে তাঁহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিল। কিন্তু প্রাচ্য প্রদেশকে তাঁহারা সহজে জয় করিতে পারিলেন না। মগধ ও বঙ্গ অনেক কাল পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এই পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই আন্দোলনের ফলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচ্য প্রদেশের ধর্ম্ম, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। এজন্য গর্ব্বিত আর্য্যেরা পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে পক্ষিজাতীয় মনুষ্য (বয়াংসি) বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহাতেও আর্য্যেরা বিরত হইলেন না, তাঁহারা বিধি

করিলেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশে তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোনো কারণে গেলে আত্মশুদ্ধির জন্য পুনরায় সংস্কার আবশ্যক হইবে। যথা—

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে গেলে যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠানদ্বারা শুদ্ধিলাভের ব্যবস্থা বৌধায়ন-ধর্ম্মশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।—

"আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্ প্রানূনানিতি চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত সর্বপৃষ্ঠয়া বা।"—১।১।২।১৪॥

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ আর্য্যগণকর্ত্তৃক বিজিত হওয়ার বহুকাল পরেও মগধ ও বঙ্গের আদিম অধিবাসীরা আর্য্যজাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই। তখন পর্য্যন্ত এই দুইটি দেশ আর্য্যাবর্ত্তের সীমাভুক্ত হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যজাতিদ্বারা মগধ ও বঙ্গ বিজয়ের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; কাজেই কখন যে আর্য্যগণ মগধ ও বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় শক্ত।

বঙ্গদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। এক কালে বাঙ্গালীরা প্রবল-পরাক্রমশালী ছিল। জলে স্থলে তাহাদের অধিকার ছিল। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ৯০ম অধ্যায়ে আছে, বঙ্গসেনা হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিত;—

"কুঞ্জরৈর্দশসাহস্রৈর্বঙ্গানামধিপঃ স্বয়ম্।
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য গজানীকেন সংবৃতম্॥"

বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ; কাজেই বাঙ্গালীরা নৌচালনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। বঙ্গদেশে বড় বড় নৌ-বাহিনী ও নৌ-সেনা ছিল। কালিদাসের রঘুবংশে এবিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়;—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"—৪।৩৬॥

বঙ্গদেশে বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। প্রাচীন কালে এই দেশের সঙ্গে অন্যান্য বহির্দেশের বাণিজ্য-সূত্রে যোগ ছিল। এই দেশ হইতে নানা ধরণের পণ্যদ্রব্য সমুদ্রপথে সিংহল, যাবা, সুমাত্রা, বলি প্রভৃতি স্থানে যাইত। পরবর্ত্তী কালে এই বঙ্গদেশের মারফৎ হিন্দুধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই সকল দ্বীপে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। একদিন বঙ্গেশ্বরেরই এক ত্যাজ্যপুত্র বিজয়সিংহ সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে লঙ্কা সিংহল নামে অভিহিত হইয়াছে। রামায়ণে সিংহল কথার কোনো উল্লেখ নাই, শুধু লঙ্কার নাম আছে; কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে লঙ্কার স্থান সিংহল অধিকার করিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, আর্য্য-রাজগণ বঙ্গেশ্বরের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ

করিতেন। বাঙ্গালীরা যদি সত্য সত্যই অসভ্য হইত, তাহা হইলে আর্য্যরাজগণ কখনো বঙ্গেশ্বরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না।

ইউয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, সমতট দেশের (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজপুত্র মহামতি শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) মহাস্থবির (অধ্যক্ষ) ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৌদ্ধাচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে তথায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের গৌরব যে, এই দুই মহাত্মাই বাঙ্গালী। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া মনে হয়, এককালে বাঙ্গালীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য প্রতিভার খ্যাতি দেশবিদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

সমতট বলিতে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইত। ইউয়ান্-চোয়াঙ্ কামরূপ হইতে দক্ষিণ দিকে সমতটে আসিয়াছিলেন। এই দেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহার নাম সমতট। ইউয়ান্-চোয়াঙ্ সমতটের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের নাম করেন নাই। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে, কিন্তু সমতট সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। মৎস্যপুরাণে ১৪৪শ অধ্যায়ে বঙ্গের নাম আছে, কিন্তু সমতটের উল্লেখ দেখা যায় না। যথা—

অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরি-বহির্গিরী।
সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয়মালবাঃ॥
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শাল্ব-মাগধ-গোনর্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥—৪৪,৪৫॥

বৃহৎসংহিতায় ১৪শ অধ্যায়ে শুধু সমতটের নাম পাওয়া যায়—

খসমগধশিবিরগিরি-
মিথিলসমতটোড্রাশ্ববদনদন্তুরকাঃ।
প্রাগ্জ্যোতিষলৌহিত্য-
ক্ষীরোদসমুদ্রপুরুষাদাঃ॥—৬।

আবার উক্ত পুস্তকের ১৬শ অধ্যায়ে কেবল বঙ্গের উল্লেখ আছে। যথা—

প্রাঙ্নমদার্ধশোণোড্র-
বঙ্গসুহ্মাঃ কলিঙ্গবাহ্লীকাঃ।
শকযবনমগধশবর-
প্রাগ্জ্যোতিষচীনকাম্বোজাঃ।—১।

এই সকল হইতে বুঝা যায়, প্রাচ্যদেশসমূহের নাম করিবার সময় যেখানে বঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে আর সমতটের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। আবার যেখানে সমতটের উল্লেখ আছে, সেখানে আর বঙ্গের নাম করা হয় নাই। সুতরাং বঙ্গ ও সমতট যে একই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু বঙ্গ ও সমতটের ভৌগোলিক বর্ণনা হইতে দেখা যায়, উভয় দেশ একই স্থানে অবস্থিত; কাজেই উভয়েই অভিন্ন।

বঙ্গ শব্দের অর্থ কি, তাহা সংস্কৃত হইতে বুঝা যায় না। এই শব্দটি সংস্কৃতমূলক নহে। ইহা তিব্বতী 'বঙ্স্' (উচ্চারণ 'বঙ্') শব্দ অর্থাৎ 'জলা ও নিম্ন (ভূমি)' হইতে আসিয়াছে বলিয়া

মনে হয়। বঙ্গদেশের ভূমি জলা ও নীচু বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম বঙ্গ (<তিব্বতী 'বঙ্‌স্') হইয়াছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে অনেকবার ১৬টি রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গেরও নাম আছে। উক্ত পুস্তকে কেবলমাত্র একটিবার বঙ্গের উল্লেখ আছে, অন্যত্র বঙ্গের স্থান 'বংস' অধিকার করিয়াছে। যথা—

অঙ্গানং মগধানং কাসীনং কোসলানং বজ্জীনং মল্লানং চেতীনং বঙ্গানং কুরূনং পঞ্চালানং মচ্ছানং সুরসেনানং অস্‌সকানং অবন্তীনং গন্ধারানং কম্বোজানং......... ।

—মহাবগ্‌গ, ১০।১৭ ॥

অন্যত্র—

অঙ্গানং মগধানং কাসীনং কোসলানং বজ্জীনং মল্লানং চেতীনং বংসানং কুরূনং পঞ্চালানং মচ্ছানং সুরসেনানং অস্‌সকানং অবন্তীনং গন্ধারানং কম্বোজানং............ ।

—উপোসথবগ্‌গ, ২।৪;৩।৪;৫।৪ ।

আমাদের মনে হয়, এই 'বংস' (=বঙ্গ) তিব্বতী 'বঙ্‌স্' শব্দের আক্ষরিক উচ্চারণের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

বঙ্গের আর এক নাম বাঙ্গালা। এই শব্দের উৎপত্তি লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। আবুল ফজলের মতে পূর্ব্বে বঙ্গ আল দিয়া ঘেরা ছিল বলিয়া উহার নাম বাঙ্গালা (বঙ্গ+আল) হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বঙ্গ+আলয়=বঙ্গালয় এবং ইহার অপভ্রংশে বাঙ্গালা হইয়াছে। এই উভয় মতই আমাদের নিকটে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। একাদশ শতাব্দীতে তিরুমলয়পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে বঙ্গদেশের স্থানে 'বঙ্গালম্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই 'বঙ্গালম্' হইতে 'বাঙ্গালার' উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গালমের প্রথম অংশ অর্থাৎ 'বঙ্গ' তিব্বতী 'বঙ্‌স্' হইতে এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'আলম্' দ্রাবিড় ধাতু 'আল্' হইতে আসিয়াছে। সুতরাং বঙ্গালমের অর্থ 'জলা ও নীচু প্রদেশ'; তুলনীয়, মলয়ালম্ [দ্রাবিড়, মল (=পর্ব্বত)+য (য-শ্রুতি)+আলম্] অর্থাৎ 'পার্ব্বত্য প্রদেশ'। বাঙ্গালার অধিবাসী এই অর্থে বাঙ্গালী হইয়াছে—বিহারী, নেপালী ইত্যাদি তুলনীয়।

দ্বিতীয় স্তবক

বঙ্গভাষার উৎপত্তি

ভাষা চিরকাল একভাবে থাকে না—পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক জগতে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা গুল্মাদি যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে অলক্ষিতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ভাষাজগতেও তেমনি ভাষার পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে যাহারা ভাষার ব্যবহার করে তাহারা এই পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি করিতে পারে না—

যদিও এই পরিবর্ত্তন তাহাদেরই মারফৎ হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম এই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু অনেক কাল পর পূর্ব্ব-সংরক্ষিত ভাষার সহিত পরবর্ত্তী কালের ভাষার তুলনা করিলে পরিবর্ত্তন সহজেই ধরা পড়ে। এই পরিবর্ত্তন ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে—ইহাই ভাষার সজীবত্বের লক্ষণ। কোনো সজীব ভাষাতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই এবং হইতেও পারে না; অন্যথা সে ভাষা মৃত।

সাধারণত ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—লেখ্য বা সাহিত্যের ভাষা এবং কথ্য বা জনসাধারণের কথিত ভাষা। আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহারা কথ্য ভাষাকে অটুটভাবে সাহিত্যে স্থান দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বলেন, "আমরা যে ভাষায় কথা বলি, সাহিত্য লিখিব সেই ভাষায়"। কিন্তু কথ্য ভাষাকে হুবহু সাহিত্যে স্থান দেওয়া অসম্ভব। লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষার যথার্থ প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করা মস্ত বড় ভুল। আমরা যে ভাবে কথা বলি, যথাযথ সে ভাবে কখনো লিখিতে পারি না। লেখ্য ভাষা একটি বিশিষ্ট ভাষার (Standard Language) বিশেষ বিকাশ। কথ্য ভাষার সঙ্গে তাহার কোনো-না-কোনো স্থানে পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে। কথ্য ভাষার উপর নির্ভর করা চলে না। কারণ তরল পদার্থের মত তাহার কোনো বিশেষ রূপ নাই। তরল পাদর্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি কথ্য ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। যত মানুষ তত ভাষা। এজন্য একভাষাবলম্বী হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির ভাষা স্বতন্ত্র; তবে ভাষার মূল ধারা এক বলিয়া এবং এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য, তাই ভাষার এই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। নতুবা একভাষা হইতে একই সময়ে অসংখ্য উপভাষার সৃষ্টি হইত।

কথ্য ভাষা বিশুদ্ধ হইয়া সাহিত্যে স্থান লাভ করিবামাত্র নির্ব্বিকার হইয়া পড়ে। তখন তাহার আর রূপান্তর হয় না, সে অজর ও অমর। সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক সাহিত্য আজো সে-যুগের লেখ্য ভাষার নিদর্শন অক্ষতভাবে বহন করিতেছে। কিন্তু সে-যুগের কথ্য ভাষা ভিন্ন-ভিন্ন যুগে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এমন এক আকৃতি ধারণ করিয়াছে যে, তাহার মূলের খোঁজ করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। কথ্য ভাষা পরিবর্ত্তনশীল; কাজেই সে বহুরূপী। আবার কথ্য ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখ্যভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কারণ কথ্য ভাষা মার্জ্জিত হইয়া লেখ্য ভাষায় পরিণত হয়। এজন্য একযুগের লেখ্য ভাষার সহিত পরবর্ত্তী যুগের লেখ্য ভাষার অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

জগতের সকল ভাষায় সাহিত্যের ভাষা ও কথোপকথনের ভাষার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈদিকযুগেও সাহিত্যের ভাষা ও কথ্য ভাষার মধ্যে এইরূপ একটা প্রভেদ ছিল। সে-কালে যে ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত

হইত তাহাকে "আর্ষ অপভ্রংশ" নাম দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে আর্ষ অপভ্রংশের রীতি ও শব্দসমূহ মাহেশ, যাস্ক, পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণের ব্যাকরণসূত্রের প্রভাবে সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপে লৌকিক সংস্কৃত নামক ভাষান্তরের সৃষ্টি হইল। আবার উক্ত আর্ষ অপভ্রংশ হইতে পালি* বা প্রাচীন প্রাকৃত অপভ্রংশের জন্ম হইয়াছে এবং এই পালি অপভ্রংশ বিশুদ্ধ হইয়া সাহিত্যের পালি হইয়াছে। উক্ত পালি অপভ্রংশ হইতে প্রাকৃত অপভ্রংশের উৎপত্তি এবং এই প্রাকৃত অপভ্রংশ মার্জ্জিত হইয়া সাহিত্যের প্রাকৃত হইয়াছে। প্রথমে বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকগুলি পালি ভাষায় লিখিতেন এবং জৈনেরা ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিতেন। এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীরা সংস্কৃত ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং পালি ও প্রাকৃতের নিন্দা করিতেন। কালক্রমে ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রশমিত হইয়া উক্ত তিন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক দলাদলি বর্জ্জন করিয়া উদারনীতি গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈনেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং উক্ত ভাষাকে তাঁহাদের সাহিত্যে স্থান দিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃত্রিম নিয়ম মানিলেন না। ইহার ফলে তাঁহাদের সংস্কৃত প্রাকৃত-ঘেঁষা হইয়াছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিচিত্র সংমিশ্রণে গাথা নামে একটি কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

---

* পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় পালিপ্রকাশ নামক পুস্তকে 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংস্কৃত 'পঙ্‌ক্তি' হইতে 'পালি'র উৎপত্তি এবং ইহার পরিবর্ত্তনক্রম এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছেঃ— পঙ্‌ক্তি, পংক্তি >পত্তি, পংত্তি >পট্টি, পংটি >পংলি >পল্লি >পালি; অথবা পঙ্‌ক্তি >পত্তি >পট্টি >পল্লি >পালি। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ব্যুৎপত্তি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় 'পালি' শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, দল, সমূহ ইত্যাদি। এই শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত নহে, ইহা মূলত দ্রাবিড় শব্দ; অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ইহাকে নিজের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। দ্রাবিড় 'পল্' শব্দের অর্থ পাল, দল, শ্রেণী ইত্যাদি। কাজেই 'পালি' শব্দের সঙ্গে দ্রাবিড়; 'পল্'-এর সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি। আবার এই 'পল্' হইতে 'পল্লি' বা 'পল্লী'র উদ্ভব অসম্ভব নহে। 'পল্লি' বা 'পল্লী'র অর্থ নগর বা গ্রাম অর্থাৎ যেখানে লোকেরা শ্রেণীবদ্ধ বা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে।

তিব্বতীতে কথ্যভাষাকে 'ফল্. ব'ই. স্কদ্' এবং লেখ্যভাষাকে 'ছোস্. স্কদ্' বলে। তিব্বতী এই 'ফল্' (=প্রাকৃত) হইতেও 'পালি'র উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নহে।

প্রাকৃত প্রধানত চারি প্রকার—(১) মাহারাষ্ট্রী বা মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত ভাষা; (২) শৌরসেনী বা শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের ভাষা; (৩) মাগধী বা মগধ অর্থাৎ বিহার অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা; এবং (৪) পৈশাচী বা অনার্য্যদের ভাষা। এই সকল বিভিন্ন প্রাকৃত অপভ্রংশ হইতে আধুনিক বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাসমূহের জন্ম হইয়াছে এইরূপে আজ প্রায় হাজার বৎসর অতীত হইল মাগধী প্রাকৃত অপভ্রংশ হইতে বঙ্গ-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কাজেই মাগধী প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[ক] মাগধী প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে 'ই' বা 'এ' প্রত্যয় হয় এবং কখনো কখনো বা প্রত্যয়ের লোপ দেখিতে পাওয়া যায় *। বাঙ্গালা ভাষায় আহ্মি, মোঁই, মোহ্মি, তুহ্মি, তোহ্মি, তিনি, তুমি, আমি, তুই, মুই প্রভৃতি শব্দে 'ই' প্রত্যয়ের এবং আহ্মে, মোএঁ, মোয়ে, তোহ্মে, তোএঁ, তেঁ, সে, যে, কে, 'লোকে বলে', 'চোরে ধন লইয়া গেল', 'বাঘে খায়' প্রভৃতি পদে 'এ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যয় লোপের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

[খ] মাগধী প্রাকৃতে কখনো কখনো বিভক্তির লোপ, কখনো কখনো বা বিভক্তির বিনিময় হয়। বাঙ্গালা ভাষায় 'গাছ কাটে সুভখনে'—শূ-পু. ১৪৩ পৃ.; 'যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে'—শ্রীকৃ. ৩৪২ পৃ.; 'বালক চন্দ্র দেখিতেছে'; 'রাম বাড়ী যায়' প্রভৃতি পদে 'গাছ', 'যোগ', 'চন্দ্র', 'বাড়ী', প্রভৃতি শব্দে বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'নরলোকে করিতে উদ্ধার'—শূ-পু. ৭০ পৃ.; 'না খাইলোঁ কাহের গুয়া পানে'—শ্রীকৃ. ৩৪২ পৃ.; 'দেখিআঁ কংসেত (=কংসের) উপজিল হাস।'—শ্রীকৃ. ২ পৃ.; 'সৎপাত্রে দাও' প্রভৃতি পদে 'নরলোকে' 'গুয়া পানে' 'কংসেত' 'সৎপাত্রে' ইত্যাদি শব্দে বিভক্তির বিনিময় হইয়াছে।

[গ] মাগধী প্রাকৃতে মূর্দ্ধন্য ষ ও দন্ত্য স স্থানে 'শ'কারের উচ্চারণ হয় †। বাঙ্গালা ভাষায়ও আমরা একমাত্র তালব্য 'শ'কারের উচ্চারণ করিয়া থাকি।

[ঘ] সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়, মাগধী 'ড' ‡ বা 'ল' হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অতীতকালের চিহ্ন 'ল'কারের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা, করিল, খাইল, দেখিল ইত্যাদি।

[ঙ] সংস্কৃত 'ক্ত্বা' বা 'ল্যপ' প্রত্যয়, মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে বিকল্পে 'ইঅ' হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অসমাপিকাক্রিয়ার চিহ্ন '-ইয়া'র (<ইআ <ইঅ) উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—উলটিআঁ, মজিআঁ, করিয়া, খাইয়া, যাইয়া ইত্যাদি।

---

* অত ইদেতৌ লুক্ চ ॥ প্রা.প্র. ১১।১০ ॥

† ষসোঃ শঃ ॥—প্রা.প্র. ১১।৩ ॥

‡ কৃঞ্‌-মৃঙ্‌গমাং ক্তস্য ডঃ ॥—প্রা.প্র. ১১।১৫ ॥

[চ] মাগধী প্রাকৃতে 'র'কার স্থানে 'ল'কারের প্রয়োগ হয়*। এই প্রকারের পরিবর্তন পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় সাধারণ, কিন্তু এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্যভাষার লক্ষণ ছিল। যথা,—প্রতরক >পথরঅ >পহলঅ >পহিলা বা পহেলা; পরীক্ষা >পরখ, পলখ; অবতর >উর, উল; দীর্ঘ >দীঘর, দীঘল; কুঠার >কুড়াল; প্রাচীর >পাঁচীল; কোরক >কলি; শ্রীহট্ট >শিলহট্ট, >শিলট বা শিলেট; দারু >দালু (মাগধী প্রাকৃতে 'ডালঅং') >ডাল; পর্য্যায় >পালা (turn); পর্য্যঙ্ক >পালং; ঘূর্ণ >ঘোল; হরিদ্রা >হলুদ; পর্য্যস্ত >পালট; সারিকা >শালিক; চক্রক >চাক্‌লা ইত্যাদি †।

বঙ্গভাষা ও শৌরসেনী অপভ্রংশ

মাগধী অপভ্রংশ হইতে বঙ্গভাষার জন্ম হইলেও ইহাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের ছাপ পড়িয়াছে যথেষ্ট। নবম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত মধ্যভারতে রাজপুতগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে শৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল রাজভাষা। ইহা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে শিষ্ট সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই ভাষায় নানাবিধ কবিতা রচিত হইত। ভাটেরা আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে এই ভাষায় রাজপুত নৃপতিগণের যশোগান করিয়া বেড়াইত বলিয়া গুজরাট ও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত শৌরসেনী অপভ্রংশের চল ছিল। এই সময় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের গঠন-যুগ। কাজেই আর্য্যাবর্ত্তের সকল প্রাদেশিক ভাষায় অল্প-বিস্তর শৌরসেনী অপভ্রংশের উপকরণ দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় সর্ব্বনাম শব্দ, যো (=যে), কো (=কে), সো (=সে) ইত্যাদি এবং অতীতকালের চিহ্ন -ইউ বা -উ; যথা, কিউ (= কৃত), গউ (=গত) ইত্যাদি সমুদয়ই শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

---

* রসোর্লসৌ ॥—হেমচন্দ্র, ৮।৪।২৮৮ ॥

† বৈদিক ভাষায়ও 'র'স্থানে 'ল'কারের প্রয়োগ দেখা যায়; যথা,—রঘু, লঘু; রোমন, লোমন্ ইত্যাদি। সময় সময় পালি এবং অন্যান্য প্রাকৃতেও 'র'স্থানে 'ল' হয়। যেমন—তলুণ, তরুণ।

তৃতীয় স্তবক

শব্দ-সম্পদ্

বাঙ্গালা ভাষা যখন মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া নিজ রূপ ধারণ করিল, তখন হইতে বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও সমধিক পরিমাণে প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা হইতে তাহার সংস্কৃত অংশকে কোন মতেই বাদ দেওয়া চলে না, কারণ সে পঙ্গু হইয়া পড়িবে। মাগধী অপভ্রংশ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ, আর সংস্কৃত তাহার আবরণ। এই ভাষার সংযোগ ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার সভ্যতারক্ষা হয় না। বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, লালিত্য প্রভৃতি সকলপ্রকার সম্পদই সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর করে। আবার বাঙ্গালা ভাষার জননী প্রাকৃতের উপাদান, উপকরণ প্রভৃতি অধিকাংশই সংস্কৃত, কাজেই বাঙ্গালা ভাষা পরোক্ষভাবে বহুল পরিমাণে সংস্কৃতমূলক। এই ভাষায় যেরূপে ও যে প্রণালীতে ক্রমশ সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ প্রবেশ করিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহাদিগকে "তৎসম" বলে। যথা—অতিথি, অর্থ, অস্ত, আকাশ, আশা, আসন, উন্নতি ঋতু, কীর্ত্তি, কৃষি, ক্ষণ, ক্ষয়, খনি, গুরু, গৃহ, গ্রীষ্ম, ঘৃণা, চিন্তা, চেষ্টা, ছবি, ছায়া জননী, জল, জাতি, জ্ঞান, জ্যোৎস্না, জর, ঝঙ্কার, দিবস, দুঃখ, দেশ, দেহ, ধন; নদী, পর্ব্বত, পুণ্য, ফল, বন, বল, বর্ষা, বসন্ত, বস্তু, বায়ু, বুদ্ধি, বৃত্তান্ত, ভাষা, মুখ, মূর্খ, মূর্ত্তি, মৃত্যু, মেঘ, রথ, রাশি, লতা, লোক, লোভ, শত্রু, শব্দ, শরৎ, শিক্ষা, শিশু, শীত, সভা, সাগর, সাহস, সাহিত্য, সুখ, সূর্য্য, স্নেহ, স্বাস্থ্য, হেতু, হেমন্ত ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের উচ্চারণ-রীতি ভিন্ন বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ধার-করা যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালীর মুখে অনেক স্থলে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়াছে তাহাদিগকে "অর্দ্ধতৎসম" বা "ভগ্নতৎসম" নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা, কেষ্ট, কেষ্টো, কিষ্ট (কৃষ্ণ) ক্রিপিন (কৃপণ), নেমন্তন্ন (নিমন্ত্রণ), বিষ্টু (বিষ্ণু) ইত্যাদি।

যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে সেই সকল শব্দ "তদ্ভব"। যথা—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অক্ষি	অক্‌খি	আঁখি
অগ্র	অগ্‌গ	আগ

অত্র	অথ, এথ	এথা, হেথা
অদ্য	অজ্জ	আজ
অপর .	অবর, অঅর	আর
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধ; আধা (<অর্দ্ধক)
অষ্ট	অট্‌ঠ	আট
অস্তি	অত্থি, অচ্ছি	আছে
অস্থি	অট্‌ঠি	আঁঠি, আঁটি
অস্মাভিঃ	অম্হহি	আমি
আত্মনঃ	অপ্‌পণো	আপন
আম্র	অম্ব	আঁব, আম
উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	ওঝা
কক্ষ	{ কক্খ { কচ্ছ	{ কাঁখ { কাছ
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
ক্ষার	ছার	ছার, ছাই
কুত্র	কুথ	কুথা, কোথা
ক্ষুদ্র(ক)	খুড্ড(অ)	খুড়া
ক্ষুদ্র	ছুট্ট	ছোট
ক্ষুর	ছুর	ছুরি
গৃহ	ঘর	ঘর
ঘৃত	ঘিঅ	ঘি
চক্র	চক্ক	চাক, চাকা (<চক্রক)
চতুর্থ(ক)	চউট্‌ঠ(অ)	চৌঠা
চতুর্দ্দশ	চউদ্দহ	চৌদ্দ
চন্দ্র (<*চন্দ্র)	চন্দ	চাঁদ
ছত্র(ক)	ছত্ত(অ)	ছাতা
জানাতি	জাণই	জানে
জামাতা	জামাআ	জামাই
যুষ্মাভিঃ	তুম্হহি	তুমি
তাম্র(ক)	তম্ব(অ)	তাঁবা
তৈল	তেল্ল	তেল
দক্ষিণ	দাহিণ	ডাইন

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
দধি	দহি	দই, দৈ
দারু(<দ্রু)	দালু, ডারুঅ (মাগধী 'ডালঅং')	ডাল
দুহিতা	ধীআ	ঝী, ঝি
দৃঢ	দঢ	দড়
নপ্তা	ণত্তিঅ	নাতি, নাতি
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
পঞ্চ	পঞ্চ	পাঁচ
পততি	পডই	পড়ে
পত্র	পত্ত	পাত, পাতা (<পত্রক)
*পঠতি	পঢই	পড়ে
পশ্চাৎ	পচ্ছা	পাছা
পৃষ্ঠ	পিট্‌ঠ	পিঠ
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
বজ্র	বজ্জ	বাজ
বৎস(ক)	বচ্ছ(অ)	বাছা
বধূ	বহূ	বৌ
বর্দ্ধতে	বড্ঢই	বাড়ে
বর্দ্ধন	বড্ঢণ	বাড়ান
বল্কল	বক্কল	বাকল
বৃদ্ধ(ক)	বুড্ঢ(অ)	বুড়া
বৃন্ত(ক)	বুণ্ট(অ)	বোঁটা
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
ভগিনী	বহিনী	বোন
ভ্রাতা	ভাআ	ভায়া, ভাই
মক্ষি,	মচ্ছি	মাছি
মৎস	মচ্ছ	মাছ
মধু	মহু	মৌ
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ
মর্কট	মক্কড	মাকড়
মস্তক	মত্থঅ	মাথা
মাতা	মাআ	মা

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মৃত্তি	মট্টি	মাটি
লকুট	লট্ঠি	লাঠি
লবণ	লোণ	লুণ, নুন
শাবক	ছাবঅ	ছা
শীর্ষ	সীস	শিষ, শিস
শৃগাল	শিআল	শিয়াল
ষট্+ক	ছঅ	ছয়
সর্ব	সব্ব	সব
সূত্র(ক)	সুত্ত(অ)	সুতা
সৌভাগ্য	সোহগ্গ	সোহাগ
স্কম্ভ	খম্ভ	খাম
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম
হরিদ্রা	হলদ্দা	হলুদ
হসতি	হসই	হাসে
হস্ত	হত্থ	হাত

সংস্কৃতের সহিত যে সকল শব্দের কোনো যোগ নাই এবং যাহা আদিম অধিবাসিগণের ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদিগকে "দেশী" শব্দ বলে। যথা—খড়, খিড়কী, ডাঙ্গর, ঢেঁকী, ঢেকুর, ঢেঙ্গা, ঢেঁড়স, ঢের, ঢেলা, হাঁক ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুসলমান জাতির সংসর্গে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক নোতুন নোতুন ফার্সী, আরবী ও তুর্কী শব্দ অবিকৃত ভাবে কোথাও বা বিকৃত ভাবে প্রবেশ করিতেছে। নিম্নে সেইরূপ কতিপয় শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

অন্দর, আইন, আওয়াজ, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আদব, আদালত, আব-হাওয়া, আবাদ, আয়না, আরক, আলখাল্লা, আসল, ইজ্জৎ, উকীল, উজীর, এজাহার, এলাকা, ওজন, ওজর, কজা, কম, কলপ, কলম, কসাই, কাঁচী, কাগজি, কাজিয়া, কাবু, কামান, কায়দা, কারখানা, কিশমিশ, কুলী, কুলুপ, কোমর, খবর, খরমুজ, খাকী, খাজনা, খাজাঞ্চী, খাতা, খারিজ, খাসী, খোরাক, গজ, গরজ, গরম, গোমস্তা, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাঁদা, চাকর, চাবুক, জবান, জব্দ, জমা, জমাদার, জমী, জরী, জর্দা, জলদী, জানোয়ার, জামা, জারী, জাহাজ, জিদ, জেরা, জোব্বা, জোর, জোলাপ, তরজমা, তল্লাশ, তহবীল, তাকিয়া, তাজা, তালুক, তীর (=শর), তোপ, দখল, দপ্তর, দম, দরকার, দরখাস্ত, দরদ, দরবার, দরুন, দলীল, দস্তখত, দাগ, দারোগা, দালান, দূরবীন, দোকান, দোয়াত, নগদ, নমুনা, নরম, নাকাল, নাজির, নাবালক, নালিশ, নেহাৎ, পছন্দ, পরদা, পাজামা, পিয়াদা, পেশা, ফতে, ফরাশ, ফানুস, ফুরসৎ, ফোয়ারা, বকশী, বজ্জাত, বদল, বন্দোবস্ত, বরফ, বরাত, বাগিচা, বাজেয়াপ্ত, বাদাম, বাবা, বাহবা, বাহাদুর, বিলাতী, বীমা, বেকুব, বোঁচকা, মকদ্দমা, মখমল, মজবুত, মজলিস, ময়দা, মলম, মশলা, মহকুমা, মাফ, মালিক, মিছরী, মিনা, মুচলকা, মুনশী, মুনসেফ, মুল্লুক, মুহুরী, মোহর, রক (বা রওয়াক), রকম, রদ, রসদ, রাইয়ৎ, রায় (নিষ্পত্তিবাক্য), রুজু, রুমাল, রেকাব, রেশম, লাগাম, লাস, শহর, শাল, শিকার, শিশি, সন, সরকার, সরদার, সরম(শরম), সাদা, সাফ, সাফাই, সালিস, সিন্দুক, সুরখী, সেতার, সেরেস্তা, হজম, হপ্তা, হাউই, হাওদা, হাকিম, হাজৎ, হাজার, হালুয়া, হিসাব, হুঁকা, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পোর্ত্তুগিজগণ (The Portuguese) ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। চট্টগ্রামও তাহাদের প্রধান বন্দর ছিল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান বঙ্গদেশ হইতে পর্ত্তুগীজগণকে বিতাড়িত করেন। এই জাতির সংসর্গে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে। যথা—আনারস, আলকাতরা, আলপিন, ইস্ত্রী, কপি, কামরা, কেদারা, গামলা, গুদাম, চাবি, জানালা, তামাক, তোয়ালে, নীলাম, পিপা, পেরেক, ফিতা, বর্গা, বালতি, বিস্তি, বেহালা, বৈয়াম, বোতল, বোতাম, বোমা, মিস্ত্রী, সাগু, সালসা, হরমাদ, ইত্যাদি।

পোর্ত্তুগিজদিগের পর ডচগণ (The Dutch) ভারতে আসিয়াছিল। তাহারা চুঁচুড়া নগরে বাণিজ্য আরম্ভ করে। এই নগর বহুকাল তাহাদের অধিকারে ছিল। কাজেই কতকগুলি ডচ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। যথা; হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, (কিন্তু 'চিঁড়িতন' শব্দ বৈদেশিক নহে) ত্রুপ (বা তুরুপ), ইস্কুরুপ ইত্যাদি।

ইংরেজি আমাদের রাজভাষা। সুতরাং বহু ইংরেজি শব্দ ভারতীয় আধুনিক ভাষা সমূহে দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইংরেজি শব্দ কখনো কখনো অবিকৃতভাবে কখনো কখনো বা বিকৃতভাবে ক্রমে ক্রমে স্থানলাভ করিতেছে। নিম্নে সেইরূপ কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

আফিস, উইল, কাপি (copy), কলেজ, কার্পেট, কেরাসিন, কোট, কোম্পানী, গবর্ণর, গেলাস, চেয়ার, জজ, জেল, টেবিল, ডাক্তার, ডেক্স বা ডেস্ক, থিয়েটার, নম্বর, নোটিশ, পকেট, পালিশ, পুলিশ, বাক্স, বুরুশ, বেঞ্চি, ভোট, ম্যাজিষ্ট্রেট, রেল, লণ্ঠন, লাট, ল্যাম্প, শমন, ষ্টিমার (ইষ্টিমার), ষ্টেশন (ইষ্টেশন), স্কুল (ইস্কুল) ইত্যাদি।

ইংরেজদিগের পর ফরাসীরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। এখনো এই নগরটি তাহাদের অধীনে আছে। সুতরাং তাহাদের সংস্পর্শে কয়েকটি ফরাসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে; যথা—কার্ত্তুজ, কুপন ইত্যাদি।

জর্মান ও ডেনীশগণ (The Danes) বঙ্গদেশে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার শব্দকোষ তাহাদের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালা ও আদিম অধিবাসিগণের ভাষা

ভারতে অন্যান্য জাতি বাস করিত; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ও ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাহাদের আকৃতি ও ভাষা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর লোক মধ্যভারতের কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি। ইহাদের সাধারণ নাম কোল * জাতি এবং তাহাদের ভাষার সাধারণ নাম মুণ্ডা। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা হিমালয় পর্ব্বতে, উহার পাদদেশে ও বাঙ্গালা দেশের পর্ব্বতশ্রেণীতে বাস করে—কুকি, ত্রিপুরা, ভুটিয়া, লেপ্‌চা, খাসিয়া ইত্যাদি। ইহাদের সহিত হিমালয়ের পরপারের তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণের আকৃতিগত বেশ সাদৃশ্য আছে; এজন্য ইহাদের সাধারণ নাম মোঙ্গোল জাতি। তৃতীয়, আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও সভ্যতা অনেক উন্নত। এই জাতির নাম দ্রাবিড়। বর্ত্তমানে এই জাতির বাসস্থান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁহারা বাস করিতেন। সম্প্রতি পাঞ্জাবে হারাপ্‌পা ও সিন্ধুদেশে মহেঞ্জো-দারো নামক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি প্রাচীন দ্রাবিড়-সভ্যতার গৌরবজনক নিদর্শন। বেলুচিস্থানে একটি জাতি আছে তাঁহাদের ভাষা ব্রাহুই। এই ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সকল হইতে প্রমাণিত হয়, এক কালে দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রভাব উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবল ছিল। পূর্ব্বভারতেও দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল। তমলুক বা তাম্রলিপ্ত (অর্থাৎ তামল বা দামল জাতির বাসস্থান) এবং চেরাপুঞ্জি (অর্থাৎ চের বা কের জাতির বাসস্থান) তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইউয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যায়—পূর্ব্ববঙ্গ ও কামরূপ অঞ্চলে যে সকল লোক বাস করিত তাহাদের সহিত ভোট-চৈনিকদের

* শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মুণ্ডা 'কোল' (=মানুষ) হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (The Study of Kol, Calcutta Review, 1923, p. 455)। কিন্তু আমরা এই মতের সমর্থন করি না। এই শব্দটি 'চোল' (দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা) হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অশোকের শিলালিপিতে এই জাতির উল্লেখ আছে। টোলেমি (Ptolemy) ও ইউয়ান্-চোয়াঙ এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে এই জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহাদের আধিপত্য সারা দাক্ষিণাত্যে এমন কি সিংহল দেশেও বিস্তারলাভ করে। তাহাদেরই একটি শাখা মধ্যভারতে আসিয়া বাস করে। তাহারাই বর্ত্তমান কোল জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

(A Tibeto-Chinese people) আকৃতিগত খুবই সাদৃশ্য ছিল। ইহা হইতেও প্রতিপন্ন হয় পূর্ব্বভারত এক সময়ে মোঙ্গোল জাতির অধিকারে ছিল।

বাঙ্গালী একটি সংমিশ্র জাতি—দ্রাবিড়, কোল, মোন্-খ্মের ও মোঙ্গোল জাতির সম্মিলনে উৎপন্ন, কাজেই জগাখিচুড়ী, আর এই জগার উপরে আর্য্যদের একটুমাত্র ঘি পড়াতে আর্য্যগন্ধি হইয়াছে। এই সকল জাতির সংস্পর্শে বাঙ্গালা ভাষার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দ্রাবিড়, মুণ্ডা ও মোঙ্গোল ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার তুলনা করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা রূপ ঐসকল ভাষার অনুযায়ী। বাঙ্গালা ভাষায় বৈদিক যুগের অনেক পুরাতন শব্দ ও ধাতু তৎসম বা তদ্ভব অবস্থায় আছে সত্য কিন্তু দ্রাবিড়, মুণ্ডা ও মোঙ্গোল ভাষা হইতে বহু নোতুন নোতুন শব্দ ও ধাতুর সমাগম হইয়াছে। অনেক সময় আবার এই সকল শব্দ ও ধাতুকে সংস্কৃত করিয়া আর্য্যীকৃত করা হইয়াছে। ইহাদের সংমিশ্রণ-ফলে উচ্চারণেরও অনেক বদল হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে মোঙ্গোল জাতির আর পশ্চিমবঙ্গে দ্রাবিড় ও কোল জাতির প্রভাব ছিল বলিয়া এই উভয় স্থানের উচ্চারণে বহু পার্থক্য দেখা যায়। দ্রাবিড়, মুণ্ডা ও মোঙ্গোল ভাষায় উপসর্গের (Prefix) বালাই নাই, কেবলি প্রত্যয় (Suffix), বাঙ্গালা ভাষায়ও দেখি তাই, কিন্তু বৈদিক ভাষা উপসর্গের চাপে ভারাক্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

(ক) দ্রাবিড় প্রভাব

মূর্দ্ধন্য ধ্বনি আদি আর্য্য ভাষায় ছিল না। গ্রীক, লেটিন, এমন কি আবেস্তার ভাষায়ও এই ধ্বনির অস্তিত্ব নাই, ইহা দ্রাবিড় ভাষার নিজস্ব সম্পদ্। ভারতের অন্যান্য ভাষা দ্রাবিড় ভাষা হইতে এই ধ্বনি গ্রহণ করিয়াছে।

বেদের যে ভাষা তাহা আদি আর্য্য ভাষার নিদর্শন, কিন্তু তার পরে লৌকিক সংস্কৃতে সে ছাঁচ আর নাই। বহু দ্রাবিড় শব্দকে সংস্কৃত করিয়া আর্য্য করা হইয়াছে। নিম্নে সেরূপ কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত হইল।

অটবি, অটবী (বন, জঙ্গল)—বৈদিক সাহিত্যে এই শব্দটির প্রয়োগ নাই, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে দেখা যায়। এই শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে; তামিল 'অডর' মানে 'নিবিড়ভাবে জন্মা'। বনে বৃক্ষলতাদি নিবিড়ভাবে জন্মে বলিয়া তাহাকে অটবি বা অটবী বলে।

এড (ভেড়া)—এই শব্দের প্রয়োগ অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায়। ইহা দ্রাবিড় ভাষার 'আড়ু' (ভেড়া বা ছাগল) হইতে আসিয়াছে; 'আড়ু' ধাতুর অর্থ 'লাফান'।

কটু (ঝাল, উগ্র, তীক্ষ্ণ)—বৈদিক সংস্কৃতে ইহার ব্যবহার নাই, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে স্থান আছে। ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে; তামিল 'কডউ' মানে 'তীব্র'।

ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

কুটী (গৃহ, কুঁড়ে ঘর)—অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।
এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে, তামিল 'কুডি' মানে 'গৃহ' বা 'বাসস্থান'
এবং 'কুড' ধাতুর অর্থ 'একত্রে থাকা'। গৃহে সকলে একত্রে থাকে বলিয়া তাহার
নাম কুটী হইয়াছে।

খট্টা (খাট, পালঙ্ক)—বৈদিক সাহিত্যে ইহার ব্যবহার নাই, পরবর্ত্তী সস্কৃত সাহিত্যে
স্থান আছে। ইহার মূল দ্রাবিড় ভাষা, তামিল ও মালয়ালী ভাষায় খাট অর্থে 'কট্টিল'
শব্দের প্রয়োগ আছে।

কুণ্ড (ভূগর্ভে খনিত গর্ত্ত, পাত্র)—ইহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে, দ্রাবিড় ভাষা হইতে
আমদানী; তেলেগু 'গুণ্ড' ও তামিল 'কুণ্ডু' মানে 'পাত্র'।

নগর (শহর)—বৈদিক সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই, পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান-
লাভ করিয়াছে। অনেকে এই শব্দটিকে 'নগ (পর্ব্বত) + র (অস্ত্যর্থে)'—এভাবে বিশ্লেষ
করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই বিশ্লেষণকে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ অর্থের
কোনো প্রকার সামঞ্জস্য নাই। এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে; তেলেগু
'নগরু' (প্রাসাদ, অট্টালিকা), কন্নাড়ী 'নগর' (বড় শহর)।

পট্টন (শহর)—ইহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে, দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে;
তেলেগু 'পট্টণমু' (শহর), কন্নাড়ী 'পট্টণ' (শহর)।

পল্লি (পাড়া, শহর)—অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়, বৈদিক সাহিত্যে
কোনো উল্লেখ নাই। এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে; ত্রিচিনোপল্লি = ত্রিশিরঃ-
পল্লি (ত্রিমুণ্ডের অর্থাৎ ত্রিমুণ্ড নামক রাক্ষসের শহর) পদটি তুলনীয়।

হট্ট, অট্ট (হাট, বাজার)—ইহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে, দ্রাবিড় ভাষা হইতে অর্ব্বাচীন
সংস্কৃতে স্থানলাভ করিয়াছে; কন্নাড়ী 'অট্টি' মানে 'শহর', বা 'গ্রাম'। আবার এই 'অট্টি' শব্দ
দ্রাবিড় 'পট্টি' (খোঁয়াড়, গ্রাম, যেখানে সকলে মিলিত হয়) হইতে আসিয়াছে।

মীন (মাছ)—এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে; তামিল 'মীন্'
মানে 'মাছ'।

নীর (জল)—ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে আমদানী হইয়াছে; তামিল 'নীর'
মানে 'জল'।

ফল—ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে, তামিল 'পডম' মানে 'পাকা-ফল'
'পড্' ধাতুর অর্থ 'বুড়া হওয়া'।

মলয় পর্ব্বত—বৈদিক সাহিত্যে ইহার স্থান নাই। এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে
অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে আমদানী হইয়াছে; তামিল 'মলেই' মানে 'পর্ব্বত'।

কাষ্ঠ (কাঠ)—ইহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে, দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে আমদানী
হইয়াছে; তামিল 'কাট্টু' মানে 'পর্ব্বত'। পর্ব্বতের সঙ্গে যোগ আছে বলিয়াই 'কাষ্ঠ' নাম
হইয়াছে। 'কাট্টু' কে 'কাষ্ঠ' করিয়া আর্য্য করা হইয়াছে।

পণ্ডিত—বৈদিক সাহিত্যে এই শব্দের কোনো উল্লেখ নাই, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ইহার স্থান
আছে। এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে। তামিল ও তেলেগু 'পণ্ডু' মানে
'প্রাচীন', 'বৃদ্ধ' বা 'জ্ঞানবৃদ্ধ'। এই 'পণ্ডু' হইতে 'পণ্ডা' এবং তারপর 'পণ্ডিত' হইয়াছে। পাণ্ডা,
পাণ্ডে, পাঁড়ে প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়।

লালা (লাল বা নাল)—এই শব্দের প্রয়োগ কেবলমাত্র অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে দেখা যায়।
ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে স্থানলাভ করিয়াছে; তেলেগু 'নালুক' মানে 'জিহ্বা'।
জিহ্বার সহিত লালের সম্বন্ধ আছে বলিয়া 'লালা' নাম হইয়াছে।

পেট, পেটক (পেটরা)—ইহা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নহে, দ্রাবিড় ভাষা হইতে আমদানী;
তেলেগু 'পেট্টো', কন্নাড়ী 'পেট্টিগে' মানে 'পেটরা' বা 'ঝাঁপি'। তেলেগু 'পেট্' ধাতুর
অর্থ 'রাখা' বা 'ধারণ করা'।

নানা (বিবিধ, বহু)—এই শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে; তামিল 'নান্-গু'
মানে 'চার' এবং ইহা হইতে পরে 'বহু' বা 'বিবিধ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এ ছাড়া সংস্কৃতে অনেক দ্রাবিড় শব্দ আছে। বেশী উদাহরণ দিয়া পুঁথি বাড়াইতে
ইচ্ছা করি না।

এখন বাঙ্গালা ভাষার উপর দ্রাবিড়প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দ্রাবিড় ভাষায় মহাপ্রাণ (aspirated) বর্ণ নাই, সবই অল্পপ্রাণ (unaspirated);
আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় অনেক স্থলে মহাপ্রাণ বর্ণ-
গুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—বয় (= ভয়), দোপা (= ধোপা),
বোন (= ভগিনী) ইত্যাদি।

প্রাচীন দ্রাবিড়ে উষ্মধ্বনি নাই। কিন্তু অর্ব্বাচীন দ্রাবিড়ে এই ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা
যায়, ইহার মূলে সংস্কৃতের প্রভাব। বাঙ্গালা ভাষায় উষ্মধ্বনি আছে সত্য, কিন্তু অনেক স্থলে
দ্রাবিড়-প্রভাবে ইহা বিকৃত হইয়াছে। দ্রাবিড় ভাষায় 'শ'কারের উচ্চারণ 'চ'কার হয়,
বাঙ্গালা ভাষায়ও সময় সময় 'শ'এর উচ্চারণ দ্রাবিড়ের অনুযায়ী। যথা—চালা (শালা), ছিরি
(শ্রী), ছেকড়া (শকটক) ছেলে, ছেলিয়া, ছাবাল, ছাওয়াল (শাবক); ছা, ছাও, (শাব),
ছিনাথ (শ্রীনাথ) ইত্যাদি। দ্রাবিড়ে 'হ'কার নাই, বাঙ্গালা ভাষাতেও আমরা কখনো
কখনো 'হ'কারের উচ্চারণ করি না। যথা—এ (হে), এআ (ইহা), করিও (করিহ),
এমবাবু (হেমবাবু), মোষ, মইষ (মহিষ), মশাই (মহাশয়) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা কর্ম্মবাচ্যে (Passive voice) দ্রাবিড়ের ছাপ আছে। দ্রাবিড় ভাষায় কর্ম্মবাচ্যে
মূল ক্রিয়ার সহিত 'হয়' বা 'যায়' অর্থযুক্ত ধাতু ব্যবহৃত হয়; যথা—'কোবিল কাট্টি আয়িট্টু'
(মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে); 'তেরিন্দু পোয়িট্টু', (ইহা জানা গিয়াছে), 'শেয়দল আয়িট্টু' (ইহা
করা হয়) ইত্যাদি (C G D., p. 464, 465.)। বাঙ্গালা ভাষায়ও ঠিক তাহাই দেখি; যথা—
করা হয়, করা যায়, জানা যায়, দেখা যায়, পাওয়া যায় ইত্যাদি।

দ্রাবিড়ে করণার্থক (তামিল 'চৈয়' বা 'পণ্ণ্' ; তেলেগু 'চেয়ু' ; কন্নাড়ী 'মাড়ু') ধাতু মূল ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ণিজন্তের (causative) অর্থ প্রকাশ করে ; যথা—'নেন্থ অতনিনি পম্পিন্চুতান্নু' (আমি তাহাকে পাঠাইয়াছি)—তেলেগু ; 'অবন ধরুমত্তৈ চৈয়প্ পণ্ণিনান্' (সে তাহাকে ধর্ম্ম করায়)—তামিল। রাঢ় অঞ্চলের ভাষায়ও ঠিক সেই ঢঙ্গ দেখি। যথা—আনা করাব, দেওয়া করাব, খাওয়া করাব, যাওয়া করাব, বলা করাব, ধরা করে, জাগা করে, বাড়া করায়, আসা করায় ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার আধিক্য ও সহায়ক-ক্রিয়ার প্রয়োগ দ্রাবিড় ভাষার অনুরূপ।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক দ্রাবিড় শব্দ আছে, নিম্নে কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত হইল।

কাণা (এক চক্ষুহীন)—এই শব্দটি দ্রাবিড় √ কণ্ (দেখা) হইতে আসিয়াছে ; এখানে অর্থ-বিপর্য্যয় হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বে অর্থ-বিপর্য্যয়ের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় ; যথা—Silly, Impertinent, দেবানাং প্রিয়ঃ, ফাজিল (বাঙ্গালা ভাষায় 'বাচাল') বুজরুগী (বাঙ্গালা ভাষায় 'ভান' বা ছলনা') প্রভৃতি শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় হইয়াছে* ।

---

* The word *silly*, for example, which once meant "blessed", like its German cousin *selig*, from being applied euphemistically to half-witted persons, has entirely lost its true meaning. A word like *impertinent* is still in process of being changed. Its positive *pertinent* has hitherto preserved its proper sense, at all events in literature ; but the popular mind has already forgotten the meaning of the negative, and only a short while ago a member of Parliament was called to order for describing a remark as "impertinent". Here the accidental application of a word has caused its primary meaning to fall into neglect."—A. H. Sayce, Introduction to the Science of Language, Vol. I. (fourth edition), p. 195.

"দেবানাং প্রিয়ঃ"—মূর্খ অর্থে ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ কাত্যায়নের বার্ত্তিকে দেখা যায়। মহারাজ অশোক তাঁহার প্রত্যেক অনুশাসনের প্রারম্ভে নিজকে 'দেবতাদিগের প্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—'দেবানং পিয়ো', 'দেবানং পিয়ে, 'দেবানং পিয়েন', 'দেবানং পিয়স' ইত্যাদি। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। বার্ত্তিক-সূত্র এই যুগের লেখা (খৃ. পূ. ১৫০ ?) ; বার্ত্তিককার কাত্যায়ন হিন্দু ছিলেন, কাজেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ অশোকের ব্যবহৃত 'দেবতাদের প্রিয়'কে কদর্থ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যথা—"দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে।"

আরবী ভাষায় 'ফাজিল' মানে 'পণ্ডিত' বা 'বিদ্বান্'।

ফার্সী ভাষায় 'বুজুর্গ' মানে 'বয়োবৃদ্ধ' বা 'বিজ্ঞ'।

কালা (বধির)—ইহা দ্রাবিড় √ কেল্ (শোনা) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এখানেও অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

ওসরা (বারেন্দা)—ইহার প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায়, তেলেগু 'ওসারা' (বারেন্দা) হইতে আসিয়াছে। হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'য় 'বারেন্দা' অর্থে ইহার ব্যবহার আছে।

কোটর (গর্ত্ত)—ইহা দ্রাবিড় 'কুডল' (গর্ত্ত) হইতে উৎপন্ন ; 'কুডেই' ধাতুর মানে 'খনন করা', পরে এই ধাতুকে সংস্কৃত করিয়া 'কুট্ট' করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে গর্ত্তকে 'খুরল' বলে।

থোড়া, থোরা, থোরু (উরু)—এই শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা তেলেগু 'থোড' (উরু) হইতে আসিয়াছে।

ওর (সীমা)—প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যে এই শব্দের প্রয়োগ খুব বেশী। ইহা দ্রাবিড় 'ওর অম্' (সীমা, কিনারা) হইতে আসিয়াছে।

পোলা (পুত্র)—পূর্ব্ববঙ্গে এই শব্দের ব্যবহার আছে। ইহা দ্রাবিড় 'পিল্লেই' (পুত্র) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা প্রায়ই 'ছেলেপিলে' বলিয়া থাকি, এখানে 'পিলে' শব্দটিও দ্রাবিড় 'পিল্লেই' হইতে আসিয়াছে।

ধুতি (পরিধেয় বস্ত্র)—অনেকে মনে করেন 'ধৌত করা হয়' বলিয়া ইহার নাম 'ধুতি' হইয়াছে ; কিন্তু আমরা এই মতকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না, ইহা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। এই শব্দটি তেলেগু 'দুদি' মানে 'তূলা' হইতে আসিয়াছে ; তূলায় তৈরী বলিয়া 'ধুতি' বলা হয়।

আটা (গোধূমচূর্ণ), হি. আটা ; উড়ি. আটা—এই শব্দটি দ্রাবিড় অট্ট (খাঁদ্য) হইতে আসিয়াছে ; তামিল 'অট্টিল' শব্দের অর্থ 'পাককরা ভাত' (boiled rice) ।

পাগান (বাঁট)—ইহা দ্রাবিড় 'পাল' (দুধ) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

মোটা—তামিল 'মোটট্ট' (ভোঁতা) হইতে আসিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় 'গুলি' বা 'গুলা' শব্দ যোগে বহুবচন হয়। ইহা দ্রাবিড় 'কল' বা 'গল' হইতে আসিয়াছে ; যথা—তামিল 'মরঙ্গল' (বৃক্ষগুলি) ; মালয়ালী 'মরঙ্ঙল' (বৃক্ষগুলি) ; কন্নাড়ী 'মরগল', 'মরঙ্গল' (বৃক্ষগুলি) ; তুলু 'মরোকুলু' (বৃক্ষগুলি)। সংস্কৃত 'কুল'—এই 'কল' বা 'গল' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'গণ' হইতে 'গুলি' বা 'গুলা'র উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। —শব্দতত্ত্ব (প্রথম সংস্করণ), ৯৩ পৃ.।

পাল (দল, সমূহ)—এই শব্দটি দ্রাবিড় 'পল' (অনেক, বহু) হইতে আসিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে অনেকগুলি গ্রাম আছে যাহাদের পরে 'উর', 'উরা', 'উড়', 'উড়া', 'ড়া', 'রা' বা 'লা' প্রত্যয় পাওয়া যায়। যথা—জামুর, আমুর, নামুর, বেলুড়, হাউর,

বাঁকুড়া, বগুড়া, কুলাউড়া, নন্দিউড়া, ভূমিউড়া, লাঠিউড়া, চুঁচুড়া, রিষড়া, মগরা, সোমড়া, দেবড়া, উলা, ইকড়া, উথরা, কচুরা, চাঁদনা, চিয়োড়া, দিগড়া, ধামুরা, বাঁশড়া, বালোরা, পুকড়া ইত্যাদি। এই সকল গ্রামের মানে সংস্কৃত বা বাঙ্গালার সাহায্যে বোঝা যায় না। প্রথম যখন এই সকল গ্রামের নামকরণ হয় তখন নিশ্চয়ই ইহাদের একটা অর্থ ছিল এবং লোকে তাহা জানিত, কিন্তু আজ কেহই তাহা জানে না। এই সকল প্রত্যয়ের অর্থ জানা থাকিলে সকল গ্রামেরই ব্যাখ্যা করিতে পারা যাইবে। কাজেই এক্ষণে এই প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এই সকল প্রত্যয়ের মানে খুঁজিতে হইলে দ্রাবিড় ভাষার আশ্রয় নিতে হইবে। দ্রাবিড় 'উর' (গ্রাম) ও 'উড়' (গৃহ বা বাসস্থান) এবং দ্রাবিড় হইতে আগত মুণ্ডা ভাষায় 'ওড়া' (গ্রাম বা বাসস্থান)—ঐ সকল প্রত্যয়ের মূল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলে এখনো 'ময়' বা 'যুক্ত' অর্থে 'উরা' বা 'উড়া'র প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—মাটিউড়া খাট, জলউড়া গামছা ইত্যাদি। আবার স্থান বা বাসস্থান বুঝাইতেও 'উরা' বা 'উড়া'র ব্যবহার আছে; যথা—নালিউরা (যে স্থানে নালিতা বা পাট জন্মে), বাঁশউরা (যে স্থানে বাঁশ জন্মে), ঘাসউরা (যে স্থানে ঘাস জন্মে) ইত্যাদি। আধার অর্থে 'উড়ি'র (ঝুড়ি) প্রয়োগ আছে।

বাঙ্গালা দেশে আবার কতকগুলি গ্রাম আছে যাহারা 'গুড়ি' বা 'গোড়া' শব্দের সহযোগে হইয়াছে। যথা—জলপাইগুড়ী, আমগুড়ী, ধুপগুড়ী, শিলিগুড়ী, ময়নাগুড়ী, আহাতগুড়া, আমলগোড়া, হোলোগুড়ী সামাগুড়ী, বিন্নাগুড়ী ইত্যাদি। এই 'গুড়ী' বা 'গোড়া' দ্রাবিড় 'কুণ্ড' (তামিল), 'কোণ্ড' (তেলেগু) >'গোণ্ড' (ছোট পাহাড়) এবং দ্রাবিড় হইতে আগত মুণ্ডা 'গুটু' (ছোট পাহাড়) বা 'গোড়া' (উচ্চ ভূমি) হইতে আসিয়াছে। কোলদের অনেক গ্রাম আছে যাহাদের পরে 'গুটু' শব্দ দেখা যায়; যথা—দাড়িগুটু।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয় একেবারে অবান্তর হইবে না।

বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যাহারা 'ডাঙ্গা'কে আশ্রয় করিয়াছে। যথা—ভুবনডাঙ্গা, পারুলডাঙ্গা, ফুলডাঙ্গা, সালডাঙ্গা, পরশাডাঙ্গা, রাজাডাঙ্গা, বালিয়াডাঙ্গা, কাসিয়াডাঙ্গা, গোহালডাঙ্গা, ধুবুডাঙ্গা, ঝাউডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, আড়াইডাঙ্গা, আলফাডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, কালিয়ারডাঙ্গা, নোনাডাঙ্গা ইত্যাদি। এই 'ডাঙ্গা' শব্দটি সংস্কৃত 'তুঙ্গ' (উচ্চ ভূমি, পর্ব্বতের চূড়া) হইতে আসিয়াছে। হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'য় ছোট পাহাড় অর্থে 'ডুংগরো' শব্দের প্রয়োগ আছে। ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনো উচ্চ মঞ্চকে 'টঙ্গ' বলে। ময়নামতীর গানে ঐ অর্থেই 'টঙ্গী'র প্রয়োগ আছে; যথা—'পাশা খেলিতে-ছিল টঙ্গীর উপরে'।

(খ) মুণ্ডাপ্রভাব

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দ আছে, যেগুলি মুণ্ডা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

এড়া (ত্যাগ করা)—এই শব্দটি মুণ্ডা 'আড়া' মানে 'ত্যাগ' করা হইতে আসিয়াছে।

হেলা (অবজ্ঞা)—ইহা মুণ্ডা 'হিলা' (ঘৃণা করা) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

আলজীব—এই শব্দটি দুই ভাগে বিভক্ত, আল ও জিব। 'আল' মুণ্ডা 'আলাঙ্গ' (জিহ্বা) হইতে আসিয়াছে।

গণ্ডা (সংখ্যা বিশেষ, ৪ কড়ায় এক গণ্ডা)—ইহা মুণ্ডা 'গণ্ডা' (চারের সমষ্টি) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ঝিঙ্গা—এই শব্দটি মুণ্ডা 'ঝিঙ্গা' (শসা) হইতে আসিয়াছে।

টোটকা (চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহির্ভূত ঔষধ, মুষ্টিযোগ)—ইহা মুণ্ডা 'টুটকি' (লোকপরম্পরায় প্রচলিত) হইতে উদ্ভূত।

চাকা, চাখা (স্বাদ গ্রহণ করা)—সুনীতিবাবু সংস্কৃত 'চক্ষ্' (দেখা) ধাতুকে ইহার মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (ODB., p. 460, 470)। আমরা এই মতকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। এই শব্দটি মুণ্ডা 'চাকা' মানে 'স্বাদ গ্রহণ করা' হইতে আসিয়াছে।

তবে (তখন, সেইজন্যে, তৎপরে), হি. তব্—এই শব্দটি মুণ্ডা 'তোবে' মানে 'তৎপরে' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নালা (জল নির্গমপথ)—ইহা মুণ্ডা 'নালা' (ক্ষুদ্র নদী, জল নির্গমপথ) হইতে আসিয়াছে। অনেকে মনে করেন এই শব্দের মূল সংস্কৃত 'নাল', যাহা হইতে প্রণালীর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু 'নাল' শব্দের প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে নাই, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে মুণ্ডা হইতে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মানা (নিষেধ, বারণ)—ইহা মুণ্ডা 'মানা' (বারণ করা, সতর্ক করা) হইতে আসিয়াছে।

বিড়া (২০ গণ্ডা পাণে এক বিড়া, পানের খিলি, যাহার উপরে রাখিয়া ভার বহন করা হয়)—ইহা মুণ্ডা 'বিড়া' (তাড়া, আঁটি) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ছেঁচা (পেষা, কুটা)—ইহা মুণ্ডা 'চেচা' (কুটা) হইতে আসিয়াছে।

ঢিল, ঢিলা, ঢিলে (শিথিল)—এই শব্দ মুণ্ডা 'ঢিলি' (শিথিল হওয়া) হইতে উদ্ভূত।

ঢোঁড়া (একপ্রকার সাপ)—ইহা মুণ্ডা 'ডুণ্ডু' (একপ্রকার সাপ) হইতে আসিয়াছে।

গুঁড়া (চূর্ণ)—ইহা মুণ্ডা 'গুণ্ডা' (চূর্ণ) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে 'চূর্ণ করা' অর্থে 'গুণ্ড'শব্দের প্রয়োগ পাই। যথা—

কেহো মুগ পেসে কেহো দুগ্ধে দেই জাল।
হরিদ্রা পিঠালি বাটে কেহ গুণ্ডে ঝাল॥—পৃ. ৪৬।

ঠাকুর—এই শব্দটি মুণ্ডা 'ঠাকুর' (গ্রামের মাতব্বর, পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট সভ্য) হইতে আসিয়াছে। ইহাকে 'ঠক্কুর' করিয়া সংস্কৃত করা হইয়াছে।

কয়লা—ইহা মুণ্ডা 'কোইলা' বা 'কুইলা' হইতে আসিয়াছে। হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'য় 'কোইলা' শব্দের প্রয়োগ আছে; মুণ্ডা হইতে এই শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

লোর (চোখের জল)—ইহা মুণ্ডা 'লোর' (নালা, ক্ষুদ্র নদী) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

এ ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় অনেক মুণ্ডা কথা আছে। উদাহরণ দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

[গ] মোঙ্গোলপ্রভাব

মোঙ্গোল ভাষায় মহাপ্রাণ বর্ণের আধিপত্য খুব বেশী। পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে অল্পপ্রাণ বর্ণকে কতকটা মহাপ্রাণ করিয়া উচ্চারণ করার মূলে মোঙ্গোলপ্রভাব বিদ্যমান। যথা—খাশী (কাশী), খাকা (কাকা), ফুস্প (পুষ্প) ইত্যাদি।

মোঙ্গোল ভাষায় মূর্দ্ধন্য ধ্বনি নাই; বাঙ্গালা ভাষায়ও মূর্দ্ধন্য ধ্বনির প্রকৃত উচ্চারণ হয় না। এই ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র দন্তমূলের নিকটবর্ত্তী স্থানকে স্পর্শ করে ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষায় 'ড' ও 'ঢ'এর উচ্চারণ কতকটা 'দ' ও 'ধ'এর অনুরূপ হইয়া থাকে। এজন্য 'ড়' ও 'ঢ়'এর নীচে ফুটকী দিয়া আরো দুইটি নোতুন বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষায় এই দুইটি বর্ণের অস্তিত্ব দেখা যায় না। আবার পূর্ব্ববঙ্গে 'ড়' ও 'ঢ়'এর উচ্চারণ কতকটা 'র' ও 'হ্র'এর মত হয় বলিয়া এই দুইটি বর্ণকে তাহাদের আকৃতি অনুসারে প্রকাশ করা হয়; যথা, 'ড'এ শূন্য 'ড়' ও 'ঢ'এ শূন্য 'ঢ়'।

মোঙ্গোল ভাষায় অনুনাসিক ধ্বনির হাঙ্গামা নাই বলিলেই হয়, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাতেও তাই; যথা—পাচ (পাঁচ), বাশ (বাঁশ) চাদ (চাঁদ) ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় তা নয়।

মোঙ্গোল ভাষায় 'চ'বর্গের স্পৃষ্ট ও দন্ত-তালব্য উচ্চারণ হয়; পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাতেও ঠিক সেইটি দেখি।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক তিব্বতী শব্দ আছে। এখন এবিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ছো, ছোঁ (ছোবল)—ইহা তিব্বতী 'ম্‌চু' (তুণ্ড) হইতে আসিয়াছে, এখানে 'ম্'এর কোন উচ্চারণ হয় না।

ঠেস (হেলান)—ইহা তিব্বতী 'থ্রেস্' (ভার, বোঝা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'থ্রেস্' শব্দের তিব্বতী উচ্চারণ 'ঠেস্', এখানে 'স্'এর উচ্চারণ হয় না; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তিব্বতী শব্দের আক্ষরিক উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

ফুল—এই শব্দটি তিব্বতী 'ফুল' (পূজার উপহার) হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেকে এই শব্দটি সংস্কৃত 'ফুল্ল' (প্রস্ফুটিত) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

চনা, চোনা, চেনা (গোমূত্র)—ইহা তিব্বতী 'গ্‌চিন্' (মূত্র) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এখানে 'গ্'এর কোন উচ্চারণ হয় না।

ঠিক (প্রকৃত, যথার্থ)—ইহা তিব্বতী 'থ্রিগ্-থ্রিগ্' (যথার্থ, প্রকৃত) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'থ্রিগ্-থ্রিগ্' শব্দের তিব্বতী উচ্চারণ 'ঠিগ্-ঠিগ্'।

ঠক, ঠগ (বঞ্চক, খল)—ইহা তিব্বতী 'থ্রোগ্-থ্রোগ্' (যাহার কথার ঠিক নাই, যে কথায় ও কাজে এক নয়) হইতে আসিয়াছে। 'থ্রোগ্-থ্রোগ্' শব্দের তিব্বতী উচ্চারণ 'ঠোগ্-ঠোগ্'।

বোরা (ছালা)—এই শব্দটি তিব্বতী 'বোর্-র' (ছালা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ডুমা, ডুমো; পূর্ব্ববঙ্গে 'টুমা' (টুকরা)—ইহা তিব্বতী 'দুম্-বু' (খণ্ড) হইতে আসিয়াছে।

ফিরা, ফিরে (পুনরায়, আবার), হি. ফির্—এই শব্দটি তিব্বতী 'ফ্যির্' (পরে, আবার) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

বাঙ্গালা শব্দকোষে আরো বিস্তর তিব্বতী শব্দ আছে। এখানে বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

বাঙ্গালা ভাষা যখন জন্মগ্রহণ করে, সে-সময়কার আদিম অধিবাসিগণের ভাষার প্রভাব ইহার উপর যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এজন্য বাঙ্গলা দেশ সংস্কৃত উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে অনেকটা আলাদা। বাঙ্গালায় আমরা বর্গ্য'জ' ও অন্তঃস্থ'য'এর তফাৎ করিতে পারি না। বর্গ্য'ব' ও অন্তঃস্থ'ব' এই উভয়ের ভেদ করিতে পারি না। মূর্দ্ধন্য'ণ' আর দন্ত্য'ন'-কারের পৃথক্ উচ্চারণ করিতে পারি না। আমরা 'শ', 'ষ', 'স' এই তিনটিরই তালব্য উচ্চারণ করি। আমরা হ্রস্ব দীর্ঘের তফাৎ করিতে পারি না। তাই বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হয়। পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ—এই তিন জিনিস লইয়া সংস্কৃত অভিধান। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের সংস্কৃত অভিধানে বানানেরও স্থান আছে

বাঙ্গালা ভাষায় বানানের বইএর ঢের দরকার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ বানানের বইএর ছড়াছড়ি অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষায় তত দেখা যায় না। তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় বানান-বিভ্রাট খুব বেশী। অবলা কোমলা 'উষা' কেন যে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে কঠোরা হইয়া দীর্ঘা হইলেন বুঝিলাম না। 'গাড়ী' শব্দটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'য়ও দীর্ঘ ছিল, কিন্তু হঠাৎ হ্রস্বত্ব লাভ করিল। ভাবুক বাঙ্গালীরা কি 'গাড়ী'র 'ঘড়ঘড়ে'র মাঝেও কোমলতা অনুভব করিল? 'মাসী' 'পিসী' হ্রস্ব দীর্ঘের মাঝখানে চাপা পড়িয়া অতিকষ্টে সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছেন। আজকাল 'বাড়ী'র প্রতি আমাদের টান কম বলিয়াই কি 'বাড়ী' শব্দটি হ্রস্ব হইয়াছে? ভেতো বাঙ্গালীর কাছে 'কি' যে কিভাবে এত শক্তিলাভ করিল ভাষাবিজ্ঞানও তাহা ঠাহর করিতে পারিল না।

হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা' নামক পুস্তকের 'দেশী' শব্দটি যত অনর্থের মূল। এই 'দেশী' শব্দটি দেখিয়া অনেকেই নির্ব্বিচারে মনে করেন, এই পুস্তকে যত শব্দ আছে সবই দেশী। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই শব্দগুলিকে খাঁটি দেশী শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'দেশীনামমালা'র সব শব্দই যে দেশী তাহা নহে, অনেক তদ্ভব শব্দও আছে। যথা—ওসা (ওস) <অবশ্যায়; ডালী (ডাল, ডাইল) <দারু <দ্রু; হড্ড (হাড়) <অস্থি; বিহাণ (বিহান) <বিভান; ডুঙ্গরো (ডুংরি, ডাঙ্গা) <তুঙ্গ; গড্ডী (গাড়ী) <গন্ত্রী ইত্যাদি।

চতুর্থ স্তবক

বিভক্তি ও বচন

সংস্কৃতে সাত প্রকার বিভক্তি আছে সত্য, কিন্তু কার্য্যত তাহারা অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। চতুর্থী বিভক্তি অবলা; বৈদিকে চতুর্থী বিভক্তি স্থানে ষষ্ঠীর ব্যবহার দেখা যায়; যথা—'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি' (পাণিনি, ২।৩।৬২) অর্থাৎ বৈদিকে চতুর্থী বিভক্তি স্থানে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ষষ্ঠীর করুণা অপার, অযাচিতভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। 'ধোপাকে কাপড় দাও' ইহার সংস্কৃত তর্জ্জমা করিতে হইলে ছাত্রদিগকে বড় মুস্কিলে পড়িতে হয়। এখানে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হইতে পারে না, কারণ আমরা ধোপাকে কাপড় দান করি না, ফিরিয়া পাইবার আশায় দিয়া থাকি।

আবার কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না, কারণ 'দা' ধাতু দ্বিকর্ম্মক নহে; কাজেই অগতির গতি ষষ্ঠীর আশ্রয় নিতে হয়। এজন্য পাণিনি ঠিকই বলিয়াছেন, 'ষষ্ঠী শেষে' (২।৩।৫০) অর্থাৎ সকলের শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি। যখন অন্য কোন বিভক্তিরই আশ্রয় পাওয়া যায় না, তখন একমাত্র ষষ্ঠী বিভক্তিই আশ্রয় দিয়া থাকে। পালি ও প্রাকৃতে সম্প্রদানকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। গ্রীক্‌ভাষায়ও সম্প্রদান এবং সম্বন্ধের বিভক্তি-চিহ্ন একই। সংস্কৃতে আবার অনেক স্থলে চতুর্থী বিভক্তির স্থান দ্বিতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজি ভাষাতেও সম্প্রদানকারককে কর্ম্মকারক গ্রাস করিয়াছে। অপভ্রংশে সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। বাঙ্গালা ভাষায়ও বিভক্তির বালাই অনেকটা কম। বাঙ্গালায় বিভক্তির কি হয় দেখা যাউক।

বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি মাগধী প্রাকৃতের অনুযায়ী। মাগধীতে প্রথমার একবচনে অকারান্ত শব্দের উত্তর 'এ' হয়; যথা—অঅং শে আঅমবুত্তন্তে (অয়ং স আগমবৃত্তান্তঃ) —শকু. ৬ষ্ঠ অঙ্ক। বাঙ্গালায়ও প্রথমা বিভক্তিতে 'এ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

সাপে গরুতে একই ঘাটেতে জল খাঅ
কেহ কারে নাহি ধরে বলে।—শূ.পু. মন্দির নির্ম্মাণ, ৯০পৃ.।
সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে॥—শ্রীকৃ. ১পৃ.।
দাসীগণে মুখে ঢালিল পানী।
চেতন পাইল শচী ঠাকুরাণী॥—চৈ.ম—জ. ১৫পৃ.।
এত কহি প্রণমিয়া শ্রীখণ্ডে চলিলা।
প্রত্যেকে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা॥—ন.বি. ১২৩ পৃ.।
প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে।
পদাম্বুজে মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে॥—চৈ.ম—লো. মধ্যখণ্ড।
আপনার পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই।
লোকে যেন নাহি বলে নিঠুর নিমাই॥—করচা, ৮৩ পৃ.।

আবার কখনো কখনো মাগধী প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে প্রত্যয়ের লোপ হয়; যথা, 'অঁধ চোল (চোরঃ) তা কিং তুমং ণ ভক্‌খিদে'—মৃচ্ছ. ৮ম অঙ্ক। বাঙ্গালা ভাষায়ও সময় সময় কর্ত্তৃকারকে কোনো প্রত্যয় হয় না। যথা—

রামাই পণ্ডিত আইল সোলসঅ গতি।
গরুড় কোটাল আইল দুর্গা ঘটদাসী॥—শূ.পু. ৪৭পৃ.।
সময় উপেখিঞাঁ রহিলা দেবগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥—শ্রীকৃ. ২ পৃ.।

স্ত্রীপুরুষ জত জত নবদ্বীপে বসে।
একে একে ভিক্ষা দিল মনের সন্তোষে ॥—চৈ.ম—জ. ২৪ পৃ.।
অবধৌত নিত্যানন্দ পাগলের মত।
গড়াগড়ি দিয়া অশ্রু ফেলে অবিরত ॥—করচা, ৪ পৃ.।

আধুনিক বাঙ্গালায় প্রথমা বিভক্তিতে 'এ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং প্রত্যয়লোপের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,অপভ্রংশ ভাষায় সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। বাঙ্গালায়ও আমরা ঠিক তাহাই দেখি। বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকে 'ক' বা 'কে' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—

ত্রিপিনীর জল গরভুক সিনান করাইল।
গঙ্গা অমনি পরভুর অঙ্গমার্জ্জনা কৈল ॥—শূ.পু. ৪৭ পৃ.।
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥—শ্রীকৃ. ২ পৃ।
আমাকে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণভরি হরি বল এই ভিক্ষা চাই ॥—করচা, ৩৪ পৃ.।

এই বিভক্তি-চিহ্নের উৎপত্তি নিয়া নানা মত দেখা যায়। অনেকে বলেন, ইহা সংস্কৃত দ্বিতীয়ান্ত পদ 'কক্ষম্' হইতে আসিয়াছে—কক্ষম্ <ককৃথং <কাথং; 'কাথং' হইতে হিন্দীতে 'কাহং' 'কহং', 'কহুং', 'কাহুঁ', 'কৌ' বা 'কো', 'কা', সিন্ধীতে 'খে' এবং বাঙ্গালায় 'ক' বা 'কে'র উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের এই মত কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

ট্রাম্প সাহেব (Mr. Trumpp, Sindhi Grammar, p. 115) বলেন, বাঙ্গালা কর্ম্ম ও সম্প্রদানকারকের চিহ্ন 'কে' সংস্কৃত 'কৃতে' (=জন্য) হইতে আসিয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানের মতে 'কৃতে' হইতে 'কে' সহজেই হইতে পারে—কৃতে <কএ <কে; কিন্তু হিন্দীতে 'কাহং', 'কহং', 'কহুং', বা 'কাহুঁ' এবং সিন্ধীতে 'খে' পাওয়া বেশ শক্ত।

মোক্ষমূলরের (F. Max Müller) মতে সংস্কৃত স্বার্থে 'ক' হইতে বাঙ্গালায় 'কে' আসিয়াছে। দীনেশবাবুও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন "এই 'ক' (যথা বৃক্ক, চারুদত্তক, পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।" প্রাকৃতে 'ক'এর প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু সব স্থলেই সংস্কৃতের মত অজ্ঞাত[1], কুৎসিত[2], অল্প[3], হ্রস্ব[4], অনুকম্পা[5], সংজ্ঞা[6] বা স্বার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

(১) অজ্ঞাতে।—পাণিনি, ৫।৩।৭৩ ॥
(২) কুৎসিতে।— " ৫।৩।৭৪ ॥
(৩) অল্পে।— " ৫।৩।৮৫ ॥
(৪) হ্রস্বে।——পাণিনি, ৫।৩।৮৬ ॥
(৫) অনুকম্পায়াম্।—" ৫।৩।৭৬ ॥
(৬) সংজ্ঞায়াং কন্।—" ৫।৩।৭৫ ॥

অণস্থএ জহ এসো ইদো দিগ্নদিট্‌ঠী উস্সুও মআপোঅও (মৃগপোতক) মাঅরং অণ্ণেসই এহি সংজোএম ণং।—শকু. তৃতীয় অঙ্ক। এখানে 'অনুকম্পা' অর্থে 'মৃগপোত'এর উত্তর 'ক' হইয়াছে; সংস্কৃত "পুত্রকঃ', 'বৎসকঃ' প্রভৃতি তুলনীয়। অম্হহে রক্খাকরণ্ডঅং (রক্ষাকরণ্ডক) মণিবন্ধে সে ণ দীসই।—শকু. সপ্তম অঙ্ক। এখানে স্বার্থে 'করণ্ড'এর উত্তর 'ক' হইয়াছে; সংস্কৃত 'পৃষ্ঠকম্', 'মস্তকম্' প্রভৃতি তুলনীয়। থাবলআ (স্থাবরক) চেডা।—মৃচ্ছ. অষ্টম অঙ্ক। এখানে 'সংজ্ঞা' অর্থে 'ক' হইয়াছে; সংস্কৃত 'রোহিতকঃ', 'শর্ব্বিলকঃ' প্রভৃতি তুলনীয়। অলে ণং ভণামি শপুত্তাকং চালুদত্তাকং (চারুদত্তক) বাবাদেধ ত্তি।—মৃচ্ছ. দশম অঙ্ক। এখানে 'কুৎসিত' অর্থে 'চারুদত্ত'এর উত্তর 'ক' হইয়াছে; সংস্কৃত 'কুৎসিতো মহিষঃ মহিষকঃ', 'অশ্বকঃ' ইত্যাদি তুলনীয়। কাজেই এসকল স্থলে 'ক'এর একটা বিশেষ অর্থ আছে।

দীনেশবাবু গাথা ভাষায় ও প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ক'এর বাহুল্য দেখাইয়াছেন। "গাথা ভাষায় এই 'ক'এর প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যথা, ললিত-বিস্তরের একবিংশোধ্যায়ে—

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে।
রতিমে প্রিয়া ফুল্লিত পাদপকে ॥
বশবর্ত্তি সুলক্ষণকো বিচিত্রিতকো।
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো ॥
বয়ংজাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ।
সুখ কারণ দেব নারায়ণ বসন্ততিকাঃ ॥
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং।
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্ ॥' ইত্যাদি। *

বাঙ্গালায় পূর্ব্বে এই 'ক' সংস্কৃত ও প্রকৃতের মতই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ২০০ বৎসর

* শুদ্ধ পাঠ—

সুবসন্তকে ঋতুবর আগতকে
রমিমো প্রিয় ফুল্লিতপাদপকে।
তব রূপ সুরূপ সুশোভনকে
বসবর্তি সুলক্ষণ চিত্রিতকে ॥
বয জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেবনরাণ সুসংভূতিকাঃ।
উত্থি লঘুং পরিভুঞ্জ সুযৌবনিকং
দুলভ বোধি নিবর্তয় মানসকং ॥

পূর্ব্বের পুঁথিগুলিতে এই 'ক'এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(১) 'রথ হইতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে॥'—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ১০৬ পত্র।
(২) 'ভীষ্মক-ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।'— ঐ
(৩) 'স যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়।'—সঞ্জয়।
(৪) 'শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ।'—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ৭৫ পত্র।
(৫) 'পঞ্চভাই দ্রৌপদীক কুশল জানাইব।'— ঐ ৭৭ পত্র।"

প্রথমে গাথা শ্লোক নিয়া আলোচনা করা যাউক। উক্ত গাথাটিতে 'ক'এর অতিরিক্ত ব্যবহার আছে, তবে 'সু'এর প্রয়োগও নিতান্ত কম নহে। অনেক স্থলে 'সু'এর বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে; যথা, 'সুরূপ'এর পর 'সুশোভনকো' না লিখিয়া শুধু 'শোভনকো' লিখিলেই চলিত; 'সংস্থিতিকাঃ' লিখিলেই যথেষ্ট, 'সুসংস্থিতিকাঃ'র ব্যবহার না করিলেও অর্থ পরিস্ফুট হইত। উক্ত গাথাটিতে 'ক' বা 'সু'এর অত্যধিক প্রয়োগ ছন্দের খাতিরে এবং পদান্তে 'ক'এর ব্যবহার অন্ত্যানুপ্রাসের (Rhyme) জন্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখানে 'ক' বা 'সু'এর বিশেষ কোনো অর্থ না থাকিলেও প্রয়োজন আছে—একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। পরবর্ত্তী কালে এই 'ক'এর লোপ হওয়ার ফলে 'চক্রক' হইতে 'চাকা', 'মস্তক' হইতে 'মাথা', 'বৃদ্ধক' হইতে 'বুঢ়া' বা 'বুড়া', 'ক্ষুদ্রক' হইতে 'খুড়া', 'জ্যেষ্ঠক' হইতে 'জ্যেঠা' প্রভৃতি শব্দ আকারান্ত হইয়া দেখা দিয়াছে।

দীনেশবাবুর মতে বাঙ্গালায় 'ক'এর প্রয়োগ অসংখ্য, এসম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব। প্রথম সংখ্যক কবিতাতে যে 'ক' আছে অর্থাৎ 'ভীষ্মক', তাহা ছন্দের খাতিরে হইয়াছে, নতুবা ছন্দপতন হইত। দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাতে যে 'ক' আছে, যথা, 'ভীষ্মক ভয়ে', তাহা ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'ক'এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

কি না মোক ভৈল এত কালে।
মহাদানী ভৈগেল গোকুলে॥—শ্রীকৃ. ৪৭ পৃ।
আপন কাজক লাগি সবই বিকলী।
সস্কেঞিঁ চাহেস্ত তোক রোষু বনমালী॥—শ্রীকৃ. ২৫৩ পৃ।

আসামী ভাষায়ও ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'ক' যুক্ত হয়—

মোক সম বীর নাই ই তিন ভুবনে।
লঙ্কার রাক্ষস আসে যুদ্ধক আমাক॥—আসামী রামায়ণ

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সংখ্যক কবিতাতে কর্ম্মকারকে 'ক' হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক'এর যথেষ্ট প্রয়োগ পাওয়া যায়। কাজেই এ সকল স্থলে 'ক' নিষ্কর্ম্মা নহে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন "এই ভাবে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোন্‌টী কর্ত্তা, কোন্‌টী কর্ম্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন। 'সৌরন্ধ্রক কীচক বোলয়ে ততক্ষণ' (—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ৬০ পত্র।)—ছত্রে কে কহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে।" দীনেশবাবু এখানে মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন। তিনি 'কীচক' শব্দে 'ক' আগম হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু 'কীচক'এ 'ক' যুক্ত হয় নাই, মূল শব্দটিই 'কীচক' (কেকয় রাজার পুত্র, বিরাট রাজার শ্যালক), 'কীচ' নহে। দীনেশবাবু কেন যে এ ভুল করিলেন বুঝিলাম না। কাজেই এখানে 'কীচক' কর্ত্তা এবং 'সৌরন্ধ্রক' কর্ম্ম; 'সৌরন্ধ্র' শব্দের উত্তর কর্ম্মকারকে 'ক' হইয়াছে।

দীনেশবাবু বলিয়াছেন "গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রাকৃতে—

'পলিত্তাঅহ্ দাশীএ পুত্তে দলিদ্দ চালুদত্তাকে তুমং।'—মৃচ্ছ. অষ্টম অঙ্ক।"

ইহার ভাষা শকারী, মাগধী প্রাকৃতের উপভাষা। এখানে 'কে' কোনো বিভক্তির চিহ্ন নহে। প্রথমে 'কুৎসিত' অর্থে 'ক' যুক্ত হইয়াছে এবং পরে মাগধী প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তির একবচনে 'এ' হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, এই 'ক' বা 'কে' দ্রাবিড় ভাষার সম্প্রদানকারকের চিহ্ন হইতে আসিয়াছে—তামিল 'কু' (শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে 'ক্কু'), তেলেগু 'কু' বা "কি', মালয়ালী 'ক্কু', প্রাচীন কন্নাড়ী 'কে' বা 'গে', আধুনিক কন্নাড়ী 'ক্কে' বা 'গে'। উড়িয়াভাষায়ও 'কু'এর প্রয়োগ আছে। দ্রাবিড় 'কু' হইতে হিন্দীতে 'কো', আর 'ক্কু' হইতে 'কহু', 'কহ' 'কাহ', 'কহু', 'কাহুঁ' প্রভৃতি প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পরে অনুস্বার যোগে দ্বিতীয়া করিয়া লওয়া হইয়াছে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। সিন্ধীতে 'খে' এবং সিংহলীতে 'ৱৈ' এই 'ক্কু' হইতে আসিয়াছে। আর পাঞ্জাবী 'নু' গুজরাটী 'নে' এবং মারাটী 'লা' দ্রাবিড় কর্ম্মকারকের চিহ্ন 'অন্নু', 'অন্ন', 'নু' বা 'ন' হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

'ক' বা 'কে' সংস্কৃত 'কৃতে' বা 'কক্ষম্' হইতে আসে নাই, আসিলে পালি, প্রাকৃত বা অপভ্রংশে কোন-না-কোন রূপে দেখা দিত।

অপভ্রংশ যুগে বিভক্তি-চিহ্নের বন্ধন খুবই শিথিল হইয়া পড়ে। বিভক্তি-চিহ্নের লোপ ও বিপর্য্যয়—এই দুইটি লক্ষণ অপভ্রংশ সাহিত্যে সুস্পষ্ট, কোন্‌টা কোন্ বিভক্তি পরিচয় পাওয়া কঠিন। পরবর্ত্তী যুগের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় কখনো কখনো বিভক্তি-চিহ্নের লোপ কখনো কখনো বা বিনিময় হইতে দেখা যায়। বিভক্তি-চিহ্নের লোপ, যথা—

কুঠারি হাতে করি বলে হরি হরি।
গাছ কাটে সুভ খনে।—শূ.পু. ১৪৩ পৃ.।

যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে।
কাহাঞি ছাড়ী না জাণো মো আনে॥—শ্রীকৃ. ৪৩২ পৃ.।

কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি, যথা—

উল্লূক বলিয়া পরভু ডাকে উচ্চ স্বরে।
কেবা ডাকে আহ্মারে সে ভাবিল অন্তরে॥—শূ.পু. ৮ পৃ।
রামানন্দ বলে ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া॥—করচা, ২৮ পৃ.।
এই উপদেশ কহি গেলা বঙ্গদেশে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে কহিঞা বিশেষে॥—চৈ.ম.—জ. ৪৮ পৃ.।

কর্ম্মকারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন, যথা—

জেথানে তপস্যাএ দেব করেন্ত মাআধর।
পরভুর নিঅড়ে গিআ দিলাক তার সর॥—শূ.পু. ৩৩ পৃ.।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোঁসাই।
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই॥—করচা. ৩৪ পৃ.।

সম্প্রদানকারকে সপ্তমী বিভক্তি, যথা—

গৌরচন্দ্রে ভিক্ষা দিল জেবা নারী।
জন্ম জন্ম লক্ষ্মী তার না ছাড়িব বাড়ী॥—চৈ.ম.-জ. ২৪ পৃ.।

করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সংস্কৃত 'পুত্রেণ' স্থলে শৌরসেনী প্রাকৃতে 'পুত্তেণ' মাহারাষ্ট্রীতে 'পুত্তেণং' এবং অপভ্রংশে 'পুত্তেণ' 'পুত্তে' বা 'পুত্তে' ব্যবহৃত হইত। অপভ্রংশে তিন লিঙ্গেই তৃতীয়ার একবচনে অনেক স্থলে 'এং' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়[১]; যথা—রামেং (রামেণ) জাইএং (জায়য়া) বারিএং (বারিণা) ইত্যাদি। এই 'এং' বা 'এ' হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন 'এঁ' বা 'এ', মরাঠীতে, 'এঁ' এবং মৈথিলী ভাষায় 'এ' হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায়, যথা—

ব্রহ্মা সব দেব লৈআ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএ তুষিল হরি জলের ভিতরে॥
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।—শ্রীকৃ. ১ পৃ.।

(১) ভিসেং টঃ।—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৭।১৭॥

চন্দ্র সূর্য্য লুকাইল গগন মণ্ডলে।
প্রেমে আকুল হৈঞা ধরণী আন্দোলে॥—চৈ.ম.-জ ৮৯ পৃ.।
সভসহ প্রভুর প্রাঙ্গণে শীঘ্র গিয়া।
প্রভুর দর্শনে উল্লাসিত হৈল হিয়া॥—ন.বি. ১২৩ পৃ.।

আধুনিক বাঙ্গালায় করণকারকের চিহ্ন 'য়', এই 'এঁ' বা 'এ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যথা, সে নৌকায় (<নৌকাএ) ঢাকা গিয়াছে।

করণকারকে কখনো কখনো পঞ্চমী 'হইতে' এবং ষষ্ঠীর 'র' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা, 'এ পুত্র হইতে (=এ পুত্রের দ্বারা) তোমার সুখ হইবে না'; 'আমি তাহার হাতের লেখা (=হস্তদ্বারা লিখিত) চিঠি পড়িতে পারি না'।

বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ত্তৃক', 'দ্বারা' ও 'দিয়া' করণকারকের চিহ্ন। 'কর্ত্তৃক' শব্দ সংস্কৃত 'কর্ত্তৃ' (=যে করে)+স্বার্থে 'ক' হইতে আগত; যথা, 'রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা' 'পুলিশ কর্ত্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে' ইত্যাদি। 'দ্বারা' শব্দ সংস্কৃত 'দ্বার্' শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ। দীনেশবাবু 'দিয়া' শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বার্' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কারণ 'দ্বার্' হইতে 'দিয়া'র উৎপত্তি ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত নহে। এই 'দিয়া' শব্দ 'দা' (=দান করা) ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। যথা—

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন॥—পদ্যপাঠ।

এখানে 'মন দিয়া' এইটি করণকারক, 'মন দিয়া' মানে 'মন অর্পণ করিয়া' অর্থাৎ 'নিবেশ করিয়া'।

সম্প্রদানকারকের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রদান ও কর্ম্ম-কারকে কোনো ভেদ নাই। সম্প্রদান ও কর্ম্মকারকের বিভক্তি-চিহ্ন একই।

অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষায় পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন 'হন্তে', 'হতেঁ', 'হৈতেঁ', 'হয়িতেঁ', 'হইতে', 'হনে' প্রভৃতি প্রত্যয় প্রাকৃত 'হিংতো' হইতে আসিয়াছে। প্রাকৃত 'হিংতো' পঞ্চমী বিভক্তির বহুবচনের চিহ্ন (হিংতোভ্যসঃ।—প্রাকৃতলক্ষণ, ১।৮); কিন্তু মাগধী, অর্দ্ধমাগধী ও আর্ষ প্রাকৃতে কখনো কখনো পঞ্চমীর একবচনেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—পুত্তাহিংতো (পুত্রাৎ), দেবাহিংতো (দেবাৎ) ইত্যাদি। প্রাকৃত 'হিংতো' হইতে অপভ্রংশে 'হোংতও' বা 'হোংতউ' প্রত্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালায়—

কুথা হইতে আইল পক্ষ কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার মাতাপিতা কহ না উত্তর॥—শূ.পু. ১১ পৃ.।
এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ভ হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাহে॥—শ্রীকৃ. ৩ পৃ.।

কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে॥— ” ১০ পৃ.।
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পাইলোঁ॥—শ্রীকৃ. ৩৬২পৃ.।
তার পরে দ্বার হইতে হইয়া বাহির।
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্ম্মবীর॥—করচা, ৮ পৃ.।
বৈষ্ণনাথে স্তুতি করে সম্মুখে রহিয়া।
হিমালয় হৈতে রাবণ আনিল বহিয়া॥—চৈ.ম.-জ, ৩৬ পৃ.।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় অপাদানকারকে এখনো ‘হন্তে’ ও ‘হনে’র প্রয়োগ আছে। যথা, ‘মা হন্তে মাসীর দরদ বেশী’, ‘এখানে থাকা হনে যাওয়া ভাল’।

আবার অনেক স্থলে পঞ্চমী বিভক্তীতে ‘ত’ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—

দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ একজন॥—শূ.পু. ৭ পৃ.।
আহ্মাত অধিক কোণ দেহ আছে।
কারে করসি তোঁ ভয়॥—শ্রীকৃ. ১২৯ পৃ.।
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলো আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥—শ্রীকৃ. ২৬৮ পৃ.।

‘গাছত ফল পড়ে’, ‘পুকুরত জল আন’ ইত্যাদি। এই ‘ত’ অপাদানকারকের সংস্কৃত ‘তস্’ (তসিল্)[১] প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে।

অপাদানকারকে ‘থাকে’ বা ‘থেকে’র প্রয়োগ আছে। এই ‘থাকে’ বা ‘থেকে’ সংস্কৃত ‘স্থগিত্বা’ হইতে আসিয়াছে। থাকে, থেকে <থাকিয়া <সংস্কৃত ‘স্থগিত্বা’। ‘স্থগ্’ ধাতু ‘আচ্ছাদন’ অর্থে; আদি আর্য্যভাষায়ও ইহার অস্তিত্ব আছে। [Cf. Gk. tegos; Lat. tegere; Lith. stogas; Germ. decken; Eng. thatch.] বাঙ্গালায় আপাদানকারকে ‘থাকে’ বা ‘থেকে’র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা—

কুথা থাকে আইলেন হংস কুথা তুহ্মার ঘর।
কেবা তুহ্মার মাতা পিতা কহ না উত্তর।—শূ.পু. ১৫ পৃ.।

এখানে ‘কুথা থাকে’ মানে ‘কোথা হইতে’ অর্থাৎ ‘কোথায় আচ্ছাদিত হইয়া’ বা ‘কোথায় অবস্থানপূর্ব্বক’। এইরূপ ‘বাড়ী থেকে এসেছি’, ‘শান্তিনিকেতন থেকে যাব’ ইত্যাদি।

---

(১) পঞ্চম্যাস্তসিল্।—পাণিনি, ৫।৩।৭॥

পূর্ব্ববঙ্গে অপাদানকারকে ‘থন’ বা ‘থনে’র প্রয়োগ দেখা যায়; যথা, ‘কই থন (=কোথা হইতে) আইছ’, ‘আমার থনে (=আমা হইতে) সে ধনী’ ইত্যাদি। এই ‘থন’ বা ‘থনে’ সংস্কৃত ‘স্থানতঃ’ বা ‘স্থানাৎ’ হইতে আসিয়াছে।

বাঙ্গালা সম্বন্ধের চিহ্ন ‘এর’ (যথা, রামের, শ্যামের ইত্যাদি) সংস্কৃত ‘কৃতস্’ স্থলে প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক ‘কের’ শব্দের বিকারে উৎপন্ন। শৌরসেনী প্রাকৃতে ‘তুম্হকের’ (=তোমার), ‘অম্হকের’ (=আমার) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আছে। আবার প্রাকৃতে সম্বন্ধ বুঝাইতে ‘কেরিও’, কেরিঅ, ‘কেলক’ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—

অজ্জউত্তো বি ণাম পরকেরও।—স্বপ্নবাসবদত্তা, ৩য় অঙ্ক।
মম কেলকং পুপ্ফকরণ্ডকজিণ্ণুজ্জাণং......। মৃচ্ছ. ৯ম অঙ্ক।
মম কেরএ উডএ......। শকু. ৭ম অঙ্ক।

এই সকল প্রত্যয়ও সংস্কৃত ‘কৃতস্’ হইতে আসিয়াছে। সংস্কৃতে সম্বন্ধ বুঝাইতে ‘কৃতস্’ শব্দের প্রয়োগ আছে। আবার ‘কেরও’ হইতে ‘কেরো’ বা ‘কের’র উৎপত্তি হইয়াছে। মৈথিলী ভাষায় ‘কের’ প্রত্যয় সম্বন্ধবাচক বিভক্তি; যথা, ‘নেনাকের’ (বালকের), ‘নেনা সভকের’ (বালকদের), ‘কথাকের’ (কথার), ‘ফলকের’ (ফলের) ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় কর্ত্তা বা সম্বন্ধ বুঝাইতে ‘কর’ ও ‘কার’ যুক্ত হয়। যথা—দিবাকর, প্রভাকর, নিশাকর, শাস্ত্রকার, সূত্রকার, ভাষ্যকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার[১], মালাকার, চাটুকার ইত্যাদি। পরে এই ‘কর’ এবং ‘কার’ সম্বন্ধবাচক প্রত্যয়ে পরিণত হয়। যথা, প্রাকৃতপৈঙ্গলে (২।২৪) ‘তোকর’ ‘তোহর’ (তোর); বাঙ্গলায়—

তামাকর (তামার) পাটে বেসাতির বৈসএ হাট।
ভেটিব জে স্বরূপনারান ঘুচাহ কপাট॥—শূ.পু. ৭৩ পৃ.।

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও ‘তাকর’ (তাহার), ‘যাকর’ (যাহার) প্রভৃতি সম্বন্ধবাচক ‘কর’ প্রত্যয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়। আর সভাকার, আপনকার, এখানকার, পিছনকার, গোড়াকার, প্রথমকার, পরেকার, আগেকার, বছরকার প্রভৃতিতে সম্বন্ধবাচক ‘কার’ প্রত্যয় বিদ্যমান। তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণে সম্বন্ধবাচক ‘কর’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে; যথা—‘মূঢ়-কর প্রাণা’ (মূঢ়ের প্রাণ), ‘সব-কর’ (সকলের) ইত্যাদি। ক্রমে ‘কর’ > ‘অর’, ‘কার’ > ‘আর’, ‘কের’ > ‘এর’ এবং পরে এই ‘অর’, ‘আর’, ‘এর’ > ‘র’ ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। উড়িয়া ভাষায় ‘অর’ প্রত্যয় সম্বন্ধবাচক চিহ্ন। আবার ‘কর’,

---

(১) বৈদিক ভাষায় ‘কর্মার’ শব্দের প্রয়োগ আছে।—ঋগ্বেদ, ১০।৭২।২; অথর্ববেদ, ৩।৫।৬। এই শব্দটি ‘কর্মকার’ হইতে প্রাকৃতের ভিতর দিয়া পুনরায় সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে (কর্মকার <কর্মআর <কর্মার)।

'কার', 'কের' প্রভৃতি প্রত্যয়ের অন্ত্য'র' লুপ্ত হওয়ার ফলে হিন্দীতে 'কা' 'কী' এবং মৈথিলীতে 'ক' ষষ্ঠী-চিহ্নরূপে প্রচলিত আছে।

সর্ব্বনাম শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ' হইতে আসিয়াছে; এজন্য এই সকল পদে সানুনাসিক চিহ্নের অস্তিত্ব দেখা যায়; যথা—তাঁর, যাঁর ইত্যাদি। আবার অনেক স্থলে সানুনাসিক চিহ্নটি বিলীন হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে এখনো সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'ন' প্রত্যয় প্রচলিত আছে; যথা—'তান (তাঁহার) পোলা'; 'তান (তাঁহার) খবর পাই নাই' ইত্যাদি। প্রাচীন বাঙ্গালা ও আসামী সাহিত্যে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে সংস্কৃত 'স্য' হইতে বাঙ্গালা ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' আসিয়াছে। দীনেশবাবুও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কারণ 'স্য' হইতে 'স্স' হয়, প্রাকৃতে ষষ্ঠী বিভক্তিতে ইহার প্রয়োগ আছে। কিন্তু 'স্য' বা 'স্স' হইতে 'র'-র উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালা সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন 'এ' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুযায়ী। সংস্কৃতে সপ্তমীতে —গৃহে, বনে, উদ্যানে; প্রাকৃতে—ঘরে, বণে, উজ্জাণে; বাঙ্গলায়—গৃহে বা ঘরে, বনে, উদ্যানে। সংস্কৃতে—তপস্যায়াম্, শালায়াম্; প্রাকৃতে—তপস্সাএ, শালাএ; বাঙ্গালায় —

আন্ধাসক্তি বোলে বাপা সুন মন দিআ।
আন্ধারে তপিসসাএ পাছু থাক বিসোঁরিয়া॥—শূ.পু., ৩১ পৃ.।
একদিন শচী দেবী রন্ধন শালাএ
শিশু সঙ্গে গৌরাঙ্গ খেলে আঁগিনাএ॥—চৈ.ম.-জ., ১৬ পৃ.।

পরে এই 'এ' হইতে বাঙ্গালা সপ্তমীর চিহ্ন 'য়'-র উৎপত্তি হইয়াছে; যথা—তপস্যায়, শালায় ইত্যাদি।

সংস্কৃতে সপ্তমী স্থানে 'তস্'[1] (তসিল) প্রত্যয় হয়; বাঙ্গালা সপ্তমীর চিহ্ন 'ত' বা 'তে' সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। যথা—

সুস্তভরে তুহ্মি জখন তুল্যাছিলা হাই।
তাহাতে জনমিলান আহ্মি নাম উল্লূকাই॥—শূ.পু. ১১ পৃ.।
নারায়ন তৈল অঙ্গেতে লেপিল
সিনান করি বৈসে পাটে॥—শূ.পু., ১১৬ পৃ.।

'অঙ্গেত' পদে দুইবার সপ্তমী বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে।

(১) ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে;—পাণিনি, ৫।৩।১৪॥
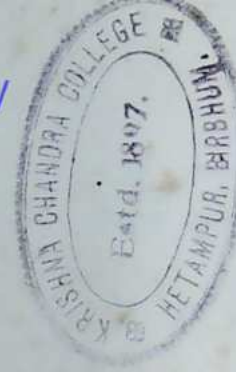
বকুল তলাত গোআলী
বড়ায়ির পন্থ নেহালি॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে॥—শ্রীকৃ. ৯ পৃ.।

দুর্জ্জন সাশুড়ী মোর ঘরতে আছএ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ॥—শ্রীকৃ. ২৫১ পৃ.।

কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্ল বদন॥—করচা, ২ পৃ.।

গায় কুরুনিঞা ঘন ঘন মুখ চায়ে।
মুখেতে চুম্বন দিয়া কোলে লুটী জায়ে॥—চৈ.ম.-জ., ৭৪ পৃ.।

মুখেতে—এখানেও দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। সপ্তমী বিভক্তির লোপ, অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব;—

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া হৈল জয় জয় ধ্বনি।
ধরণী পড়িয়া কান্দে গৌর শিরোমণি॥—চৈ.ম.-জ., ১৪ পৃ.।

এখন বাঙ্গালা বচনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। পালি ও প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই, বাঙ্গালায়ও ঠিক তাহাই। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে অনেক স্থলে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে 'আ' যুক্ত হয়; যথা—রামো—রামা; রামং—রামে, রামা; সব্বং—সব্বে, সব্বা; পিঅরো—পিঅরা; পিঅরং—পিঅরা ইত্যাদি। বাঙ্গালাতেও কয়েকটি স্থলে তাহার প্রমাণ আছে। যথা—

সফল করহ দেহা দেহ আনুমতী।
কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী॥—শ্রীকৃ. ১২৩ পৃ.।

পাঁচ জনা, কত জনা, তো সবা, বাইশ বলদা, তের ছাগলা প্রভৃতি 'আ' যোগে বহুবচন হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় আবার 'রা' দিয়া বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। এই 'রা' সম্বন্ধবাচক 'র' প্রত্যয় হইতে আগত এবং পরে বহুবচনসূচক 'আ' যুক্ত হইয়াছে। কাজেই 'বালকেরা' বলিতে 'বালকের গণ' বুঝায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় এরূপ প্রয়োগ বিরল নহে; যথা—

শুনি মিশ্র সচিন্তিত দ্রব্য সব করি।
যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণের গণকে আহরি॥—চৈ.ম.-লো., ৪০ পৃ।

বাঙ্গালাতে বহুবচনে 'সব', 'সকল', 'গণ', 'গুলি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'গণ' ও 'গুলি'-র উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। [দ্রষ্টব্য ১৯ পৃ.]

বাঙ্গালা ভাষায় সময় সময় বাহুল্যরূপে বহুবচন-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—মানুষরাসব, বালকরাসব, আমরাসব, তোমরাসব, পাতাগুলাসব, লোকগুলাসব, ফুলগুলা-সব ইত্যাদি।

'দের' ও 'দিগের' উৎপত্তি সম্বন্ধে দীনেশবাবুর মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বহুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বে শব্দের সঙ্গে শুধু 'সব', 'সকল' প্রভৃতি শব্দ যুক্ত হইত। যথা—

'তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার॥'—চৈ.ভা., আদি।

ক্রমে 'আদি' সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল। যথা—নরোত্তমবিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥

এইরূপে 'রামাদি'; 'জীবাদি' হইতে ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'রামদের' 'জীবদের' উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষাদিক', 'জীবাদিক' শব্দের সৃষ্টি স্বাভাবিক। ফলতঃ উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা—নরোত্তমবিলাসে,—

রামচন্দ্রাদিক বৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥

এই 'ক'এর 'গ'এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ) জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর র-সংযোগে দিগের এবং কর্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত 'কে'র সংযোগে দিগকে পদ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে।"

দীনেশবাবুর এই মত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করি,—

"সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ের কথা নহে। কারণ দীনেশ বাবু কেবল অকারান্ত পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইকার উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ তিনি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এবং 'রামাদিগ' হইতে 'রামদিগ' হওয়া যত সহজ 'কপ্যাদিগ' হইতে 'কপিদিগ' এবং 'ধেন্বাদিগ' হইতে 'ধেনুদিগ' হওয়া তত সহজ নহে।" —শব্দতত্ত্ব (প্রথম সংস্করণ), ৮৬ পৃ.।

এ সম্বন্ধে আমাদের দুএকটি বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি—

দীনেশবাবু ইকারান্ত ও উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু পুরাতন গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। সেখানে আদি শব্দের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ইকার বা উকারের কোনো সন্ধি হয় নাই। যথা—নরোত্তমবিলাসে—

শাকাদি ব্যঞ্জন কৈলা সিদ্ধ পক্ক আর।
ক্ষীর শিখরিণী আদি অনেক প্রকার॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন।
মহা মত্ত হৈয়া সভে করয়ে নর্ত্তন॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি কিছু নিবেদিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে॥
এথা শ্রীঅচ্যুত রঘুনন্দন শ্রীনিধি।
বাণীনাথ হৃদয় চৈতন্য যদু আদি॥

এই 'আদি' হইতে 'আদিক' এবং পরে 'আদিক হইতে 'দিগ' হইয়াছে। শুধু 'দিগ' শব্দের যোগে বহুবচনের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায়। যথা, নরোত্তমবিলাসে,—

রামচন্দ্র দিগে শিষ্য কৈলা যে প্রকারে।
বিবাহ করিয়া যৈছে গেলা ব্রজপুরে॥

এই 'দিগ' এখন বহুবচনচিহ্নরূপে প্রচলিত। আবার কেহ কেহ বলেন, ফার্সী 'দিগর' শব্দ হইতে 'দিগের' উৎপত্তি। আমরা এই মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কারণ ফার্সী 'দিগর' মানে 'অন্য'; 'গণ' বা 'সমূহ' অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ নাই এবং সব সময়ে বিশেষণরূপে বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। যথা, দীগর বার (অন্য সময়), দীগর রোজ (অন্য দিন), দীগর সাল (অন্য বৎসর, কিন্তু সাধারণত আগামী বৎসর)। কখনো কখনো বা পূরণবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা, দুদীগর (দ্বিতীয়), সিদীগর (তৃতীয়) ইত্যাদি।

'আদি' শব্দ যোগে বহুবচন শুধু নরোত্তমবিলাসে নহে, অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও দেখা যায়। যথা,—

নারকাদি কেবল এ চরণ উপাসনা।
মহাভাগবত সভে এই সে ভাবনা॥ চৈ. ম-জ. ৩৩ পৃ.।
ডাহিন বামে শোভে শত শত ভাট।
বেতাল সিংহ আদি পঢ়ে স্তবপাঠ॥ " " ৪৩ পৃ.।
কোথা লক্ষ্মী কোথা আমি কোথা এই অর্থ।
জত দেখ অর্থ আদি সকল অনর্থ॥ " " ৫০ পৃ.।
ব্রহ্মা শিব শক্র আদি যত দেবগণ।
উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন॥ চৈ. ম-লো. ৩৪ পৃ.।

বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেণীবাচক বহুবচনে 'জন', 'লোক', 'কুল', 'দল', 'বৃন্দ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা—মূর্খজন, পণ্ডিতলোক, পণ্ডিতকুল, সৈন্যদল, অরিবৃন্দ ইত্যাদি।

এই স্থলে বাঙ্গালা 'টি' প্রত্যয়ের উৎপত্তি আলোচনা করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু 'গুটি' হইতে 'টা'র উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 'গুটি' মানে 'দল'; ইহা সংস্কৃত 'গোষ্ঠী' হইতে আসিয়াছে; যথা,—

আমেদাবাদের মধ্যে বহু লোক জুটী।
প্রভুরে দেখিতে সব আসে গুটি গুটি ॥ করচা, ৬২ পৃ.।

এখানে 'গুটি গুটি' মানে 'দলে দলে', 'চুপে চুপে' বা 'অলক্ষিতভাবে' অর্থ গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী কথার সঙ্গে খাপ খায় না। 'টি' প্রত্যয় 'নির্দ্দিষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'দল' অর্থে নহে; কাজেই দীনেশবাবুর মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, এই 'টি' তেলেগু 'ত্তি' বা 'টি' প্রত্যয় হইতে আগত। তেলেগু ও চৈনিক ভাষায় প্রত্যয়রূপে বিশেষ্যের পর ইহার বহুল ব্যবহার আছে। তেলেগু 'তি' বা 'টি'র সাথে চৈনিক 'ত্তি' বা 'টি'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তেলেগু 'তি' বা টি' সম্বন্ধবাচক বা বিশেষণসূচক প্রত্যয়, চৈনিক ভাষায়ও ঠিক তাহাই দেখি। সময় সময় আবার স্বার্থে একবচনান্ত বিশেষ্যের পর ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বাঙ্গালাভাষায়ও সকল সময় একবচনান্ত বিশেষ্যের পর 'টি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। কাহারো কাহারো মতে ফার্সী 'তা' (='ভাঁজ', 'ঐক্য' ইত্যাদি; বাঙ্গালায়—'এক তা কাগজ', 'চব্বিশ তা কাগজে এক দিস্তা') হইতে বাঙ্গালা 'টা' বা 'টি' উৎপন্ন হইয়াছে।

ক্রিয়াবিভক্তি।

বাঙ্গালায় করে, খায়, হয়, আছে, নাচে, জানে, হাসে প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রাকৃতের ভিতর দিয়া সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে; যথা—করে <করোই <করোতি; খায় <খাই <খাদতি; হয় <হোই <ভবতি; আছে <অচ্ছই <অচ্ছি <অস্তি; জানে <জাণই <জানাতি।

করিতেছি, খাইতেছি, নাচিতেছি, হাসিতেছি প্রভৃতি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ শতৃপ্রত্যয়-সম্পন্ন (Present Participle) করিতে, খাইতে, নাচিতে, হাসিতে প্রভৃতির সঙ্গে 'আছি'র মিলনে উৎপন্ন। পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো এই দুইটি পদ পৃথক্‌রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে; যথা—'করিতে-আছি', 'খাইতে-আছি', 'নাইচতে-আছি', 'হাইসতে-আছি'। করিতেছিল, খাইতেছিল, নাচিতেছিল, হাসিতেছিল ইত্যাদি ক্রিয়াপদে করিতে, খাইতে, নাচিতে, হাসিতে প্রভৃতির সহিত 'আছি'র অতীতকালের রূপ 'আছিল' যুক্ত হইয়াছে।

করিয়াছি, খাইয়াছি, নাচিয়াছি, হাসিয়াছি প্রভৃতি ক্রিয়াপদ অনন্তরাদি অর্থে 'ইয়া' (<ইআ <ইঅ)-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন করিয়া, খাইয়া, নাচিয়া, হাসিয়া প্রভৃতির সঙ্গে 'আছি'র সংযোগে গঠিত। করিয়াছিল, খাইয়াছিল, নাচিয়াছিল হাসিয়াছিল ইত্যাদি ক্রিয়াপদে করিয়া, খাইয়া, নাচিয়া, হাসিয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত 'আছিল' মিলিত হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়াপদের শেষ অংশ 'আছি' বা 'আছিল' সংস্কৃত 'অস্তি' প্রাকৃতে তাহার স্থানে আদিষ্ট 'অচ্ছি' হইতে যথাক্রমে বর্ত্তমান ও অতীতকালের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অতীতকালে করিল, করিলে, করিলাম প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে; যথা—কৃত >করিল; কৃতোঽসি >করিলই >করিলে; কৃতোস্মি >করিলাম্হি >করিলাম।

সংস্কৃত কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালাভাষায় ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াবিভক্তি উদ্ভূত হইয়াছে; এইজন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় 'তুমি করিব', 'তুমি বলিব' প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নলিখিত তালিকায় ক্রম-পরিবর্ত্তন বুঝা যাইবে —

সংস্কৃত বর্ত্তমানকালের প্রথমপুরুষ বহুবচনের 'অন্তি' রূপান্তরিত হইয়া 'অন্তই' >অন্তে এবং পরে 'এন' হইয়াছে। যথা—কথয়ন্তি >কহন্তি >কহেন্ত >কহেন; *বলন্তি >বলেন্ত > বলেন ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় 'এন্ত' বা 'এন' উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয়। আবার ভবিষ্যৎ এবং অতীতকালবোধক বিভক্তির পরেও ইহার প্রয়োগ হয়; যথা—বলিব+এন=বলিবেন; করিব+এন=করিবেন; করিল+এন=করিলেন; গেল+এন=গেলেন।

বাঙ্গালায় অনুজ্ঞা অর্থে হউক, করুক, যাউক প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সংস্কৃত অনুজ্ঞা ভবতু, করোতু, যাতু প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে।

করিবেক, যাইবেক, হইবেক, পাঠাইলেক প্রভৃতি ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনো ইহা প্রচলিত আছে। মৈথিলী ও প্রাচীন আসামী ভাষায়ও ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। আবার নিমিত্তার্থে ক্রিয়াপদের উত্তর 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যায়। যথা—

শূন্যপুরাণে—

দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥—২ পৃ.।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—

এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥—৩ পৃ.।

তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥—১২ পৃ.।

নিমিত্তার্থে ক্রিয়াপদের উত্তর মৈথিলীতে ‘ক’, উড়িয়া ও দ্রাবিড়ে ‘কু’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে। যথা—মৈথিলী ‘করিবাক’, উড়িয়া ‘করিবাকু’, দ্রাবিড় ‘শেয় গিরদর-কু’।

যাব, খাব প্রভৃতি ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদে অন্ত্য‘ব’ স্থানে ‘ম’ এবং শব্দের কোমলতা-সম্পাদনের জন্য উকার-যোগ হয়; যথা—যাব >যাবঁ >যাম >যামু; খাব >খাবঁ > খাম >খামু। পূর্ব্ববঙ্গে ভবিষ্যদর্থে ‘যামু’ ‘খামু’ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অবিরল। ‘ব’ স্থানে ‘ম’-কারের প্রয়োগ অপভ্রংশ-প্রভাবে হইয়াছে। যথা, অপভ্রংশে—এম (এব), পিহিমি (পৃথিবী) ইত্যাদি।

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ভবিষ্যদর্থে উত্তমপুরুষে ‘তাম’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। এই ‘তাম’ প্রত্যয়টি সংস্কৃত লুট্ (Periphrastic Future) উত্তমপুরুষের একবচন ‘তাস্মি’ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাইতাম না (=যাইব না); খাইতাম না (=খাইব না) ইত্যাদি। (যাতাস্মি >যাতাম্হি >যাইতাম; খাদিতাস্মি >খাইতাম্হি >খাইতাম)।

বাঙ্গালা ভাষায় দেখ্‌বগে, করবগে প্রভৃতি ক্রিয়াপদের উত্তর ‘গে’ ‘গম্’ (=যাওয়া) ধাতু হইতে আসিয়াছে। দেখ্‌বগে=দেখিব গিয়া; করবগে=করিব গিয়া; মরুক্‌গে=মরুক গিয়া; করুকগে=করুক গিয়া; মৈথিলী ‘দেখবগ’ তুলনীয়।

পঞ্চম স্তবক

বঙ্গলিপির উৎপত্তি

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতবর্ষে লিপি প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবে হারাপ্পা ও সিন্ধুদেশে মহেঞ্জো-দারো তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহারা যে খৃষ্ট জন্মিবার ৩।৪ সহস্র বৎসর

পূর্ব্বের, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। হারাপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোর লিপি ভারতের প্রাচীনতম লিপি বলিয়া মনে হয়। ইহাতে চিত্রাক্ষরগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল এবং পরে ব্রাহ্মীলিপিতে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া ভাষাবিজ্ঞানের অনুরূপ হইয়াছে। প্রাচীনতম লিপিতে চিত্রাক্ষরের নানাপ্রকার অসম্পূর্ণ আকৃতি দেখা যায় এবং কালক্রমে এই লিপিই ক্রমোন্নতিলাভ করিয়া অবশেষে সুন্দর ও সুগঠিত ব্রাহ্মী-লিপিতে রূপান্তরিত হইয়া পরে অশোকলিপিতে পরিণত হইয়াছে।

হারাপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোর অক্ষরের সহিত ব্রাহ্মীলিপির অনেক মিল আছে। স্যার জন মার্শেল সাহেব (John Marshall) তদীয় ‘মহেঞ্জো-দারো এণ্ড দি ইণ্ডাস্ সিভিলিজেশন্’ (MOHENJO-DARO AND THE INDUS CIVILIZATION) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (Vol. II.) হারাপ্পা ও মহেঞ্জো-দারো এবং ব্রাহ্মীলিপির মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি সুচারুরূপে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু অনেক স্থানে আবার দেখাইতে পারেন নাই, গোঁজামিল দিয়াছেন। যথা— ১, ১২, ১৫, ৩০ ও ৩২ সংখ্যক অক্ষর।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের আদিম অধিবাসিগণ লিপির ব্যবহার জানিত। এজন্যই বোধ হয়, আর্য্যেরা প্রথমে আদিম অধিবাসীদের লিপি গ্রহণ করেন নাই। এমন কি তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বেদ যাহাতে উক্ত লিপিতে লিপিবদ্ধ না হয় তজ্জন্য বিধান করিলেন যে, যাহারা বেদ লিপিবদ্ধ করিবে তাহারা নরকগামী হইবে। যথা—

"বেদবিক্রয়িনশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকাঃ।
বেদানাং দুষকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥"

ভারতীয় আদিম লিপি মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের চিত্রাক্ষরের ন্যায় স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তবে কোনো কোনো অক্ষরের উপর চীনদেশীয় অক্ষরের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। চীনদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে চীনদেশের সভ্যতার আলোক উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীনতম লিপিতে যে চীন-দেশীয় চিত্রাক্ষরের প্রভাব থাকিবে ইহা মোটেই অবিশ্বাস্য নহে। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিবার পরেও যে ভারতের সহিত চীনদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মানবের অবয়ব বস্তুবিশেষ বা প্রাকৃতিক দ্রব্য হইতে ভারতের আদিম অক্ষরগুলি অনুকরণ করা হইয়াছে এবং এই সকলের নামানুসারে অক্ষরগুলির নামকরণ হইয়াছে। আবার তাহাদের নামকরণ কখনো কখনো চীনদেশীয় ভাষায়, কখনো কখনো বা ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ভাষায় হইয়াছে। যথা—

চৈনিক ‘কন্’ (=বাহু) শব্দের সহিত ব্রাহ্মী ‘ক’-র, চৈনিক ‘ছু’ (=হস্ত; তেলেগু

'ছে'=হস্ত)শব্দের সঙ্গে ব্রাহ্মী 'ছ'-র, চৈনিক 'জি.' (=সূর্য্য)শব্দের সহিত ব্রাহ্মী 'জ'-র, চৈনিক 'তিএন্' (=আকাশ) শব্দের সঙ্গে ব্রাহ্মী 'ত'-র, চৈনিক 'থিএং' (=ভূমি) শব্দের সহিত ব্রাহ্মী 'থ'-র, চৈনিক 'মীন্' (=তেজ, প্রভা; দ্রাবিড় 'মীন'=প্রভা, তারকা) শব্দের সঙ্গে ব্রাহ্মী 'ম'-র আকৃতিগত ও শব্দগত সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডা 'ঘাট' (=পর্ব্বত) হইতে 'ঘ'কার এবং 'ঝাণ্ডা' (=নিশান) হইতে 'ঝ'কারের উৎপত্তি। দ্রাবিড় 'বায়' (মুখ) হইতে 'ব' অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছে।

ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। তাঁহাদের অধিকাংশেরই মতে ভারতবর্ষীয় অক্ষর বিদেশ হইতে আনীত, ভারতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ভারতীয় লিপি গ্রীক্‌দিগের অক্ষর হইতে আসিয়াছে। কিন্তু গ্রীক্ অক্ষরের সহিত ভারতবর্ষীয় অক্ষরের তুলনা করিলে তাঁহাদের মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর সেমিটিক বা ফিনিসিয়লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কারণ ভারতীয় অক্ষর সেমিটিক বা ফিনিসিয়লিপির ন্যায় দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত। তাঁহাদের একটা কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, ব্রাহ্মীলিপির গতি কখনো কখনো দক্ষিণ হইতে বামে ছিল এবং অশোকলিপির কতকগুলি অক্ষর, বিশেষ করিয়া সংযুক্ত অক্ষরের কয়েকটি উল্টাভাবে লিখিত। কিন্তু সেমিটিক বা ফিনিসিয়লিপি হইতে ভারতীয় অক্ষর উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। কারণ কেবলমাত্র লিখন-প্রণালীর সাদৃশ্য দেখাইতে পারিলেই এই মতটি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহাতে উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। মহেঞ্জো-দারো ও হারাপ্পা লিপি অতি প্রাচীন; সেমিটিক বা ফিনিসিয় অক্ষরের যে সকল নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটিই তত প্রাচীন নহে; কাজেই তাহা হইতে ভারতবর্ষীয় অক্ষরের উৎপত্তি, এই মত আমাদের নিকটে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না।

ভারতীয় প্রাচীন অক্ষরের নাম ব্রাহ্মীলিপি। মহেঞ্জো-দারো ও হারাপ্পা লিপি ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ অশোকের অনুশাসনে আমরা যে অক্ষর দেখিতে পাই তাহা ব্রাহ্মীলিপিরই পরিণতিমাত্র। তিনি তাঁহার অনুশাসনগুলি উত্তরভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচার করেন। বঙ্গদেশে মহারাজ অশোকের কোনো অনুশাসন এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার অনুশাসনে দুই প্রকার লিপির ব্যবহার দেখা যায়; সাহবাজগর্‌হি ও মান্সেরা অনুশাসনে যে লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নাম খরোষ্ঠী; উহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। অপর অনুশাসনে লিপির গতি বাম দিক্ হইতে ডান দিকে। এই সকল অনুশাসনে লিপির গতি এক হইলেও সাধারণের প্রতীতির জন্য দেশভেদে অক্ষর ও ভাষা সামান্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ডক্টর ডি. আর. ভাণ্ডারকর, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় বগুড়া জেলার

মহাস্থানে মৌর্য্যযুগের একখানি অনুশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ইহাই প্রাচীনতম অনুশাসন। ইহাতে মৌর্য্যবংশের কোনো রাজা পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে অর্থ ও ধান্য দিয়া সাহায্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, মৌর্য্যযুগে বঙ্গদেশ, বিশেষ করিয়া উত্তরবঙ্গ মৌর্য্যরাজগণের অধীন ছিল। মৌর্য্যযুগে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত লিপি কালক্রমে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক বঙ্গাক্ষরে রূপান্তরিত হইয়াছে। মৌর্য্যযুগের পরে কুষাণরাজগণের প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় লিপির অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে কুষাণযুগের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, এক সময়ে উত্তরবঙ্গে কুষাণরাজগণের আধিপত্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে যে কুষাণরাজগণের স্থান আছে তাহাতে কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে মগধকে কেন্দ্র করিয়া গুপ্তরাজগণ একটি প্রবল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতীয় লিপি নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। এইযুগে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে গুপ্তলিপির তিনটি বিভিন্ন শাখা ছিল। পশ্চিম-ভারতীয় শাখা হইতে সারদা অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সারদা শাখা হইতে কালক্রমে বর্ত্তমান সিন্ধী, কাশ্মীরী ও গুরুমুখী অক্ষরের জন্ম। মধ্য-ভারতীয় লিপি হইতে নাগরী অক্ষরের উদ্ভব হয়। মধ্য-ভারতে গুপ্তরাজগণের রাজসভার অক্ষর ব্যবহৃত হইত। রাজধানী বা নগরের অক্ষর বলিয়া ইহার নাম নাগরী হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এলাহাবাদে উৎকীর্ণ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি গুপ্তযুগের প্রাচীনতম অনুশাসন বলিয়া মনে হয়। এই অনুশাসনে চন্দ্রবর্ম্মা নামক একজন বিজিত রাজার উল্লেখ আছে। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্ব্বতে খোদিত চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রবর্ম্মা এবং সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির চন্দ্রবর্ম্মা উভয়ে একই ব্যক্তি। কাজেই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বঙ্গলিপির নমুনা উক্ত শুশুনিয়া শিলালিপিতে পাওয়া যায়। রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলায় প্রথম কুমারগুপ্তের কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি মদীয় গুরু পরমশ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় বৈগ্রামে প্রথম কুমারগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন‡। এই সকল তাম্রশাসনের লিপিতে গুপ্তযুগে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত অক্ষরের নিদর্শন দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলায় লোকনাথ নামক একজন সামন্তের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে§। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গলিপি কিরূপ ছিল তাহা এই তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে

‡ Epi. Ind., Vol. XXI.

§ Epi. Ind., Vol. XV, pp. 301-315.

খড়্গ নামক এক নোতুন রাজবংশের উদ্ভব হয়। ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় খড়্গাবংশীয় রাজগণের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পালরাজগণের পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার পরিচয় উক্ত দুইখানি তাম্রশাসনে পাওয়া যায় *।

প্রাচ্যলিপির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পালরাজগণের প্রভাব সামান্য নহে। মহীপালদেবের (৯৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ) পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে§। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে আর একখানি গ্রন্থ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন†। নয়পালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে‡। বঙ্গলিপির ক্রমপরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে পালযুগের উক্ত দুইখানি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

খৃষ্টীয় একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীর বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রস্তরফলকের উৎকীর্ণ শিলালিপির অক্ষর দেখিলে উক্ত প্রস্তরফলকের অক্ষর এখনকার বাঙ্গালা অক্ষরের অনেকটা আকার ধারণ করিয়াছে বুঝা যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বরূপসেনের উৎকীর্ণ তাম্রশাসনের অনেকগুলি অক্ষর একেবারে বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরের মত; আবার কতকগুলি অক্ষরে বঙ্গলিপির অপেক্ষাকৃত পুরাতন রূপ দেখা যায়। এই বিশ্বরূপসেন লক্ষ্মণ-সেনের পুত্র, বল্লালসেনের পৌত্র এবং বিজয়সেনের প্রপৌত্র। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি ভিন্ন অন্যান্য অক্ষর আধুনিক বঙ্গলিপির অনেকটা অবয়ব ধারণ করিয়াছে;—
(১) খ (২) ঋ (৩) চ (৪) ছ (৫) ট (৬) ণ (৭) ভ (৮) শ (৯) হ।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের আকার জানিতে হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথিগুলির মধ্যে কয়েকখানিতেও ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গলিপির সমুদয় অক্ষর মোটামুটি আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত উড়িয়া লিপি, মৈথিল লিপি এবং নেপালী বা নেওয়ারী অক্ষরের সহিত সমসাময়িক বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। আসামী লিপি বাঙ্গালা অক্ষরেরই রূপান্তরমাত্র; উভয়ের পার্থক্য অতি সামান্য।

---

* Proceedings of the A. S. B., March 4, 1885. and Mr. Ganga Mohan Laskar's Memoirs of the A. S. B., Vol. I, No. 6, pp. 85-91.

§ Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 101.

† Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899, p. 69.

‡ Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 175. No. Add. 1688.

ষষ্ঠ স্তবক

বাগ্‌যন্ত্র (The Organs of Speech)

ধ্বনি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বাগ্‌যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার; কারণ বাগ্‌যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে ধ্বনি-তত্ত্বের তথ্য বুঝা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। আর বাগ্‌যন্ত্রের বিষয় জানা থাকিলে ধ্বনির উৎপত্তিস্থান ও পরিবর্ত্তন অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব প্রথমত এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে।

বাগ্‌যন্ত্র প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত:—মুখবিবর (Passage of Mouth), নাসিকাবিবর (Nasal cavity), কণ্ঠনাল (Larynx) এবং শ্বাসপথ (Windpipe or trachae)।

প্রকৃতপক্ষে ফুস্‌ফুস্ (Lungs) বাগ্‌যন্ত্রের অন্তর্গত। কারণ ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া ব্যতীত ধ্বনির উৎপত্তি হইতে পারে না। আমাদের বুকের দুই পাশে দুইটি ফুস্‌ফুস্ আছে। মুখ ও নাসিকাবিবরদ্বয় হইতে গলমুখ (Pharynx) ও শ্বাসপথ দিয়া ফুসফুসে এবং ফুস্‌ফুস্ হইতে ঐ একই পথ দিয়া মুখ ও নাসিকা বিবরদ্বয়ে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে। ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু মুখ ও নাসিকাবিবরদ্বয় দিয়া বাহির হইবার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে বাধা পাইয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। সুতরাং এই নির্গত বায়ুই শব্দের প্রাণ এবং ফুস্‌ফুস্‌ই ঐ বায়ুর উৎস।

মুখবিবরে ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, জিহ্বা ও তালু আছে। ইহাদের সাহায্যে ধ্বনিকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করা হয়। ওষ্ঠের সাহায্যে ওষ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ এবং দন্তের সাহায্যে দন্ত্য ও দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ উচ্চারিত হয়। মুখবিবরের ছাদ বা তালু দুই ভাগে বিভক্ত—কঠিনতালু (Hard Palate) এবং স্নিগ্ধতালু (Soft Palate or Velum)। সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ববিদেরা কঠিন তালুকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—তালু এবং মূর্দ্ধা। তালু হইতে তালব্য ও কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ এবং মূর্দ্ধা হইতে মূর্দ্ধন্য বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করাই জিহ্বার কাজ। ইহার মূল (Back), পৃষ্ঠ (Front) বা অগ্র (Blade) দ্বারা নির্গত বায়ুকে কণ্ঠে, তালুর ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে বা উপস্থিত দন্তে আংশিকরূপে বা সম্যগ্‌রূপে বাধা দিয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি করে। নীচের চোয়াল (Jaw) এবং ওষ্ঠদ্বয় কখনো কখনো জিহ্বার সহযোগে, কখনো কখনো বা অসহযোগে নির্গত বায়ুকে বাধা দিয়া শব্দ উৎপাদন করে।

নাসিকাবিবর একটি ত্রিকোণবিশিষ্ট গহ্বর। ইহার সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে দুইটি দ্বার এবং মাঝখানে একটি প্রাচীর (Septum) আছে। নাসিকাবিবর পশ্চাদ্দিকে

শ্বাসপথ ও গলের (Gullet, বা Oesophagus) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে বায়ু নাসিকাবিবর দিয়া যাতায়াত করে। নির্গত বায়ু নাসিকাবিবরে প্রতিহত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে এবং ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

গল-মুখের উপরিভাগে ও স্নিগ্ধ তালুর পশ্চাদ্ভাগে জিহ্বার মত ছোট যে মাংস ঝুলে তাহাকে অলিজিহ্বা (Uvula) বলে। অলিজিহ্বার পিছনে নাসিকা-বিবরের দ্বার, এবং সময় সময় এই দ্বার স্নিগ্ধ তালু দ্বারা বন্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণত শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

কণ্ঠনালের নিম্নাংশ হইতে শ্বাসপথের আরম্ভ হইয়াছে। কণ্ঠনালের প্রথমাংশটিকে প্রতিজিহ্বা (Glottis) বলে এবং এই প্রতিজিহ্বার উপরে উপজিহ্বা (Epiglottis) নামে একটি উপাস্থির (Cartilage) ঢাকনি আছে। খাদ্য গিলিবার সময়ে, পাছে উহা খোলা কণ্ঠনালে চলিয়া যায়, এজন্য উক্ত ঢাকনিটি দ্বারা কণ্ঠনালের মুখ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া খাবার প্রতিজিহ্বার উপর দিয়া একেবারে গলে যাইয়া পড়ে। গল শ্বাসপথের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। গলার সম্মুখে ও মাঝে উচ্চ ত্রিকোণবিশিষ্ট উপাস্থিনির্ম্মিত গহ্বরটির মধ্যে ধ্বনি-উৎপাদনের একটি যন্ত্র আছে; ইহাকে কণ্ঠনাল-পেটিকা (The box of the larynx, বা "Adam's apple") বলে। এই পেটিকার ভিতরে দুইধারে সরু, কম্পনশীল ও বর্দ্ধনক্ষম (elastic) দুইটি ঘোষ-তন্ত্রী (Vocal chords) আছে। সাধারণত শ্বাসপ্রশ্বাসকালে এই দুইটি তন্ত্রী পৃথক্-পৃথক্ থাকে এবং ইহার ফলে বায়ু অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু ধ্বনি-উৎপাদন কালে উভয়ে প্রায় সংযোজিত হয়; তখন বায়ু ফুস্ফুস্ হইতে সবেগে বহির্গত হইয়া কণ্ঠনালস্থ ঘোষতন্ত্রীদ্বয়কে কম্পিত করে এবং ঐ কম্পনের ফলে নিকটস্থ বায়ু তরঙ্গিত (vibrated) হইয়া ধ্বনির সৃষ্টি করে। আর সেই ধ্বনি মুখবিবরে জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠদ্বয়ের সাহায্যে এবং নাসিকাবিবরে ভিন্ন-ভিন্ন শব্দে রূপান্তরিত হয়।

যখন ঘোষতন্ত্রী-দ্বয় মধ্যে বায়ু নির্গমনের একটু পথ থাকে, তখন নির্গত বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ফিস্-ফিসের (Whisper) সৃষ্টি করে। আর যখন উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বায়ুনির্গমনপথ এরূপভাবে রুদ্ধ হয় যে, বায়ু সহজে নির্গত হইতে পারে না, তখন স্নায়ুগুলি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অবরুদ্ধ বায়ু তরঙ্গিত অবস্থায় বহির্গত হইয়া ঘোষ (Voice) উৎপাদন করে।

ফুস্ফুস্ হইতে বায়ু	ঘোষ-তন্ত্রী	অতরঙ্গিত ———> ফিস্ফিস্।
ফুস্ফুস্ হইতে বায়ু	ঘোষ-তন্ত্রী	তরঙ্গিত ~~~~~~> ঘোষ।

স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ ইহাদিগকে ঘোষ বা তরঙ্গিত বর্ণ বলে। আর বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ ষ স ইহাদিগকে অঘোষ বা অতরঙ্গিত বর্ণ বলা হয়।

ধ্বনি-তত্ত্ব

ধ্বনি (Speech-sounds) দুই প্রকার—স্বর ও ব্যঞ্জন। যে সকল ধ্বনি অন্য কোনো সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র প্রকাশিত বা উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্বর বলে। স্বর উচ্চারণ-কালে প্রতিজিহ্বা (Glottis) সঙ্কুচিত হয় এবং শ্বাস-বায়ু ফুস্ফুস্ হইতে সবেগে নির্গত হইয়া উন্মুক্ত মুখবিবরে বাধামুক্ত অবস্থায় স্বর-ধ্বনির সৃষ্টি করে। আর শ্বাস-বায়ু ফুস্ফুস্ হইতে সবেগে বহির্গত হইয়া মুখবিবরে অল্প-বিস্তর বাধা প্রাপ্তির ফলে যে ধ্বনির উৎপাদন করে তাহাকে ব্যঞ্জন বলা হয়। কণ্ঠনালের উপরে যে-কোনো স্থানে আবর্ত্তিত স্বরকে ছাড়িয়া ব্যঞ্জন থাকিতে পারে না। ব্যঞ্জনকে স্বরই ব্যক্ত করে; স্বর প্রাণ এবং ব্যঞ্জন দেহ। এজন্য সিংহলীতে স্বরকে 'পণকুরু' অর্থাৎ 'প্রাণাক্ষর' ও ব্যঞ্জনকে 'গতকুরু' অর্থাৎ 'গাত্রাক্ষর' এবং তামিল ভাষায় স্বরকে 'উয়ির' অর্থাৎ 'প্রাণ' ও ব্যঞ্জনকে 'মেয়' অর্থাৎ 'গাত্র' বলা হয়। তিব্বতীতেও স্বরকে 'স্রোগ্-চন্' অর্থাৎ 'প্রাণবান্' এবং ব্যঞ্জনকে 'স্রোগ্-মেদ' অর্থাৎ 'প্রাণহীন' বলে।

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাহাকে বর্ণ (Letter) বলে। অক্ষর (Syllable) বলিতে সাধারণত স্বরকে বুঝায়; যথা—অ, আ, ই, উ ইত্যাদি। অক্ষর বা স্বরের উচ্চারণকালে তাহার দুই পাশের ব্যঞ্জনসমূহের মধ্যে যতগুলিকে পারে নিজের সুবিধামত একসাথে টানিয়া লয়—ইহাই অক্ষর বা স্বরের বিশেষত্ব। একটা পদে যতগুলি বর্ণ থাকে ততগুলি অক্ষর না থাকিতেও পারে। যেমন, ঘট, এখানে দুইটি বর্ণ আছে,—ঘ ও ট; আবার ঘট-, এখানে দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর, কিন্তু ঘ ট উচ্চারণকালে একটি স্বর, একটি অক্ষর, এখানে ঘকার-স্থিত অ-কারে ঝোঁক পড়ায়, টকার-স্থিত অ দুর্ব্বল হইয়া গ্রস্ত অর্থাৎ অনুচ্চারিত হইল। ঘকার-স্থ অ টকার-স্থ অকারের মাত্রা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কাজেই ঘকার-স্থিত অ দীর্ঘ। ঘট ও ঘটী শব্দকে পাশাপাশি ফিস্-ফিস্ (whisper) করিয়া উচ্চারণ করিলেই উভয়ের পার্থক্য ধরা পড়িবে *। যদি কোনো শব্দে অনেকগুলি অক্ষর থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কোনো দুইটি অক্ষরের মাত্রার প্রভেদ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য অক্ষরকে মনে মনে উচ্চারণ করিয়া কেবলমাত্র সেই দুইটি অক্ষরকে ফিস্-ফিস্ করিয়া উচ্চারণ করিলেই মাত্রার তারতম্য অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে †।

* In examining the force of any sound-group it is a great help to whisper it, which gets rid of any disturbing changes of pitch.—Henry Sweet, A Primer of Phonetics, Third Edition, 1906, § 103, p. 48.

† The surest way of determining the relative force of any two syllables is to pronounce the other syllables *mentally* only, or in a whisper, pronouncing the special syllables aloud, and their relative force will then come out clearly.—Henry Sweet, A Primer of Phonetics, Third Edition, 1906, § 109, p. 50.

বাঙ্গালা উচ্চারণসম্বন্ধে আলোচনা করার আগে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে উচ্চারণের রীতি বিভিন্ন; কাজেই যে সকল বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, কেবলমাত্র তাহাদেরই আলোচনা করিব।

অ

অকারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ; সুতরাং ইহাকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে। প্রাচীন কাল হইতেই অকারের উচ্চারণে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। অকারের উচ্চারণ দুই প্রকার; যথা, (১) সংবৃত অর্থাৎ গলার ফাঁককে সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারণ করা এবং (২) বিবৃত অর্থাৎ গলার ফাঁককে খোলা রাখিয়া উচ্চারণ করা। অকারের দীর্ঘ আকার; কাজেই আকার উচ্চারণকালে আমাদের গলার ফাঁক যে ভাবে থাকে, যদি কতকটা ঐ ভাবে অকার উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ বজায় থাকে এবং উক্তরূপ উচ্চারিত অকারের সহিত আকারেরও মিল থাকে; অন্যথা অকারের দীর্ঘ আকার হইতে পারে না। বৈদিক সাহিত্য, প্রাতিশাখ্য, পাণিনি-ব্যাকরণ এমন কি আবেস্তার ভাষায়ও বহুস্থলে অকারের বিকৃত উচ্চারণ দেখা যায়। ভারতবর্ষের আর্য্যভাষামূলক সকল প্রাদেশিক ভাষায় এইরূপ অকারের বিকৃত উচ্চারণ দৃষ্ট হয়। দ্রাবিড় ভাষায়ও যেখানে যেখানে আর্য্য ভাষার প্রভাব, সেখানে যে-কোনো রূপেই হউক অকারের বিকৃত উচ্চারণের কিছু না কিছু চিহ্ন আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় অকারের বিবৃত বা খোলা উচ্চারণের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—প্রাচীন বাঙ্গালায়, আঙ্গ (অঙ্গ), আচেতন্ (অচেতন), আঞ্চল (অঞ্চল), আঞ্জলী (অঞ্জলি), আনেক (অনেক), আতি (অতি), আধিক (অধিক), আধিকার (অধিকার), আনন্ত (অনন্ত), আনল (অনল), আনুপাম (অনুপম), আনেক (অনেক), আন্ত (অন্ত), আন্ধকার (অন্ধকার), আপমান (অপমান), আপরাধ (অপরাধ), আভাগী (অভাগী), আলঙ্কার (অলঙ্কার), আবুধ (অবোধ), আষ্ট (অষ্ট), আসুখ (অসুখ), আসুর (অসুর), আন্ধার (অন্ধকার) ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায়, আষ্টাঙ্গে (অষ্টাঙ্গে), আসিদ্ধ (অসিদ্ধ), আগনা (অগণা), আছোলা (অছোলা), আচষা (অচষা), আকাটা (অকাটা), আলুনি (অলুনি, অলবণ), আকাল (অকাল), আতেলা (অতেলা, অতৈল), অজাগর (অজগর), আজানা (অজানা) প্রভৃতি।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালায় অ-কার হ্রস্ব। কিন্তু গ্রস্ত অর্থাৎ অনুচ্চারিত অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কার দীর্ঘ হয়। উদাহরণ—ফল, বণ, মত, গণ, কণ, বক ইত্যাদি। এই সকল শব্দের পরের ব্যঞ্জন-স্থিত অ-কার গ্রস্ত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন-স্থিত অ-কার

ইহার মাত্রা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ হইল। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি; কতক পরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে।

অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ (=ও) সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে, এস্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ই, ঈ অথবা উ, ঊ কিংবা ই-কারান্ত বা উ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ হয়। যথা—রবি, মতি, মণি, অগ্নি, কবি, ছবি, নদী, নবীন, মরু, তরু, মধু, যদু, বধূ ইত্যাদি। এই প্রকারের পরিবর্ত্তন-রীতির মূলে স্বর-সঙ্গতি (Vocalic Harmony বা Harmonic Sequence)। রবি, মতি, মরু, তরু ইত্যাদি শব্দের প্রথম অক্ষরের অ-কার পরবর্ত্তী অক্ষরের ই-কার বা উ-কারের আকর্ষণে, ই বা উ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য আনিবার জন্য নিজেই ও-কারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ই, এ, অ্যা* এবং আ'-র † উচ্চারণকালে জিহ্বা মুখবিবরের সম্মুখ-ভাগে অল্পে অল্পে উত্তোলিত হয়। ই-কার উচ্চারণে জিহ্বা উচ্চে উঠে, এ-কারের বেলায় মধ্যভাগের কিঞ্চিৎ উপরে, অ্যা-র বেলায় মধ্যভাগের কিঞ্চিৎ নীচে এবং আ'-র বেলায় নিম্নে অবস্থান করে। আবার উ, ও, অ এবং আ-র উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের পশ্চাদ্ভাগে ক্রমে ক্রমে উত্তোলিত হয়। উ-কার উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধ্য-ভাগের কিঞ্চিৎ উপরে, অ-র বেলায় মধ্যভাগের কিঞ্চিৎ নীচে এবং আ-র বেলায় নিম্নে থাকে। 'রবি'র ই-কার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে 'র'-র অ-কারও কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া ও-কারে রূপান্তরিত হয়। তদ্রূপ 'মরু'-র উ-কার উচ্চারণকালে জিহ্বা উপরে উঠে, তাই ইহার প্রভাবে 'ম'-র অ-কার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়। নিম্নের চিত্রে স্বরবর্ণ উচ্চারণকালে মুখবিবরে জিহ্বার অবস্থান এবং কেমন করিয়া উচ্চাবস্থিত স্বর নিম্নাবস্থিত স্বরকে উপরে টানিয়া লয় ও নিম্নাবস্থিত স্বর উচ্চাবস্থিত স্বরকে নীচে নামাইয়া লয়, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে

স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থিতি

* অ্যা—এক (অ্যাক), লেজ (ল্যাজ) প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি।

† আ' = চা'র (<চাইর<চারি), কা'ল (<কাইল<কালি) প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি।

প্রভেদ থাকিলেও বাঙ্গালায় ঈ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব, কেবল নামে ও লেখনেই ইহার অস্তিত্ব। বাঙ্গালায় ইতর এবং ঈষৎ-এর 'ই' ও 'ঈ' উচ্চারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। কেবলমাত্র তৎসম শব্দে দীর্ঘ স্বরের প্রয়োজন; অন্যথা বাঙ্গালা ভাষা হইতে দীর্ঘস্বরের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে শিশুদের পক্ষে মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করা অনেকটা সহজ হইত এবং গুরুমহাশয়দের চপেটাঘাত বা বেত্রাঘাত হইতে উহারা কতকটা নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিত।

গ্রস্ত অ-কারের পূর্ববর্তী ই-কার এবং ঈ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যেমন—তিন, ইট বা ইট, খিল, বিশ, শিব, ডিম, হিম, তীর, চিন, চিন, কীট, বীর, বীজ, শীত, গীত ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন বর্ণের পরবর্তী ই-কার কখনো কখনো নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনের আগে বসে। যথা—আজি >আইজ, কালি >কাইল, জাতি >জাইত, চারি >চাইর, রাতি > রাইত, কলিকাতা >কইলকাতা ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের ভাষায় এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই সাধারণ। স্বরধ্বনির এইরূপ পরিবর্তনের নাম অপিনিহিতি (Epenthesis)। আবার অপিনিহিতির প্রভাবে ই-কার ব্যঞ্জনের আগে আসিয়া পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ও রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ—কাটিয়া >কাইট্যা >কেট্যা > কেটে, হাঁটিয়া >হাঁইট্যা >হেঁট্যা >হেঁটে, রাখিয়া >রাইখ্যা >রেখ্যা >রেখে, মাখিয়া >মাইখ্যা >মেখ্যা >মেখে, ভাবিয়া >ভাইব্যা >ভেব্যা >ভেবে, করিয়া >কইর‍্যা >ক'রে >কোরে, জালিয়া >জাইল্যা >জেলে ইত্যাদি। এই ধ্বনি পরিবর্তনের নাম অভিশ্রুতি (Umlaut বা Vowel Mutation)।

—∘—

উ, ঊ

ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, কাজেই ইহারা ওষ্ঠ্য বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত ও সম্মুখ দিকে প্রসৃত, মুখবিবর স্বল্পপরিসর এবং জিহ্বার একটু সঙ্কোচ হয়। উ-কারের দীর্ঘ ঊ-কার। বাঙ্গালায় উভয়েরই হ্রস্ব উচ্চারণ। 'উপমা' এবং 'ঊনিশ' শব্দের 'উ' ও 'ঊ'-র উচ্চারণে কোনো প্রভেদ নাই। তবে গ্রস্ত অ-কার পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী উ-কার ও ঊ-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। উদাহরণ—চুণ, চুল, গুণ, গুড়, কুল, মুখ, বুক, যুগ, ফুল, সুখ, বুধ, কূল, মূল ইত্যাদি। ই-কারের মত উ-কারও অপিনিহিত এবং অভিশ্রুত হয়। অপিনিহিতি, যথা—চক্ষু >চক্‌খু >চখু >চউখ, সাধু >সাউধ, দদ্রু >দদ্দু >দাদু >দাউদ ইত্যাদি। অভিশ্রুতি, যথা—চউখ >চোখ, জলুয়া >জউল্যা >জোলো প্রভৃতি।

ঋ

ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, কাজেই মূর্দ্ধন্য বর্ণ। ঋ-কারকে বিশুদ্ধ স্বর বলা যায় না; কারণ এই বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র মূর্দ্ধাকে প্রায় স্পর্শ করে কিন্তু নির্গত বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেয় না বলিয়া ইহা স্বরান্তর্গত, অন্যথা ব্যঞ্জন মধ্যে গণ্য হইত। বাঙ্গালা ভাষায় ঋ-কার ও র-কারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব; এজন্য উভয়ের উচ্চারণে বড় গোলমাল হয়। আমরা ঋ-কারের উচ্চারণ ঠিক মত করিতে পারি না। আমরা লিখি 'ঋতু' কিন্তু উচ্চারণ করি 'রিতু'। কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই ঋ-কারের উচ্চারণে এইরূপ গোলমাল হইয়াছে। এই গোলমাল হইত বলিয়াই সংস্কৃতে ঋ-কার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন নানারূপে দেখা দিয়াছে। ইহা বিশুদ্ধ স্বর নয় বলিয়া কখনো কখনো স্বরাদি রূপে, কখনো কখনো বা ব্যঞ্জনাদি রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। (১) স্বরাদিরূপে, যেমন—(ক) ঋ = অর্, যথা, কৃ—করোতি; (খ) ঋ = ইর্, যথা, কৃ—চিকীর্ষতি; (গ) ঋ = উর্, যথা, কৃ—কুরু; (ঘ) ঋ = এর্, সংস্কৃতে প্রয়োগ নাই, কিন্তু সহোদরা আবেস্তায় আছে; যথা, কৃত—কেরেত। (২) ব্যঞ্জনাদিরূপে, যেমন—(ক) ঋ = র, যথা, √কৃ – ক্রতু; (খ) ঋ = রি, যথা, √কৃ – ক্রিয়তে; (গ) ঋ = রু, যথা, √দৃ – দ্রু (>দারু); (ঘ) ঋ = রে, যথা, গৃহ > *গ্রেহ >গেহ। পালি ও প্রাকৃতে ঋ-কার স্বর ও ব্যঞ্জনরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। (১) স্বররূপে, যেমন—(ক) ঋ = অ, যথা, বৃষল >বসল (খ) ঋ = ই, যথা, দৃষ্ট >দিট্‌ঠ; (গ) ঋ = উ, যথা, বৃত্তান্ত >বুত্তন্ত; (ঘ) ঋ – এ, যথা, বৃহৎফল >বেহপ্‌ফল। (২) ব্যঞ্জনরূপে, যেমন—ঋ = রি, যথা, ঋতে >পালি 'রিতে', ঋষি >প্রাকৃত 'রিসি'। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঋ-কার স্থানে স্থলবিশেষে 'ই', 'ইরি' ও 'রি' দেখা যায়। যথা—মিগ (মৃগ), কিরিপণ (কৃপণ), রিতু (ঋতু), প্রিথিবী (পৃথিবী) ইত্যাদি। আধুনিক কথ্য বাঙ্গালায় ঋ-কার স্থলে স্থানবিশেষে 'ই' 'এ' ও 'ইর' হয়। যথা—বিষ্টি (বৃষ্টি), দিষ্টি (দৃষ্টি), ছিষ্টি (সৃষ্টি), তেষ্টা (তৃষ্ণা), কেষ্ট (কৃষ্ণ), গিরস্থ (গৃহস্থ), মিরগী (মৃগী = মূর্চ্ছারোগ) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় ৠ-কারের কোনো আবশ্যকতা নাই, কাজেই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ঌ

ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। এই বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র উপরের দন্ত-পঙ্‌ক্তিকে প্রায় স্পর্শ করে বলিয়া ইহাও বিশুদ্ধ স্বর নহে। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ 'লি-'র মত

হয়। এজন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় 'লি' স্থানে ঌ-কারের প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—ঌপি (লিপি), ঌলা (লীলা) ইত্যাদি। সংস্কৃতে একমাত্র 'কৢপ্ত' শব্দ ছাড়া ঌ-কারের কোনো অস্তিত্ব নাই; প্রাকৃতেও তাহাকে দেখা যায় না। আধুনিক বাঙ্গালাভাষা হইতেও ঌ-কার বিদায় নিয়াছে।

বাঙ্গালায় ৡ-কারের স্থান নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় দুই একটি স্থানে 'লী' স্থানে ৡ-কার দেখা যায়; যথা—ৡন (লীন)।

এ

একারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; কাজেই ইহা কণ্ঠ-তালব্যবর্ণ। একার সন্ধ্যক্ষর (diphthong—Gk. dis=twice; phthongos=a sound), কণ্ঠ্য অকারের এবং তালব্য ইকারের সন্ধিতে ইহার উৎপত্তি; ইহা একটি দীর্ঘ স্বর। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় একার হ্রস্ব ও দীর্ঘ; এজন্য ইহার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়—(১) দীর্ঘ বা বিশুদ্ধ 'এ' (২) হ্রস্ব বা বিকৃত 'এ' অর্থাৎ 'অ্যা'। এই 'অ্যা' উচ্চারণে সন্ধ্যক্ষরের কতকটা মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অ+ই-কারের মিলনে একারের জন্ম। অ+ই >অ+য >অ্যা—এখানে য-কার ইকার হইতে উৎপন্ন এবং এই 'য' অর্দ্ধোচ্চারিত বলিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অকার দীর্ঘ হইয়াছে।

ইকার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অথবা উকার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একার বিকৃত হয় না। ইহার কারণ স্বরসঙ্গতি। একটি, বেটী, জ্যেঠী প্রভৃতি শব্দের 'ই' বা 'ঈ' উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে উঠে এবং ইহার আকর্ষণে একার আর নীচের দিকে নামিতে পারে না। তদ্রূপ, একুশ, এক্টু প্রভৃতি শব্দের উকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উপরে উঠে এবং ইহার প্রভাবে একারের আর অধোগতি হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে এ-কারের দীর্ঘ বা বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়।

আকার পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের বিকার ঘটে। যথা—বেলা (ব্যালা=সময়), খেলা (খ্যালা), খেল্না (খ্যাল্না), লেজা (ল্যাজা), পেঁচা (প্যাঁচা), চেলা (চ্যালা=শিষ্য), দেখা (দ্যাখা) ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্ত্তন স্বরসঙ্গতির প্রভাবে হইয়াছে। নিম্নাবস্থিত আকারের আকর্ষণে উচ্চাবস্থিত একার অ্যা-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু 'বেলা' (সমুদ্রতীর), 'বেলা' (বেলি ফুল) এবং 'তেলা'-র পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। কারণ বাঙ্গালা ভাষায় 'সমুদ্রের তীর' অর্থে 'বেলা' শব্দের প্রয়োগ খুবই কম; কাজেই যেখানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়, সেখানেই সংস্কৃতের ঝোঁক (accent) রক্ষা করিয়া থাকে। সংস্কৃতের মত প্রথম স্বরে অর্থাৎ বকারস্থ একারে ঝোঁক পড়ায় একার বিকৃত হয় নাই। 'বেলা'র (বেলিফুল)

একার ইকারজাত [যথা—বল্লি >বইল্ল >বেল্ল >বেল+অ (<'ক' স্বার্থে) >বেলা]; কাজেই পরে আকার থাকিলেও একারের বিকার হয় নাই। তদ্রূপ 'তেলা',-র একার ঐকারজাত বলিয়া [যথা—তৈল >তেল্ল >তেল+আ (বিশেষণে) >তেলা] পরবর্ত্তী আকার নিষ্কর্ম্মা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারজাত একারের কোনো বিকৃতি হয় না। যথা—গেলা (<√গিল্ <√গৃ), মেলা (<√মিল্), ছেঁড়া (<√ছিন্দ্ <√ছিদ্), ইত্যাদি। কারণ, ইকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থান একার অধিকার করিয়াছে; ইকারজাত একারের সঙ্গে ইকারের যোগ আছে বলিয়া একারকে অতিক্রম করিয়া একেবারে অ্যা-তে যাওয়া জিহ্বার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু আকারযুক্ত চকার পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ই-জাত একারের বিকার ঘটে। যথা—বেচা (ব্যাচা—<বি+√ক্রী), সেঁচা (স্যাচা—<√সিঞ্চ্ <√সিচ্) ইত্যাদি। কারণ বাঙ্গালায়, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় চ-বর্গের দন্ত-তালব্য উচ্চারণ হয়; ইহার ফলে জিহ্বা তালুকে স্পর্শ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে দন্তের দিকে গড়াইয়া পড়ে। ইহার আকর্ষণে এবং পরবর্ত্তী আকারের প্রভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী একার বিকৃত হয়। 'জনতা' অর্থে 'মেলা' (ম্যালা) শব্দের একার বিকারজনক। কারণ এই শব্দটি সংস্কৃত 'মেলক' (বিশেষ্য) হইতে আসিয়াছে; 'মিল্' ধাতুর সঙ্গে ইহার গৌণ সম্বন্ধ।

অকারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার বিকৃত হয়। যথা—তের, তেঁদড়, টেঁড়শ, গেল, কেন, যেন, হেন, কেমন, এমন, যেমন (কিন্তু 'কেবল শব্দের বেলায় এ নিয়ম খাটে না, যদিও পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য উচ্চারণে ইহার বিকার হয়) ইত্যাদি। এখানে স্বরসঙ্গতির প্রভাবে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নিম্নাবস্থিত অকারের আকর্ষণে উচ্চাবস্থিত একার অ্যা-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রস্ত অর্থাৎ অনুচ্চারিত অ-কার পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের বিকৃতি হয় না। যথা—কেশ, খেদ, তেল, পেট, প্রেম, বেদ, বেল, বেশ, হেঁট, হেম ইত্যাদি। কারণ পরবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হওয়ায় তাহার মাত্রা টানিয়া লইয়া একার দীর্ঘ হইয়াছে। আবার 'এক' শব্দ উচ্চারণে ক-কারস্থ অকার গ্রস্ত হইলেও একার বিকৃত হয়। কারণ প্রাকৃত 'এক' শব্দের একার হ্রস্ব; কাজেই প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আগত 'এক' শব্দ প্রাকৃত উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। 'ফেন' (ফ্যান) শব্দের একারও বিকৃত। এই শব্দটি 'স্ফায়্' ধাতু হইতে উৎপন্ন; 'আয়্' হইতে একারের উৎপত্তি বলিয়া ইহার বিকার হইয়াছে। চ-বর্গের দন্ত-তালব্য উচ্চারণ হেতু গ্রস্ত চকার কিংবা জকারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার বিকৃত হয়। যথা—পেঁচ (প্যাঁচ), লেজ (ল্যাজ)। কিন্তু ইকার বা ঐকার-জাত একারের পরে গ্রস্ত 'চ' বা 'জ' থাকিলে তাহার বিকৃতি ঘটে না। যথা—সেঁচ (<√সিঞ্চ <√সিচ্), তেজ (<√তিজ্), শেজ (<শয্যা,) বেজ (<বৈদ্য) ইত্যাদি।

একার পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের বিকৃতি হয় না। যথা—গেলে, মেলে ইত্যাদি। কারণ একই স্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া কোনো প্রকার আকর্ষণ হয় না।

ঐ

ঐকারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; এজন্য ইহাকে কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ বলে। অকার এবং একারের সংযোগে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহা সন্ধ্যক্ষর। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'আ ই' (অ+এ=অ+অ+ই=আ+ই)। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সময় ইহার উচ্চারণ 'অ ই' হয়। যথা—অই (ঐ), শইল (শৈল), মইত্র (মৈত্র), চইত্র (চৈত্র), তইল (তৈল) ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতের অনুযায়ী।

ও

ওকারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; কাজেই ইহা কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ। অকার এবং উকারের সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে সন্ধ্যক্ষর বলা হয়। ওকারের কণ্ঠৌষ্ঠ্য উচ্চারণ হেতু শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা কখনো কখনো কতকটা অকাররূপে, কখনো বা উকাররূপে উচ্চারিত হয়। যথা—চোর স্থানে চ'র বা চুর; ভোর স্থানে ভ'র বা ভুর; কোণ স্থানে ক'ণ বা কুণ; ঘোড়া স্থানে ঘ'ড়া বা ঘুড়া ইত্যাদি।

ঔ

ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; এজন্য ইহাকেও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়। অকারের সহিত ওকারের সন্ধিতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাও সন্ধ্যক্ষর। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'আ উ' (অ+ও=অ+অ+উ=আ+উ)। বাঙ্গালা ভাষায় সময় সময় ঔকার স্থানে 'অ উ' উচ্চারিত হয়। যথা—পউষ (পৌষ), গউর (গৌর), গউরব (গৌরব), কউরব (কৌরব) ইত্যাদি। এই প্রকারের উচ্চারণ প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে।

ং (অনুস্বার *)

অনুস্বার অনুনাসিক বর্ণ। ইহা উচ্চারণ করার সময়ে নাসিকা বিবৃত হয়। ইহা যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, তাহার উচ্চারণস্থানই ইহার উচ্চারণস্থান। কথ্য বাঙ্গালায় অনুস্বারের উচ্চারণ কতকটা সানুনাসিক অর্দ্ধগকারের মত। যথা—বঙ্‌শ (বংশ), সঙ্‌স্কার (সংস্কার), কঙ্‌শ (কংশ), সঙ্‌বাদ (সংবাদ) ইত্যাদি। ইহার সূচনা তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যে (২।৩০) দেখিতে পাওয়া যায়।

ঃ (বিসর্গ)

বিসর্গের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ; এজন্য ইহা কণ্ঠ্য বর্ণ। ইহার উচ্চারণে অধিক শ্বাসবায়ুর বিসর্জ্জন হয় বলিয়া ইহাকে 'বিসর্জ্জনীয়' বা 'বিসর্গ' বলা হয়। পাণিনি বর্ণমালার তালিকায় বিসর্গের উল্লেখ করেন নাই; পদান্ত র্‌-কার এবং স্‌-কার স্থানে বিসর্গের নিয়ম করিয়াছেন।

পালি ও প্রাকৃতে বিসর্গের স্থান নাই। বাঙ্গালায়ও অনেকটা কম; কেবল, 'দুঃখ', 'দুঃশাসন' 'দুঃশীল' প্রভৃতি শব্দে বিসর্গের প্রয়োগ পাওয়া যায়, তৎসম শব্দ বলিয়াই সংস্কৃতের মত লেখা হয়। আবার অনেক বাঙ্গালা অব্যয়ে বিসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—আঃ!, ইঃ!, উঃ!, ওঃ! ইত্যাদি।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু)

ইঁহা একটি অনুনাসিক বর্ণ। অনুস্বারের মত ইহার উচ্চারণ হয়; কিন্তু উচ্চারণের সময় অনুস্বারের অর্দ্ধমাত্রাপরিমিত। কাজেই ইহা অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট অনুস্বারবিশেষ। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে অনুনাসিক বর্ণের স্থানে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—বৈদিক সংস্কৃতে,—'দেবাঁ' (দেবান্), 'মহাঁ' (মহান্); লৌকিক সংস্কৃতে,—

---

* অনুস্বর্যতে পশ্চার্ধে স্বরবদুচ্চার্যতে ইত্যনুস্বারঃ (তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য—১।১৮)—অর্থাৎ যাহা পশ্চার্দ্ধে স্বরবৎ উচ্চারিত হয়।

'মহান্ লাভঃ' (মহান্-লাভঃ), 'ভবান্ লভত্তে' (ভবান্-লভতে); প্রাকৃতে 'কাঁউআ' (কামুকা), জঁউণা (যমুনা); অপভ্রংশে, 'কানেঁ' (কালেন), 'পুত্তে' (পুত্রেণ)। প্রাকৃতের ভিতর দিয়া সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় আগত অনুনাসিক বর্ণ চন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যথা—চাঁদ (চন্দ্র), হাঁস (হংস), বাঁকা (বঙ্ক+ক<বক্র), শাঁখা (শঙ্খ+ক), আঁক (অঙ্ক), তাঁত (তন্তু), দাঁত (দন্ত), কাঁপ (কম্প), চাঁপা (চম্পক) শুঁড় (শুণ্ড) ইত্যাদি।

প্রাকৃত ও অপভ্রংশে অনেক স্থলে সংযুক্ত বর্ণ বিযুক্ত হইলে অনুস্বারের আগম হয়। উদাহরণ— অংণই (অন্নতি), বিংময় (বিস্ময়), অংচণ (অর্চন), বিংভল (বিহ্বল), দংসণ (দর্শন), অংসু (অশ্রু), বংক (বক্র) পংখি (পক্ষিন্) প্রভৃতি। প্রাদেশিক ভাষায় চন্দ্রবিন্দুই সানুনাসিক উচ্চারণের কাজ করিয়া থাকে। বাঙ্গালায়—আঁখি (অক্ষি), আঁঠি (অস্থি), ইট (ইষ্ট), কাঁকড়া (কর্কট), আঁখর (অক্ষর), আঁচ (অর্চিস্), উঁচু, উঁচা (উচ্চ, উচ্চ+ক); কাঁখ (কক্ষ); কুঁজা (কুব্জ+ক); সাঁচা (সত্য+ক); পাঁচীল (প্রাচীর), পুঁথি (পুস্তিকা); উঁট (উষ্ট্র) ইত্যাদি। অনেক সময়ে আবার অকারণে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়। যথা—পেঁচা (পেচক), জুঁই (যূথিকা); কাঁচ (কাচ) প্রভৃতি। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ চন্দ্রবিন্দুর এইরূপ অযথা আগমের Spontaneous Nasalisation নামকরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে 'যাদৃচ্ছিক সানুনাসিকীকরণ' বলা যাইতে পারে।

রাঢ় অঞ্চলে অযথা চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ইহা সমর্থন করিবে—আগেঁ (আগে), আছোঁ (আছ), আনাওঁ (আনাও), আণিআঁ (আনিয়া), উঠিআঁ (উঠিয়া), উপেখিআঁ (উপেক্ষা করিয়া), এড়িতেঁ (=ছাড়িতে), কথাঁ (কথা), কথাঁ (কোথা), করিবেঁ (করিবে), করিবোঁ (করিব), কাঁহিণী (কাহিনী), খাইআঁ (খাইয়া), গুণিআঁ (গণিয়া), জাণিআঁ (জানিয়া), তরেঁ (=জন্য), দহেঁ (হ্রদে), পোএঁ (পুত্র), ভিতরেঁ (ভিতরে), যথাঁ (যথা)। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানে কথ্য ভাষায়—দিয়েঁ, যেয়েঁ খেয়েঁ প্রভৃতি উচ্চারণ প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে পারে না। এজন্য পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় অনুনাসিক বর্ণের স্থানে জাত চন্দ্রবিন্দুরও লোপ হয়। যথা—গোফ (গোঁফ<গুম্ফ), পাতি (পাঁতি<পঙ্‌ক্তি), বাতা (বাঁতা<বন্ধ+ক), পাজি (পাঁজি <পঞ্জিকা) প্রভৃতি।

—

ব্যঞ্জনবর্ণ

মূলত বর্গ তিন প্রকার—ক-বর্গ, ত-বর্গ, ও প-বর্গ। ক-বর্গ হইতে চ-বর্গ এবং ত-বর্গ হইতে ট-বর্গের উৎপত্তি। বি-√ক্রী ধাতুজ 'বিকি' শব্দের 'ক' 'বেচা'-তে আসিয়া 'চ'-কারে এবং 'বৃন্ত'-র 'ত' 'বাঁট' বা 'বোঁটা'-তে আসিয়া 'ট'-কারে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইরূপ ক-বর্গের চ-বর্গে এবং ত-বর্গের ট-বর্গে পরিণতির অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম।

ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটিকে স্পর্শবর্ণ বলা হয়। জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূলস্থান স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম স্পর্শবর্ণ। য, র, ল, ব—এই চারিটি অন্তঃস্থবর্ণ। স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে। শ, ষ, স, হ—এই চারিটির নাম উষ্মবর্ণ অর্থাৎ বায়ুপ্রধান বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য হয় বলিয়া ইহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে। বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণকে অল্পপ্রাণ (unaspirated) এবং বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ (aspirated) বর্ণ বলা হয়। অল্পপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে স্বল্প শক্তি ও স্বল্প শ্বাসনির্গমনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণকালে মুখ হইতে অধিক শ্বাসনির্গমন ও অধিক বলের আবশ্যক। ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—ইহারা যথাক্রমে কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত এবং ওষ্ঠের ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। ইহাদের উচ্চারণকালে অত্যল্পমাত্র শ্বাসবায়ু ফুস্‌ফুস্ হইতে নির্গত হয় এবং তাহার এত শক্তি থাকে না যে, স্নিগ্ধতালুকে (Velum) উপরের দিকে ঠেলিয়া তোলে ও কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানকে সম্পূর্ণরূপে ভেদ করে; কাজেই তাহার কতক অংশ উন্মুক্ত নাসিকাবিবর দিয়া নির্গত হইয়া অনুনাসিক হইয়া পড়ে।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ—ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ; কাজেই ইহাদিগকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে। এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বামূল তালুকে স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কণ্ঠ হইতে নির্গত ধ্বনির গতিরোধ করিয়া থাকে।

ঙ—রঙ, ঢঙ, সঙ, বেঙ, বাঙলা প্রভৃতি গুটিকয়েক শব্দ ভিন্ন চলিত বাঙ্গালায় ইহার স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ম' স্থানে 'ঙ' ব্যবহৃত হইত; যথা—জানিতাঙ (জানিতাম), হইতাঙ (হইতাম), সোঙরণ (স্মরণ) কোঙর (কুমার) ইত্যাদি।

চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—ইহাদিগের উচ্চারণস্থান তালু; সুতরাং ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে।

ঞ—আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় অনুনাসিক উচ্চারণ, 'আ' 'য়া' বা 'ইয়া' স্থলে ইহা ব্যবহৃত হইত। যথা—ইঞির (ইহার), আমিঞা (অমিয়া), লঞা (লইয়া), হঞা (হইয়া) ইত্যাদি।

জ্ঞ—ইহা একটি সংযুক্ত বর্ণ, বর্গীয় জ এবং ঞ যোগে উৎপন্ন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা 'গ্‌গঁ' বা 'গ্‌গ'-রূপে উচ্চারিত হয়; যথা, 'অজ্ঞ' স্থানে আমরা উচ্চারণ করি 'অগ্‌গঁ' বা 'অগ্‌গ'। ঞ-কারের উচ্চারণে (ইয়ঁ) য-কারের একটু গন্ধ আছে বলিয়া বাঙ্গালায় 'জ্ঞান' শব্দ 'গ্যান'-রূপে উচ্চারিত হয়। পালি এবং মাগধী ও পৈশাচী প্রাকৃতে 'জ্ঞ' স্থানে 'ঞ' বা 'ঞ্‌ঞ' হয়। যেমন—ঞান (জ্ঞান), বিঞ্‌ঞান (বিজ্ঞান)। ঞ-কারের উচ্চারণস্থান তালু ও নাসিকা বলিয়া পালি ও প্রাকৃতের 'ঞ' ও 'ঞ্‌ঞ' ক্রমশ যথাক্রমে 'গ্যাঁ' ও 'গ্‌গ্যাঁ'-তে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তদনুসারে 'গ্যাঁন', 'বিগ্‌গ্যাঁন' উচ্চারিত হইয়া থাকে। আবার উচ্চারণভেদে সানুনাসিক উচ্চারণ ও য-কারের লোপ হয় বলিয়া 'বিগ্‌গ্যাঁন' শব্দ 'বিগ্‌গান'-এ পরিণত হয়।

ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—ইহাদের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা বলিয়া ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলা হয়। এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বাকে ঘুরাইয়া তাহার অগ্রভাগের দ্বারা মূর্দ্ধা অর্থাৎ কঠিন ও কোমল তালুর সন্ধিস্থলে আঘাত করিতে হয়।

ড়, ঢ়—এই দুইটি বর্ণের উৎপত্তি ও উচ্চারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে [দ্রষ্টব্য—২২ পৃ.]।

ণ—বাঙ্গালায় মূর্দ্ধন্য ণ-কারের উচ্চারণ নাই, সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ ন-কারের মত উচ্চারিত হয়। এজন্য সমোচ্চার্য্য এই দুইটি বর্ণের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'মূর্দ্ধন্য ণ' 'দন্ত্য ন' এইরূপে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালায় উক্ত উভয় বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ না থাকায় বানানে বড়ই ভুল হয়। ণ-কারের ন-কারের মত উচ্চারণ মঙ্গোল ও পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাবে হইয়াছে। তিব্বতী ও পৈশাচী প্রাকৃতে ণ-কারের অস্তিত্বই নাই, সর্ব্বত্রই ন-কার প্রযুক্ত হয়।

বাঙ্গালায় কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণকালে ণ-কার স্থানে 'ট' বা 'টঁ' উচ্চারিত হয়। আমরা 'কৃষ্ণ' শব্দকে 'কৃষ্ট, কৃষ্ট বা কেষ্ট'-রূপে, 'বিষ্ণু' শব্দকে 'বিষ্টুঁ' বা বিষ্টু'-রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। ণ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা 'ড়ঁ'-র মত হয় বলিয়া প্রথমে ণ-কার স্থানে 'ড়'-কার এবং পরে 'ড়ঁ'-কার 'ট'-কারে পরিণত হইয়াছে। আবার উচ্চারণভেদে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত হয়। বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্থলে প্রথম বর্ণ এবং চতুর্থ বর্ণ স্থলে দ্বিতীয় বর্ণ হওয়ার মূলে চূলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাব বিদ্যমান।

ত, থ, দ, ধ, ন—ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত, কাজেই ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে। এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র উপরের দন্তপংক্তিকে স্পর্শ করে।

প, ফ, ব, ভ, ম,—ইহাদিগের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ্য বলিয়া ইহারা ওষ্ঠ্য বর্ণ। ইহাদের উচ্চারণকালে ওষ্ঠ ও অধর নানাভাবে বিযুক্ত হয়।

য—ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও কণ্ঠ; ই এবং অ-যোগে ইহার উৎপত্তি। ই এবং অ এই দুইটি বর্ণকে এক সঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয় ইহার উচ্চারণও অনেকটা সেইরূপ। ইহা অন্তঃস্থ বর্ণ এবং বাঙ্গালায় ইহা বিশুদ্ধ 'জ-'র মত উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে 'অন্তঃস্থ জ' বলা হয়। আবার এই বর্ণ পদের মধ্যে বা অন্তে থাকিলে কতকটা প্রকৃত উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। এই উচ্চারণ পরিভাষিত করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় 'য়' এই একটি নোতুন বর্ণের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। অনেকটা অ-র মত উচ্চারিত হয় বলিয়া উক্ত বর্ণের নাম 'অন্তঃস্থ অ'। যথা—প্রিয় (অ), নয়ন (অ)। অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষায় য়-র স্থান নাই।

র—এই বর্ণের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহার উচ্চারণ দন্তমূল হইতে হইয়া থাকে। উক্ত বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র শ্বাস বায়ুর কতক অংশের প্রভাবে দন্ত মূলের উপরিভাগ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় উহাতে লঘুভাবে আঘাত করে এবং আবার শ্বাসবায়ুর অবশিষ্টাংশের প্রভাবে দন্তমূলের উপরিভাগ হইতে বিচ্যুত হইয়া র-কারের কম্পশীল ধ্বনির সৃষ্টি করে। দন্তমূলের উপরিভাগের সঙ্গে জিহ্বাগ্রের এই সংযোগ ও বিয়োগ অজ্ঞাতসারে এবং অতি দ্রুতগতিতেই হইয়া থাকে। র-কারের আরেক প্রকার উচ্চারণ হয়। শ্বাসবায়ু ফুস্‌ফুস্ হইতে বহির্গত হইয়া মুখবিবরে আসিলে জিহ্বাগ্র দন্তমূলের উপরিভাগে আঘাত করিয়াই বিচ্যুত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বায়ু নির্গমনের পথ দিয়া থাকে এবং জিহ্বাগ্র পুনরায় আর দন্তমূলের উপরিভাগে আঘাত করে না; কাজেই কোনো প্রকার কম্পনও হয় না। এইরূপ উচ্চারণে র-কার অনেকটা অ-কারের মত উচ্চারিত হয়। র-কারের শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ হয় বলিয়াই উত্তরবঙ্গে বিশেষত দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিগণের মুখে 'রাম' স্থলে 'আম', 'রস'স্থানে 'অস', 'রাধা' স্থলে 'আধা' শোনা যায়। আবার র-কারের অ-কাররূপে পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলে অ-কারের সহিত র-কারের একটি সাদৃশ্য উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই অ-কার স্থলে র-কার হয়। তাহারা বলে, "আমবাবুর রামবাগানে রামগাছের রাগের ডালে রাম ধইছে।" (রামবাবুর আমবাগানে আমগাছের আগের ডালে আম ধরেছে)। বাঙ্গালায় 'ওঝা' স্থলে 'রোজা', 'উই' স্থলে 'রুই' প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারণ আছে।

ল—ইহার উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র উপরের দন্তপঙ্‌ক্তির পশ্চাতে স্পর্শ করিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষত বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে 'ল' স্থলে 'ন' এবং 'ন' স্থলে 'ল' হয়। যথা—নঙ্কা (লঙ্কা), নতা (লতা), লব (নব), লবান (নবান <নবান্ন), লাতি (নাতি), লৌকা (নৌকা)। কলিকাতার খাস বাসিন্দারের মুখেও 'লেপ স্থলে 'নেপ', 'লুচি' স্থলে 'নুচি' উচ্চারিত হয়। ইহার কারণ, উচ্চারণভেদে ল-কার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বাগ্র

দন্তমূলে আঘাত করিয়া আর বিচ্যুত হয় না, জিহ্বাফলক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে *; তাহার ফলে শ্বাসবায়ু মুখবিবর দিয়া নিঃশেষিত হইতে না পারায় কতক অংশ নাসিকাবিবর দিয়া নির্গত হইয়া অনুনাসিক হইয়া পড়ে। এইরূপে ল-কার ন-কারে রূপান্তরিত হয়, যেহেতু ন-কারও অনুনাসিক ও দন্তের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। আবার ন-কার ও ল-কারের উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে বলিয়া 'ন' স্থলে 'ল' হইয়া পড়ে।

অন্তঃস্থ ব—উ এবং অ এই দুইটি বর্ণকে এক সঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয় ইহার উচ্চারণও কতকটা সেইরূপ। বাঙ্গালায় সামান্য কয়েকটি স্থান ভিন্ন সর্ব্বত্রই অন্তঃস্থ ব-কার বর্গ্য ব-রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এ রীতি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। প্রাকৃতে সময় সময় অন্তঃস্থ ব-কার বর্গীয় রূপে উচ্চারিত হইত; এবং তাহা হইতেই ক্রমশ বাঙ্গালা বর্ণমালায় কেবলমাত্র একটি ব-কার স্থান লাভ করিয়াছে। অন্তঃস্থ ব-কার আদিস্থিত হইলে, অথবা তাহার দ্বিত্ব করিলে স্বভাবতই তাহাকে উচ্চারণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে ঐ অন্তঃস্থ ব-কার ওষ্ঠ হইয়া বর্গীয় ব-কারে পরিণত হয়। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

বাঙ্গালায় পদের আদি, মধ্যে বা অন্তে অসংযুক্ত অবস্থায় অথবা য-ফলা এবং র-ফলার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকিলে অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ বর্গ্য ব-র মত হয়। যথা—বিশেষ, ভবেশ, রবি, ব্যাস, ব্যাকুল, ব্রত, বিব্রত। কিন্তু অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইলে অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ হয় না। যথা—বিশ্ব (বিশ্শ), বিদ্বান (বিদ্দান), বিল্ব (বিল্ল), দ্বয় (দ্দয়), দ্বিজ (দ্দিজ)। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকস্থলে অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ আংশিকরূপে হইত। এখনো গ্রামের অশিক্ষিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মুখে 'স্বামী' স্থলে 'সোয়ামী', 'স্বস্তি' স্থলে 'সোয়াস্তি', 'দ্বারিকা' স্থলে 'দোয়ারিকা' শোনা যায়।

শ, ষ, স—বাঙ্গালায় ষ ও স-কারের উচ্চারণ নাই; মূর্দ্ধন্য ষ এবং দন্ত্য স-র তালব্য শ-কারের উচ্চারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই উচ্চারণ মাগধী প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। বিশ (সংখ্যা কুড়ি), বিষ (গরল) ও বিস (পদ্মের ডাঁটা) শব্দ উচ্চারণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, আমরা উক্ত তিন স্থলেই কেবলমাত্র শ-কার উচ্চারণ করিতেছি। অতএব উচ্চারণকালে আমরা একমাত্র তালব্য শ-কারকে গ্রহণ করিয়াছি। কেবল লিখিবার সময় তাহাদের ভেদ রক্ষা করা হয়; কিন্তু তালব্য শ-কারের সহিত ঋ, র ও ন থাকিলে এবং দন্ত্য স-কার ঋ, র, ত, থ ও ন দ্বারা যুক্ত হইলে তাহাদের প্রকৃত দন্ত্য স-কারের উচ্চারণ (ইংরেজী s এবং দন্ত্য স-কারের উচ্চারণ এক; জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূলের স্পর্শ) হয়। যথা—শৃগাল (কিন্তু শিয়াল বা শেয়াল), শৃঙ্খল (কিন্তু শিকল), শৃঙ্গ (কিন্তু শিঙ্ বা শিং),

* Lehrbuch der Phonetik, § 136.

শ্রী, শ্রম, শ্রবণ, শ্রাবণ, শ্রুতি, শ্রেণী, শ্রোত্রিয়, প্রশ্ন; সৃজন, সৃষ্টি, স্রষ্টা, স্রোত, স্তব, স্তুতি, স্ত্রী, স্থান, স্থল, স্থিতি, স্থূল, স্নান, স্নেহ। ইহার কারণ, কখনো কখনো ঋ-কার ও র-কারের উচ্চারণ দন্তমূল হইতে হইয়া থাকে এবং ত-বর্গের উচ্চারণস্থান দন্ত; কাজেই দন্তমূলীয় এবং দন্ত্য বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী শ ও স বর্ণ-সঙ্গতি প্রভাবে দন্ত্য স-কারের মত উচ্চারিত হয়।

হ—ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ বলিয়া ইহাকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হ-কার অ-কারেরই মহাপ্রাণ উচ্চারণ। অ-কার উচ্চারণে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, হ-কার উচ্চারণে ততোধিক শক্তির আবশ্যক।

অনুস্বারের পরবর্ত্তী হ-কার অনেকটা ঘ-কারের মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় 'সংহিতা' স্থলে 'সংঘিতা', 'সংহার' স্থলে 'সংঘার', 'সিংহ' স্থলে 'সিংঘ' উচ্চারণ হয়। এই উচ্চারণ প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে *।

হ-কার য-ফলাযুক্ত হইলে বাঙ্গালায় তাহার উচ্চারণ 'জ্ঝ' হইয়া থাকে। যথা—সজ্ঝ (সহ্য), দাজ্ঝ (দাহ্য), বাজ্ঝ (বাহ্য) ইত্যাদি। নিম্নে ইহাদের ক্রমিক পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল;—সহ্য >সয়্‌হ (স্থিতিপরিবৃত্তি) >সজ্‌হ (বাঙ্গালায় য-কারের 'জ' উচ্চারণ হয়) >সজ্‌ঝ, সজ্ঝ (জ-কারের নিকটবর্ত্তী হ-কার ঝ-কারে রূপান্তরিত হইয়াছে); এইরূপে দাহ্য, বাহ্য প্রভৃতি শব্দেরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'হ্ব' স্থানে 'ব্ভ' উচ্চারিত হয়; যথা, 'জিহ্বা' স্থানে আমরা উচ্চারণ করি 'জিব্ভা', 'আহ্বান' উচ্চারণ করিতে আমরা উচ্চারণ করি 'আব্ভান'। ক্রমিক পরিবর্ত্তন—জিহ্বা >জিব্‌হা (স্থিতিপরিবৃত্তি) > জিব্‌ভা (ব-কারের সন্নিহিত হ-কার ভ-কাররূপে পরিণত হইয়াছে)। বর্ত্তমানে কলিকাতা অঞ্চলে 'জিহ্বা' ও 'আহ্বান' শব্দ যথাক্রমে 'জিউহা' ও 'আওহান' রূপে উচ্চারিত হয়। ক্রমিক পরিবর্ত্তন—জিহ্বা >জিব্‌হা (স্থিতিপরিবৃত্তি) >জিউহা (সম্প্রসারণ)। আবার হ-কারে ণ-ফলা, ন-ফলা, ম-ফলা, র-ফলা বা ল-ফলা দিলে আমরা তাহা 'ণ্‌হ', 'ন্‌হ', 'ম্‌হ', 'র্‌হ' বা 'ল্‌হ' উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমরা 'পূর্ব্বাহ্ণ' শব্দকে 'পূর্ব্বাণ্‌হ', 'মধ্যাহ্ন' শব্দকে 'মধ্যান্‌হ', 'ব্রাহ্মণ' শব্দকে 'ব্রাম্‌হণ', 'হ্রদ' শব্দকে 'র্‌হদ', 'হ্রস্ব' শব্দকে 'র্‌হস্ব', 'আহ্লাদ' শব্দকে 'আল্‌হাদ' উচ্চারণ করি। এই উচ্চারণ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে †। অনেকে আবার 'হ্রস্ব' শব্দকে 'হস্ব'রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

ক্ষ—ক-কার ও ষ-কারে যে সংযুক্ত বর্ণ (ক্ষ) হয়, পদের আদিতে থাকিলে তাহাকে আমরা 'খ' এবং অন্যত্র 'ক্‌খ' উচ্চারণ করিয়া থাকি। যথা—'ক্ষিতি' স্থানে আমরা উচ্চারণ করি 'খিতি' 'অক্ষয়' স্থানে উচ্চারণ করি 'অক্‌খয়'। পালি ও প্রাকৃতে ক্ষ-কারের এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিধান আছে §। বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে।

—০—

* হেমচন্দ্র, ৮।১।২৬৪। † প্রাকৃতপ্রকাশ, ৩.৮।
§ পালিপ্রকাশ, ১. § ২০; প্রাকৃতপ্রকাশ, ৩.২৯-৩১।

উচ্চারণ-তত্ত্ব

প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি বিশেষ উচ্চারণ-রীতি আছে বলিয়া এক ভাষা অন্য ভাষা হইতে নিজের অনেকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকে। যে কোনো ভাষার স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তন এই উচ্চারণ-রীতিকে আশ্রয় করিয়া হয়। স্বর-ধ্বনির বিকার বা বিকাশ সর্ব্ব-প্রথমে হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃতভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি অবলম্বন করিয়া যাস্ক (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮০০ বৎসর ?) সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনো দেশেই এসম্বন্ধে কোনো প্রকার আলোচনা হয় নাই। তিনি সংক্ষেপে সংস্কৃতভাষার স্বরধ্বনির বিকার বা বিকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

> বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
> ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥
> ভবেদ্বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্যয়াৎ।
> গূঢ়োত্মা বর্ণবিকৃতের্বর্ণনাশাৎ পৃষোদরম্॥

এই ব্যাখ্যা কি নিখুঁত! আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানমতেও তাহা অতি সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা—বর্ণাগম—(1) Prothesis, (2) Anaptyxis ; বর্ণবিপর্য্যয় —Metathesis ; বর্ণবিকার—(1) Softening, (2) Hardening, (3) Aspi-rating, (4) De-aspirating, (5) Change from one place of articulation to another ; বর্ণনাশ—(1) Aphaeresis, (2) Syncope, (3) Apocope, (4) Haplology.

ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তনের ইতিহাসে উচ্চারণ-রীতির প্রভূত প্রভাব। উপস্থিত ক্ষেত্রে য়ুরোপের ভাষা-বিজ্ঞান অনুসারে আমরা কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মানুষ যে ভাষার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে, সে তাহা যত দূর সম্ভব সহজ করিয়া লয়। সে স্বল্প কথায়, স্বল্প আয়াসে ও স্বল্প সময়ে নিজের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে চায়। যে সংযুক্ত বর্ণে দুইটি বর্ণেরই পৃথক্ উচ্চারণস্থান, জিহ্বা স্বভাবতই তাহাদের সমোচ্চারণ স্থান করিয়া লয় ; তাহা না হইলে জিহ্বার পক্ষে একটি স্থানে আঘাত করিয়া পরমুহূর্ত্তেই অন্য স্থানে যাইয়া আঘাত করিতে বেশ একটু সময় ও আয়াসের প্রয়োজন হয়। এজন্য সংযুক্ত বর্ণে যে বর্ণর রূপান্তরিত হইলে পদের অর্থবোধে কোনো কষ্ট হয় না, অথচ তাহার উচ্চারণ সহজ ও দ্রুত হইয়া যায়, সেখানে সেই

বর্ণটি অন্য বর্ণের ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন-রীতিকে 'সমীকরণ' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছি (ইংরেজিতে Assimilation)। সমীকরণ দুই প্রকার —অনু-ক্রমসমীকরণ (ইংরেজিতে Progressive assimilation) ও ব্যতিক্রমসমীকরণ (ইংরেজিতে Regressive assimilation)। পরবর্ত্তী অক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তাহাকে অনুক্রমসমীকরণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর পরবর্ত্তী অক্ষরের ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে তাহাকে ব্যতিক্রমসমীকরণ বলা হয়। অনুক্রমসমীকরণের উদাহরণ—পদ্দ (পদ্ম) বিস্সয় (বিস্ময়), বিদ্দা (বিদ্যা), বিদ্দুৎ (বিদ্যুৎ), অশ্‌শ (অশ্ব), বিশ্‌শাস (বিশ্বাস)। ব্যতিক্রমসমীকরণের উদাহরণ—কত্তা (<কর্ত্তা) মত্তে (<মর্ত্তে <মরতে <মরিতে), যাগগে (<যাকৃগে), সাটটা (<সাতটা)।

পদের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে উচ্চারণ করা কঠিন হয় বলিয়া উচ্চারণের সুবিধার জন্য উক্ত সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে স্বরের (সাধারণত 'ই') আগম হয়। এইরূপ উচ্চারণ-রীতির নাম প্রহিত [Prothesis—গ্রীক Pro = সংস্কৃত 'প্র' (সম্মুখে, অগ্রে) ; গ্রীক ধাতু the = সংস্কৃত ধাতু 'ধা' এবং গ্রীক প্রত্যয় -sis = সংস্কৃত 'তিস্' thesis = ধিতিস্ ; বৈদিকে 'ধিতি', কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে 'হিতি']। প্রহিতির উদাহরণ—ইস্ত্রী (স্ত্রী—প্রাকৃতে 'ইথিয়া', 'ইথী'), আস্পর্দ্ধা (স্পর্দ্ধা), ইস্কুল (স্কুল 'school'), ইষ্টেশন (ষ্টেশন 'station')।

সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে স্বরাগম হইলে তাহাকে স্বরভক্তি বলে (Anaptyxis)। স্বর-ভক্তির শব্দগত অর্থ স্বরের দ্বারা ভাগ। স্বরবর্ণ সংযুক্ত বর্ণকে পৃথক্ করে বলিয়া স্বরভক্তি নাম হইয়াছে। উদাহরণ—দরশন (দর্শন), রতন (রত্ন), হরিষ (হর্ষ), যতন (যত্ন)।

পদস্থিত বর্ণের স্থানপরিবর্ত্তনের নাম স্থিতিপরিবৃত্তি (Metathesis)। যথা—ফাল (লাফ), পিচাশ (পিশাচ), মটুক (মুকুট), বানারসী (বারাণসী), গড়ুর (গরুড়) বশ্‌কিশ্ (ফার্সী, বখশীশ্), বোঁচকা (তুর্কী, বুগচা), বাস্ক (বাক্স, 'box') ডেস্ক (ডেস্ক, 'desk')।

পদের কোমলতাসম্পাদনের জন্য পদমধ্যে স্বরাগম হয়। পদমধ্যস্থিত বা পদান্তের ই-কার অথবা উ-কার পূর্ব্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে আসিয়া স্থানলাভ করে। এই প্রকারের পরিবর্ত্তনের নাম অপিনিহিতি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি (দ্রষ্টব্য ৫২ পৃ.)।

একই পদে সমধর্ম্মাবলম্বী দুইটি বর্ণ পাশাপাশি ব্যবহৃত হইলে একটির লোপ হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনকে 'অদ্বিকোক্তি' নামে অভিহিত করিতেছি (Haplology—গ্রীক haplous = সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'অদ্বিক' ; এবং lógos = সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'উক্তি')। অদ্বিকোক্তির উদাহরণ—সাব্যস্ত (সব্যবস্থ), সমিভ্যার (সমভিব্যা-হার), দা (দাদা), দি (দিদি)।

আদি বর্ণ লুপ্ত হইলে পদের যে পারবর্তন হয় তাহার নাম 'প্রহৃতি' দিতেছি
(Aphaeresis—গ্রীক 'aph' for 'apo'=সংস্কৃত 'অপ'; কিন্তু অর্থসঙ্গতির জন্য সংস্কৃত 'তিস্')।
প্রতিশব্দ হইবে 'প্র'; গ্রীক ধাতু aire=সংস্কৃত ধাতু 'হৃ', এবং -sis=সংস্কৃত
উদাহরণ—লাউ (অলাবু), ডুমুর (উডুম্বর), তিসি (অতসী), পর (উপরি), ভিতর
অভ্যন্তর), রীঠা (অরিষ্ট), সওয়ার (প্রাচীন ফার্সী 'অস-বারি'; সংস্কৃত 'অশ্ববার' <
অশ্ব + √ভূ—শিশুপালবধ, ৩।৬৬)।

পদের মধ্যবর্ণ (বিশেষত স্বর) লুপ্ত হইলে যে পরিবর্তন হয় তাহার নামকরণ
করিতেছি 'অন্তর্হতি' (Syncope—গ্রীক sún=সংস্কৃত 'সম্'; ধাতু cope=আদি
আর্য্য ভাষার ধাতু 'স্কপ্', কিন্তু সংস্কৃতে এই ধাতুর প্রয়োগ নাই; 'হন্' ধাতুকে
প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিতেছি। অর্থসঙ্গতির জন্য প্রতিশব্দ হইবে 'অন্তর্হতি'; 'সংহতি'
শব্দ নহে)। অন্তর্হতির উদাহরণ—কুকুঁড়া, কুকড়া (কুক্কুট), নারকেল (নারিকেল),
হালকা (<প্রাকৃত, হল্যকা <সংস্কৃত, লঘুক), নাতনী (নাতিনী)।

পদস্থিত অন্ত্যস্বর লুপ্ত হইলে যে পরিবর্তন হয় তাহাকে 'অনুহতি' নামে অভিহিত
করিতেছি (Apocope—apo=সংস্কৃত 'অপি'; কিন্তু অর্থসঙ্গতির জন্য সংস্কৃত প্রতিশব্দ
হইবে 'অনু'; এবং cope-এর প্রতিশব্দ 'হতি')। উদাহরণ—তাঁত (তন্তু), গাভীন
(গর্ভিণী), রাশ (রাশি), অতিথ (অতিথি), জাত (জাতি), রাত (রাতি)।

বর্ণবিকার—(১) কোমলীকরণ (Softening)—বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ
—কাগ (কাক), বগ (বক), শাগ (শাক), শগুন (শকুন), কবজ (কবচ—বিঘ্ন
বিনাশের জন্য তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-লিখিত ভূর্জপত্র), বেডা (বেটা), বেডি, বেডী (বেটি, বেটী),
দাদা (তাত-ক), খুবরি, খুবরী (খুপরী <খর্পর)। (২) কঠোরীকরণ (Hardening)
—বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ—বীচি (বীজ), গোলাপ (ফার্সী 'গুলাব')। (৩)
মহাপ্রাণকরণ (Aspirating)—বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ স্থানে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও
চতুর্থ বর্ণ—ফড়িং (পতঙ্গ), ফাঁস (পাশ), ভুসি (বুস)। (৪) অল্পপ্রাণকরণ (De-
aspirating)—বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ—বোন
ভগিনী), মাজ (<মাঝ <মধ্য), আদলা (আধলা)। (৫) উচ্চারণস্থানের পরিবর্তন
—কোল (ক্রোড়, অঙ্ক), খোল (আবরণ, ওয়াড়); কাটা (ছেদন করা, ছিন্ন); কাঠা
(ভূমির পরিমাণবিশেষ); কাত (আড়), খাত (গর্ত); চাকা (গাড়ীর চাকা, স্বাদ
গ্রহণ করা), ছাঁকা (নিঙড়ান); কোপ (রাগ, আঘাত), খোপ (খুপরি); পাট
(নালিতা, ভাঁজ), পাত (গাছের পাতা), ফাট (ফাঁক, চিড়); পাকা (পরিণত হওয়া,
পরিণত), পাখা (ডানা, তালবৃন্ত), ফাঁকা (খোলা); বাত (বায়ু, রোগবিশেষ), ভাত
(সিদ্ধ চাউল); বাণ (শর), ভান (ছলনা); জামা (অঙ্গাবরণবিশেষ), ঝামা (পোড়া
ইট); তাল (নৃত্যগীতবাদ্যবিষয়ে কালের পরিমাণবিশেষ, ফলবিশেষ), থাল (ভোজনপাত্র)।

(৬) ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব—আটা (গোধূমচূর্ণ), আট্টা (৮ সংখ্যা); কানা, কাণা (একচক্ষুহীন,
কিনারা), কান্না (রোদন, কাঁদা); কাঁচা (কচি, নরম), কাঁচ্চা (ওজনের ক্ষুদ্র মানবিশেষ);
চকোর (পক্ষিবিশেষ), চক্কর (চাকা, আবর্ত); দিবি (যথা—তুই দিবি), দিব্বি (সুন্দর,
শপথ); পলি (বন্যার জলে আনীত এবং নদীর উভয় তীরে পতিত মৃত্তিকা), পল্লি
(পাড়া); পাতা (গাছের পাতা), পাত্তা (খোঁজ); পালা (পর্য্যায়, বার), পাল্লা (তোল
যন্ত্রের একদিকের পাত্র, প্রতিযোগিতা); বাঁচা (জীবন ধারণ করা), বাচ্চা (শিশু);
পাটা (কাষ্ঠাদি ফলক), পাট্টা (জমিদারের প্রদত্ত জমির অধিকারপত্র); মালা
(সারি, ফুলমালা), মাল্লা (নাবিক, কাণ্ডারী)।

সপ্তম স্তবক

ছন্দ

ছন্দ্ ধাতু হইতে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে ছন্দ শব্দের মধ্যে
একটি আনন্দদানের ভাব অন্তর্নিহিত আছে। কাব্যের আত্মা ছন্দ, ছন্দের আত্মা রস
এবং সেই রসই আনন্দ। ভারতবর্ষের তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ আনন্দকেই রসরূপে দেখিয়া-
ছিলেন—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, রসো বৈ সঃ।" কাব্য আত্মার আনন্দের লীলাক্ষেত্র
যে আনন্দ হইতে বিশ্বের উদ্ভব ("আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"), যে আনন্দের
দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া আছে ("আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"), সেই আনন্দ হইতেই কাব্যের
সৃষ্টি হইয়াছে। জীবাত্মা আনন্দময়, আনন্দ জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া দেশ, কাল,
পাত্র, জাতি বা ভাষার সঙ্কীর্ণগণ্ডি কাব্য-সৃষ্টিকে বাধা দিতে পারে না। আনন্দের একটা
নিত্যপ্রেরণা আছে বলিয়া আদিম মানব সর্ব্বপ্রথমে কাব্যের সন্ধান পাইয়াছিল।
মানুষ যে কাব্য রচনা করিতেছে, চিত্রাঙ্কন করিতেছে, মূর্তি গড়িতেছে, জগতে প্রাচীন কাল
হইতে আজ পর্য্যন্ত অনবরত এই যে একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে, ইহার মূলে আর কিছুই নয়,
মানুষের হৃদয়ে আনন্দের অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী নিত্য প্রবাহিত হইতেছে। আনন্দাত্মক
জীবাত্মা আত্মপ্রকাশের দ্বারা আনন্দ বিতরণ করিয়া আনন্দকে প্রাপ্ত হয় বলিয়াই কাব্য
এবং সকলপ্রকার সুকুমার কলার উৎপত্তি ও পরিণতি।

মানুষ ভাষার সাহায্যে নিজের ভাব প্রকাশ করে। কোনো এক বিশেষ রীতি অনুসরণ
করিয়া ভাষার ব্যবহার করাকে ছন্দ বলা হয়। এই রীতিই রসসৃষ্টির মূল।

মনে রস বা আনন্দ জন্মায়। ছন্দ ভাষা ছন্দোবদ্ধ হইলে শ্রুতিমধুর হয় এবং
প্রধানত দুই প্রকার—গদ্য-ছন্দ ও পদ্য-ছন্দ। গদ্য-ছন্দের একটা প্রাণ আছে, ইহার
অব্যাহত গতি ; ইহাতে উচ্চারণ-পদ্ধতির কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় না ; পদগুলি অবিকৃত
অবস্থায় থাকে। বিশেষত গদ্য-ছন্দে স্বাধীনতা চলে, চিন্তার ধারা অক্ষুণ্ণভাবে ছুটিতে থাকে,
কোথাও একটুও বাধা পায় না। সে মুক্ত, সে স্বাধীন। আর পদ্য-ছন্দের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর,
সহজে চলিতে চায় না। নিয়মের নাগপাশে জড়িত ও আবদ্ধ ; একটু চলিলেই বাধা
ঠেকে. ইহাকে বিশেষ ভাষারীতি মানিয়া চলিতে হয়, স্বাধীনতা চলে না। ইহাতে চিন্তার ধারা
সম্যগ্‌রূপে বিকশিত হয় না

রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গালা গদ্য-ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক। গদ্য-রচনাতেও যে সুস্পষ্ট ছন্দোলক্ষণ
থাকিতে পারে ইহা সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাঁহার লেখাতে দেখিতে পাই। এস্থলে তাঁহার
গদ্য-ছন্দের দুই একটি লেখা তুলিয়া দিলাম :—

নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে ;
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাত না নিখিল তরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হোতো
যদি হোতো মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ ॥
—মৃত্যু (পুনশ্চ, ৯৯ পৃ.)।

ছিল মাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ঐ দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধানে।
ওদিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন বার নেই কোনো কিছুতেই
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
—বালক (পুনশ্চ, ৬৬ পৃ.)

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র বাঙ্গালা পদ্য-ছন্দ নিয়া আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে
আলোচনা করিবার অনেক আছে, কিন্তু অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে তাহা সম্ভব বা
সঙ্গত নহে বলিয়া, সময়ান্তরের জন্য সব রাখিয়া দিয়া, কয়েকটি মাত্র অবশ্য-বক্তব্য কথা বলিয়া
যাইতেছি। ছন্দ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কতকগুলির নামমাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত
হইব, বাহুল্যভয়ে তাহাদের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করা যাইবে না। সহৃদয় পাঠকগণকে
মার্জ্জনা করিতে হইবে।

সঙ্গীতের মত বাঙ্গালা ছন্দে অক্ষরের কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, মাত্রার (Mora)
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে। এক একটি অক্ষরের উচ্চারণ-কালকে মাত্রা বলে। সাধারণত
হ্রস্ব স্বরের একমাত্রা এবং দীর্ঘ স্বরের দুই মাত্রা। সংস্কৃতে মাত্রানির্ণয়ের একটা বিশেষ নিয়ম
আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এসম্বন্ধে কোনো নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই ; কখনো কখনো হ্রস্ব
স্বরকে দীর্ঘ করিয়া এবং দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব করিয়া পড়া হয়। অনেক সময়ে
আবার ছন্দ অনুসারে মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত,
বৈষ্ণব কবিতা, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সকলপ্রকার ছন্দোবদ্ধ কাব্য সুর করিয়া
পড়া হইত বলিয়া মাত্রা অনুসারে বাঙ্গালা ছন্দের হিসাব চলিত এবং তজ্জন্য প্রাচীন
বাঙ্গালা ছন্দে অক্ষর, যতি বা মিলের কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না। নিম্নে
উদাহরণ দিতেছি ;—

পারিব পারিব ভৈইনগ রাজা রাখিবার।
ধরা ধরি করি নিল পুরীর ভিতর ॥—ময়নামতীর গান, ১১পৃ.।
সেত বন্নের তাম্র অঙ্গেতে চড়ায়।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরন্তি জিউ থাপন্তি কায় ॥
—শূ.পু.২২৬ পৃ.।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি এক একটি গানের পালা
সুরসংযোগে পঠিত হইত। লেখকগণ স্ব স্ব ভণিতায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ;—

প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥—রামায়ণ, কৃত্তিবাস।
আদিপর্ব্ব ভারত শ্রীব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥—মহাভারত, কাশীরাম দাস।
এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান ॥—ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী।

রবীন্দ্রনাথ মাত্রা অনুসারেই বাঙ্গালা ছন্দের ভাগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,
"ছন্দকে মোটের উপর তিন আতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ. অসম-চলনের

ছন্দ এবং বিষম-চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সম মাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরাণ কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই তিনের যোগে বিষম মাত্রার ছন্দ।"—সবুজপত্র, চৈত্র, ১৩২৪।

যে কোন বাঙ্গালা ছন্দকে এই রীতি অনুসারে ভাগ করা যাইতে পারে। সম-মাত্রার ছন্দ স্থিতিশীল এবং অসমমাত্রার ছন্দ গতিশীল। অসমমাত্রার ছন্দে মাত্রার অসমানতা থাকে বলিয়া সে বড় চঞ্চল; কেবলি চলিতে থাকে, থামিতে চায় না। এজন্য সমমাত্রা দিয়া তাহার গতিরোধ করিতে হয়। গতি ও স্থিতি এই উভয়ের সন্ধিতে বিষমমাত্রা ছন্দের প্রকাশ।

ছন্দের প্রকৃতি জানিতে হইলে প্রত্যেক পর্ব্বে* কয়টি করিয়া মাত্রা আছে তাহার হিসাব করিতে হইবে। কারণ ব্যাপকভাবে মাত্রা ধরিয়া বিচার করিলে কবিতার ঢঙ অনেক সময় বোঝা যায় না। চৌদ্দ মাত্রায় পয়ার ছন্দ হয় বলিয়া চৌদ্দ মাত্রার সব ছন্দই যে পয়ার-জাতীয় ইহা বলিলে ভুল বলা হয়। পয়ার ভিন্ন চৌদ্দ মাত্রার বহু ছন্দ আছে। কাজেই প্রত্যেক পর্ব্বে মাত্রাসংখ্যা কত, তাহা লক্ষ্য করিয়া ছন্দের জাতিবিচার করিতে হইবে।

আমাদের হাতপায়ের একটা ছন্দ আছে। প্রত্যেক হাতে ও প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল, পাঁচেরই পৌনঃপুনিক লীলা। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, হাতপায়ের ছন্দের নাম কি? উত্তর এই যে, পাঁচের ছন্দ। তেমনি বাঙ্গালা কাব্যে প্রত্যেক ছন্দের এক একটা সম্পূর্ণ কাঠামো পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে তাহার পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের অবস্থিতি। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই কাঠামো একই রূপে বার বার দেখা দিয়া থাকে। এই রূপ অনুসারেই ছন্দের নামকরণ করা উচিত। যেমন—

*কয়েকটি মাত্রার সমষ্টিকে পর্ব্ব বলে।

গম্ভীর পাতাল! যথা কাল-রাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি' রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সজ্ব আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়॥—স্বপ্ন-প্রয়াণ,
দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

উক্ত কবিতাটিকে আঠারোমাত্রার ছন্দ বলি; কারণ প্রতি পদেই আঠারোমাত্রার পুনরাবৃত্তি। ইহার প্রথম পর্ব্বে উচ্চারিত আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্ব্বে উচ্চারিত দশ মাত্রা। এই আট ও দশ মাত্রার দুই পর্ব্বের মিলনে আঠারোমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি।

পদ্য-ছন্দ প্রধানত দুই প্রকার—মিত্রাক্ষর (Rime) ও অমিত্রাক্ষর (Blank Verse)। যে ছন্দে চরণদ্বয়ের শেষে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস থাকে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ বলে এবং চরণদ্বয়ের শেষে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস না থাকিলে তাহার নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। পূর্ব্বে বাঙ্গালা কাব্যে প্রায়ই মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন ইহার ব্যবহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ত্রিপদী ছন্দেও অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার দেখা যায় অর্ব্বাচীন সংস্কৃতকাব্যে এবং বাঙ্গালা পদ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। এজন্য তাহারা প্রাকৃতের নিকট ঋণী।

প্রাকৃতে—

জে গঞ্জিঅ গোলাহিবই রাউ
উদ্দণ্ড ওড্ড জস্থ ভঅ পলাউ।
গুরুবিকম 'বিকম জিণিঅ জুজ্ঝ
তাকণ্ণ পরকম কোই বুজ্ঝ॥—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্।
[যো গঞ্জিতগৌড়াধিপতিরাজঃ
উদ্দণ্ড-ওড্রো যস্য ভয়েন পলায়তে।
গুরুবিক্রমং বিক্রমং জিত্বা যুধ্যতে
তৎ কর্ণপরাক্রমং ক ইহ বুধ্যতে॥]

অর্ব্বাচীন সংস্কৃতকাব্যে—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী।

গীতগোবিন্দম্, পঞ্চমঃ সর্গঃ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি Blank verse ছন্দের অনুকরণে বাঙ্গালা কাব্যে সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। এই ছন্দে ছন্দোবিভাগের সঙ্গে অর্থবিভাগের কোনো সম্বন্ধ থাকে না। ছন্দোবিভাগ শেষ হইলেও অর্থবিভাগ শেষ হইতে চায় না। এক একটি ছন্দোবিভাগকে অতিক্রম করিয়া এক একটি অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয়। কাজেই যতি এবং ছেদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়ে, সহগামী হয় না। পদ্য-ছন্দ ও গদ্য-ছন্দের মাঝখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থান। ইহাকে পদ্য-ছন্দের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, অথচ ইহাতে ভাবের আবেগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, কোনো বাধা ঠেকে না। এই ছন্দে খানিকটা স্বাধীনতা চলে।

এখন পয়ার হইতে আরম্ভ করা যাউক। পয়ার চার পদের ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, পদ-চার শব্দ হইতে পয়ার আসিয়াছে। আমরা তাঁহার মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। পয়ারে প্রথম ও তৃতীয় পাদে আট অক্ষর, আট মাত্রা; কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ছয়টি করিয়া অক্ষর থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকটির মাত্রাসংখ্যা আট। অতএব সর্ব্বসমেত ষোলো মাত্রা। একটি উদাহরণ দিতেছি :—

মহাভারতের কথা   অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে   শুনে পুণ্যবান॥

এখানে "মান" ও "বান" শব্দের আকারকে দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়। সাধারণত পয়ারে অষ্টম অক্ষরের পরে যতি বসে; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিয়ম নাই। যতি জিহ্বার শক্তি অনুসারে পড়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, অর্থ অনুসারেও যতি বসে। অনেকক্ষণ ধরিয়া জিহ্বার কাজ চলিতে থাকিলে তাহার অবসাদ ঘটে এবং পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হয়; এই বিশ্রামস্থলের নাম যতি।

পয়ার ছন্দের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে তান (ইংরেজিতে Vocal drawl) বা সুর থাকে। এই ছন্দের কবিতা পড়িবার সময়ে একটানা একটা সুরের আগম হয়। ইহাতে একটি তানের প্রবাহ থাকে বলিয়া ইহার চলন অপেক্ষাকৃত মন্থর। পয়ার ছন্দের আরেকটা রীতি এই যে, যে কোনো পর্ব্বাঙ্গে তাহার ভাগ চলে।

আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে অনেকগুলি কবিতা আছে যাহাদের প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ অথবা প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে পরস্পর মিল থাকে। যথা,—

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালিয়া সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।—কাশীরামদাস,
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার
উড়ালে বিদ্রোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী!
কত দুঃখে দহি আর কী লাঞ্ছনা সহি
করিলে হে মুক্তিপন্থা তুমি আবিষ্কার!—মহাকবি মধুসূদন,
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মালঝাঁপ ছন্দে চতুর্দ্দশ মাত্রা থাকে; তাহার চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ণে মিল থাকে। মাত্রা-সঙ্কেত—৪+৪+৪+২।

তরলপয়ার ছন্দে প্রথম দুইটি পর্ব্বে মিল থাকে। মাত্রা-সঙ্কেত—৪+৪+৬।

মালতী ছন্দের মাত্রা-সঙ্কেত—৮+৭।

কুসম-মালিকা ছন্দের মাত্রা-সঙ্কেত—২+৮+৬। যথা—

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন-দরশনে;
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু-মিলনে;
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে, পাশে দিবাকর দেখে।
—মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মালতা ছন্দের আগে দুই মাত্রা যোগ করিলে মালতী-লতা ছন্দ হয়। মাত্রা-সঙ্কেত—২+৮+৭।

মালতী ছন্দের পরে ছয় মাত্রা যোগ করিলে বিশাখ-পয়ার ছন্দ হয়। মাত্রা-সঙ্কেত—৮+৭+৬। যথা—

স্বাধীনতা-হীনতায়   কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল   কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়॥—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহার পর ত্রিপদীর রীতিটা দেখা যাউক। এই ছন্দের অপর নাম লাচাড়ী (লাচাড়ি, নাচারী, নাচারি)। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে লাচাড়ী ছন্দের উল্লেখ আছে। 'লাচাড়ী' শব্দের মূল কি, এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, 'লাচাড়ী' 'নাচুনী' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দীনেশবাবু মনে করেন, ইহা 'লহরী' শব্দ হইতে আসিয়াছে। দীনেশবাবুর এই অভিমত ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত নহে, যেহেতু 'লাচাড়ী'র চ-কার 'লহরী' হইতে কোনো মতেই আসিতে পারে না। 'নাচুনী' শব্দ হইতে 'লাচাড়ী'-র উৎপত্তি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ত্রিপদী চতুষ্পদ ছন্দ

নহে, ইহাতে তিনটি পদ থাকে। আমার বিশ্বাস, নাচাড়ী বা নাচারি শব্দটা ন-চারি শব্দের বিকার। সঙ্গীতশাস্ত্রে 'লহচাড়ী' নামে একটি ছন্দের উল্লেখ আছে *। 'ন-চারি' শব্দ লহচাড়ীর মূল বলিয়া মনে হয়।

প্রাকৃত ছন্দের অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্রিপদী ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। নিম্নে একটি প্রাকৃত ত্রিপদী ছন্দ উদ্ধৃত হইল—

তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবণ বহ খরা
লগ ণহি জল বড় মরু থল
জণ জিঅণ হরা।
দিসই চলই হিঅঅ ডুলই
হম ইকলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ সুণহি পহিঅ
মণ ইছই কহূ ॥—প্রাকৃতপৈঙ্গল।

এই বৃত্তে তিনটি চরণ এবং প্রত্যেক চরণের পর যতি পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উক্ত প্রাকৃত ছন্দ হইতেই বাঙ্গালায় ত্রিপদী ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ আছে তাহাও প্রাকৃত ত্রিপদী ছন্দের অনুকরণে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রিপদীর তৃতীয় পদের শেষে যে দুইটি অতিরিক্ত মাত্রা থাকে তাহা আগের মাত্রাসমষ্টির গতিকে বাধা দিয়া থাকে। নতুবা ত্রিপদী ছন্দ উছট খাইয়া পড়িত। ত্রিপদী ছন্দ চারি প্রকার—লঘু, তরল, দীর্ঘ ও ললিত। লঘু ত্রিপদী—৬+৬+৮। কখনো কখনো ইহার ষষ্ঠ ও দ্বাদশ মাত্রায় মিল থাকে; কখনো কখনো বা মিল থাকে না। এখানে লঘু ত্রিপদীর একটি উদাহরণ দিতেছি—

যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মমের বাতি
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।—সম্ভাবশতক।

* সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকা, ১৫ পৃ.—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

দীর্ঘ ত্রিপদী—৮+৮+১০। যথা—

হরিচন্দ্র মহারাজা রাজা রাণী করে পূজা
উরিলেন ধর্ম্ম জগপতি।
দেখ এই কূর্ম্মরাজে বেড়িআছে নাগরাজে
চারিদিকে ষোলসত্ত গতি ॥—শূ.পু., ৭০ পৃ.।

এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলেন রণে
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড তাহার উত্তরকাণ্ড
গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥—রামায়ণ, কৃত্তিবাস।

ওহে ত্রিভুবনপতি বুঝি না তোমার মতি
কিছু ত অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু
সবার সর্ব্বস্বধন চাহি।—প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথ।

আর না আর না খেলা, ডেকে লও এই বেলা,
লীলাময়! আর কেন, হায়!
মরণ-সিন্ধুর নীরে তুফান তুলিয়া ধীরে
ডুবাইয়া লও করুণায়।—শীতান্তে (কুহু ও কেকা)—
—সত্যেন্দ্রনাথ।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল নোতুন ছন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের রূপান্তরমাত্র। কোনো কোনো স্থলে পয়ার ও ত্রিপদীছন্দের মাত্রা কমাইয়া বা বাড়াইয়া, কোনো কোনো স্থলে বা তাহাদিগকে সুকৌশলে ও বিচিত্ররূপে মিশ্রিত করিয়া নোতুন নোতুন ছন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আরেক ধরণের অভিনব ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহার এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। তিনি আবার মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া ছন্দের গতিকে দ্রুততর করিয়াছেন। যথা—

হে ভূপাল, ধরহ বচন,
(অকারণ) রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে ?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।

—বুদ্ধদেব।

পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য এক প্রকার ছন্দ বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার নাম দিতেছি 'ছড়ার ছন্দ'। পূর্ব্বে এই প্রকার ছন্দ গ্রাম্য ছড়াতে প্রচলিত ছিল; স্ত্রীসমাজেও ইহা ব্যবহৃত হইত। এই ছন্দের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহার কতক ধ্বনি নিজস্ব এবং কতক ধ্বনি কণ্ঠের নিকট ধার-করা। ইহার আরেকটি রীতি এই যে, ইহাতে যথেষ্ট যতি থাকে। একটা উদ্ধৃত করি—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো' বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হ'লো তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান॥

আমার বক্তব্য ক্রমশ বড় হইয়া উঠিতেছে বলিয়া সম্প্রতি আমাকে এস্থানেই নিরস্ত হইতে হইতেছে। নতুবা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আরো অনেক কথা রহিয়াছে। এখানে কেবলমাত্র সামান্য দিগ্‌দর্শন করা হইল।

অষ্টম স্তবক

বাঙ্গালা সাহিত্য বিভিন্ন ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত। বিভিন্ন ধর্ম্মের উত্থান ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবধারারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এই পরিবর্ত্তন অনুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) বৌদ্ধ-যুগ—এই যুগের সাহিত্য বিকৃত ও রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া লিখিত। ইহাতে সহজিয়ামত এবং নাথপন্থ প্রচার করা হইয়াছে।

(২) মঙ্গল-কাব্যের প্রথম যুগ—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইয়া পড়িলে বৌদ্ধগণ আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের দেবদেবীকে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নামে চালাইতেছিলেন। এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্য যে সকল বাঙ্গালা পুরাণে প্রচার করা হইয়াছে তাহাদেরই নাম মঙ্গল-কাব্য।

(৩) বৈষ্ণব-যুগ—বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের অধঃপতন হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এই যুগের সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেমের নানাবিধ রসলীলার আবেগে পরিপূর্ণ।

(৪) অনুবাদ-যুগ—এই যুগে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

(৫) মঙ্গল-কাব্যের দ্বিতীয় যুগ—বৈষ্ণবধর্ম্মের অধঃপতন এবং শিবায়নধারার পুনরুত্থানে শিব, চণ্ডী, পদ্মা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য এই যুগের সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) কবি ও পাঁচালী যুগ—এই যুগের সাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং এই প্রাধান্য দেখাইতে যাইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

আমরা আধুনিক যুগকে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করি নাই। আধুনিক যুগের সাহিত্যে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি নানা ধারার সমাবেশ এবং পাশ্চাত্য ভাব, বিশেষ করিয়া, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। এজন্য এই পুস্তকে এতগুলি বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া কবি ও পাঁচালীযুগের আলোচনা করিয়াই বিরত হইব। ভবিষ্যতে আধুনিক সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

(১) বৌদ্ধ-যুগ।

এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্লাবিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান-চোয়াঙ সারা বাঙ্গালা দেশে সত্তরটি বৌদ্ধবিহার ও আট হাজার বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। ইহার পর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ অন্যূন সাড়ে চার শ' বৎসর প্রবল পরাক্রমের সহিত বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই শাসনকালে পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ ও চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল; গোটা বাঙ্গালা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিন্তু সে যুগের বৌদ্ধধর্ম্ম নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল। প্রাচীন রূপ আর

প্রায় নাই বলিলেই চলে, কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। কাজেই ইহার ক্রম-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস জানিতে হইলে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এজন্য আমরা অতি সংক্ষেপে নিম্নে ক্রমপরিবর্ত্তন-ধারার অবতারণা করিতেছি।

বৌদ্ধগণ জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের প্রতীক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের পূজা করিয়া থাকেন। মহারাজ অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান ও মহাযান শখায় বিভক্ত হয়। মহারাজ কণিষ্ক নিজের জীবনে মহাযানের নীতিগুলি সম্যক্ পালন করায় সেই সময়ে মহাযান ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মহাযান ধর্ম্মমতের মূলে নাগার্জ্জুনের মতবাদ মাধ্যমিক দর্শন বিদ্যমান।

কালক্রমে মহাযান বজ্রযানশাখায় রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ও তন্ত্রের সংমিশ্রণে বজ্রযানের উৎপত্তি। তন্ত্র ভারতবর্ষের বাহির হইতে অসিয়াছে। কুলালিকায়াম্ন বা কুব্জিকামত তন্ত্রে এবিষয়ের প্রমাণ আছে। ইহাতে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্বতঃ।
যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমস্তয়া সহ॥"

তিব্বতে তন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং সেখান হইতে ভারতবর্ষে আসে। তিব্বতের বোন-ধর্ম্মই (Bon Religon) তন্ত্রের মূল। এসম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি * বলিয়া এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না। প্রাচীন কালে তিব্বতের সঙ্গে কাশ্মীর, বাঙ্গালা ও আসামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; কাজেই প্রথমে এই তিন স্থানেই তন্ত্রের প্রধান আড্ডা হয়। তখন ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও তন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না; পরে এই সকল স্থান হইতে তন্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র বহুলভাবে বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে বৌদ্ধেরা প্রচারের সুবিধার জন্য তন্ত্রের অনেক বিষয় নিজ ধর্ম্মের অনুযায়ী করিয়া গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতিত হইয়া বজ্রযানে পরিণত হয়। এই নোতুন ধর্ম্মে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের বিশেষ স্থান রহিল না। ত্রিরত্নের স্থান গ্রহণ করিলেন বজ্র। পুরাণ ও তন্ত্রে বজ্র বলিতে শিবকেও বুঝায়। তন্ত্রে আবার শিবের আধিপত্য খুব বেশী; কারণ তিনিই যে এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সুতরাং বৌদ্ধেরা যখন তন্ত্রকে আশ্রয় করিলেন তখন তাহার প্রধান উপাস্য দেবতা শিবকে বাদ

* Modern Review, August, 1934.

দিতে পারিলেন না; কিন্তু শিব আসিলেন বজ্ররূপে। তাঁহারা বজ্রের বিশ্লেষণ করিলেন, —'ত্রিস্থচিকং ভাবয়েদ্বজ্রম্' (ডাকার্ণব, দ্বাদশ পটল)-অর্থাৎ বজ্র ত্রিফলা-যুক্ত। বজ্রযানবাদী বৌদ্ধেরা ত্রিফলা-যুক্ত বজ্রকে ত্রিরত্নের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কাজেই তন্ত্রের বজ্র ও বজ্রযানের বজ্রের মধ্যে শব্দগত বৈষম্য না থাকিলেও অর্থগত পার্থক্য অনেক।

বজ্রযানের দুইটি ধারা আছে, সাধনার ধারা ও তত্ত্বের ধারা। একই মহানদীর দুইটি শাখা, কিন্তু মূল একই। বজ্রযানের সাধনার ধারা হইতে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি এবং তত্ত্বের ধারা হইতে সহজিয়ার (সহজযান বা সহজধর্ম্ম) উদ্ভব হয়। সহজ সিদ্ধির সাধনপ্রণালী, হঠযোগ, তাহাদের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্যনির্ণয় এবং ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই নাথ সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য; আর সহজিয়া-সাহিত্য মহাসুখতত্ত্বে পরিপূর্ণ। এক সম্প্রদায় কেবল মন্ত্র, পূজা, হঠযোগ প্রভৃতির পক্ষপাতী ছিলেন, অপর সম্প্রদায় প্রেম ও ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার সাধনা করিলেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বভাবতই একটা বিরোধাভাস দেখা যায়। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে নানা উপায়ে এই বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, বজ্রযান হইতে সহজযান বা সহজিয়ার উৎপত্তি। বজ্রযানে আমরা সহজধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর দেখিতে পাই। ইহাতে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক মানুষ জন্মের পর হইতেই বজ্রত্বলাভে সমর্থ এবং এক জীবনেই সে বিনা বাধায় বজ্রত্ব লাভে করিতে পারে;—

অনেন সর্ববুদ্ধত্বং সর্বসৌরিত্বমেব চ।
সর্ববজ্রধরত্বঞ্চ সিধ্যন্তীহৈব জন্মনি॥—বজ্রডাকতন্ত্র।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের বজ্রত্বলাভের অধিকার জন্মে বলিয়াই সহজ বা সহজাত। বজ্রযানে মানুষের অধিকারকে সব চেয়ে বড় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই অঙ্কুরিত ভাবটি সহজিয়ায় ক্রমশ পল্লবিত হইয়াছে। সহজিয়ায় মানুষের স্থান সকলের উপরে; মানুষই সত্য, আর সব মায়া বা মিথ্যা। সহজিয়ারা মানুষকে মানিলেন সার, আর সব খোসা। তাঁহারা কোনো ধর্ম্মের বিধি বা সামাজিক প্রথা মানিলেন না। তাঁহারা বেদ, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, জৈন ধর্ম্ম, এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্মেরও নিন্দা করিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে সহজিয়ারা বলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীরা ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া থাকে, ঘরের কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায়, কানে ফুঁ দেয়, জটা ধারণ করে আর লোককে ঠকায় *। জৈন ও বৌদ্ধদের উপর তাঁহাদের বড় রাগ। তাঁহারা বলেন, এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী নানা উপায়ে লোককে ধাঁধা দেয়। জাতি-ভেদের উপরও সহজিয়ারা বড় চটা।

* ঘরহি বইসী দীবা জালী। কোনেহিঁ বইসী ঘণ্ডা চালী॥ কন্নেহি খুসখুসাই জনবন্ধী। সীমন্থ বাহিরএ জডভারেঁ।—সরোজবজ্রের দোহাকোষ।

বজ্রযান-মতাবলম্বীরা শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ এই তিনটি পদার্থকে স্বীকার করিলেন। মহাসুখবাদীদের মতে শূন্যই নৈরাত্মদেবী। বিজ্ঞানপ্রভাবে সাধক নির্ব্বাণলাভমাত্র নৈরাত্মদেবীকে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন। এই ভাবটি সহজযানে পরিস্ফুট হইয়াছে। সহজিয়ামতে মহাসুখের স্থান অতি উচ্চে। বজ্র সহজযানে আসিয়া মহাসুখে পরিণত হইয়াছেন ;—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্র্।—ডাকার্ণব, তৃতীয় পটল।

এই মহাসুখই মহাপ্রভু, মহাশূন্য ; তিনি করুণা, তিনি সর্ব্বদেবতা, তিনি পরমাত্মা এবং তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ। মহাসুখের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীহেবজ্রে বলা হইয়াছে—

একারাকৃতি যদ্দিব্যং মধ্যে বংকারভূষিতম্।

আলয়ঃ সর্বসৌখ্যানাং বুদ্ধরত্নকরণ্ডকম্॥

এ-কার এবং (অন্তঃস্থ) ব-কারের মিলনই মহাসুখ ও ত্রিরত্নের আধার। এ কার যোনির এবং ব-কার লিঙ্গের প্রতীক §।

অন্যত্র,—

একারস্তু ভবেৎ মাতা বকারস্তু রতাধিপঃ।

বিন্দুঃ চানাহতং জ্ঞানং তজ্জাতান্যক্ষরাণি চ॥

এখান হইতে রসের উৎপত্তি। নর-নারীর সম্ভোগই রস। রস দুই প্রকার— স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া-রসই সহজিয়া বা সহজ-সাধনের মূল ভিত্তি। সহজিয়ারা মহাসুখ-সম্ভোগ সাধনার চরম আদর্শ স্থির করেন। নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ হইতে মহাসুখের উদ্ভব। এই সাধনে সাধককে একমাত্র পরকীয়া-রস আশ্রয় করিয়া ভজন করিতে হয়। এইরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুররস বিকশিত হয় এবং তখনি—

"শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।"

মানুষই অনন্বয়, মানুষই মধুর ও সুন্দর। সহজিয়ারা একমাত্র মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিলেন, ঈশ্বরের সত্তাকে অস্বীকার করিলেন। কেবলমাত্র মানুষের সেবাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলেন।

সাহজিয়া ধর্ম্মের এই যে মূল তত্ত্ব তাহার বীজ সর্ব্বপ্রথম মহাযানে রোপিত হইয়াছিল। মহাযানীদের মতে শূন্যতাই করুণা, উভয়েই অনন্ত। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব করুণাপরবশ হইয়া জগতের সকল প্রাণীরা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত নিজের নির্ব্বাণলাভে ইচ্ছা করেন নাই, —

§ Indische Palaeographie, Tafel II, col. 2.

"যাবদবলোকিতেশ্বরস্য বোধিসত্ত্বস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ন পরিপূরিতা ভবতি সর্বসত্ত্বাঃ সর্বদুঃখেভ্যঃ পরিমোক্ষিতাঃ যাবদনুত্তরায়াঃ সম্যক্সম্বোধৌ ন প্রতিষ্ঠাপিতা ভবন্তি।"—কারণ্ডব্যূহ।

ক্রমে এই বীজটি যে বজ্রযানে অঙ্কুরিত এবং সহজযানে পল্লবিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই গভীর তত্ত্বই কালক্রমে শিষ্যপরম্পরায় পরিস্রুত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছে ; উহা বহু শতাব্দীর চিন্তাসুধার অমৃতময় ফল। এই মূল তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা সামাজিক ও কর্ম্মজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মজীবনের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

ধর্ম্মের যে অঙ্গে মানুষে মানুষে বিরোধের সম্ভাবনা, সহজিয়ারা তাহা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া যাহা শাশ্বত তাহাই গ্রহণ করিলেন। মানুষে মানুষে যে খাঁটি সম্বন্ধ তাহাই তাঁহারা প্রচার করিলেন। সহজিয়া কোনো সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহা মানুষমাত্রেরই ধর্ম্ম ; ইহা সত্য ও সনাতন মানব-ধর্ম্ম।

বজ্র নাথধর্ম্মে শূন্যে পরিণত হইয়া পূজা পাইতে আরম্ভ করেন। আবার ধর্ম্মধাতু হইতে বজ্রের উৎপত্তি। এজন্য নেপালে এবং পালরাজগণের সময় হইতে বঙ্গদেশে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় রত্ন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্ম্ম অনেক সময় শূন্যরূপে পূজা পাইতেন। ধর্ম্মই বুদ্ধ, ধর্ম্মই বজ্র, ধর্ম্মই শূন্য। এই ধর্ম্মই পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে ধর্ম্মঠাকুররূপে প্রচারিত হইয়াছেন। বজ্রযানে প্রথম ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনকে নাথ বলা হইয়াছে, কিন্তু নাথধর্ম্মে শিব নাথ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মে ধর্ম্মনিরঞ্জন ও শিব উভয়েই পূজা পাইয়া থাকেন। এইজন্য নাথপন্থী যোগীদের পুরোহিতগণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ এবং যোগীরা শিবগোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। এই ধর্ম্মে বহু হিন্দু দেবতাকে স্বীকার করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে ; তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মঠাকুরের পদসেবা করিয়াছেন। কালক্রমে ধর্ম্ম স্তূপের আকার ধারণ করিয়া দেখা দেন। এই স্তূপের গায়ে চারিদিকে চারটি ও মাঝে একটি এই পাঁচটি কুলঙ্গি কাটা হয়। এই পাঁচটি কুলঙ্গি অক্ষোভ্য, অমিতাভ, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি ও বৈরোচন এই পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের প্রতীক। ইহা দেখিতে কতকটা কচ্ছপের মত। এইরূপে ধর্ম্ম ও কচ্ছপ এক হইয়া গেল। বর্দ্ধমান জেলায় ধর্ম্মঠাকুরকে কালাচাঁদ বলা হয়। তিনি কূর্ম্মাকৃতি। ঐ অঞ্চলের লোকেরা কচ্ছপ খাইতে হইলে একরাত্রি উহাকে পাতনা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। যদি ঐ রাত্রিতে কচ্ছপটি চলিয়া যায় তবে সেই কচ্ছপটি কালাচাঁদরূপী ধর্ম্মঠাকুর, আর যদি না যায় তবে সে কালাচাঁদ নয় এবং তাহাকে খাইতে পারা যায়। ক্রমে কূর্ম্মাকৃতি স্তূপ শিলায় রূপান্তরিত হন। বর্ত্তমানে ধর্ম্মঠাকুর শিলারূপে রাঢ় দেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাঢ় দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশিলার পূজা হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে এককালে নাথপন্থী যোগীরা অতি প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু এখন ইহাদের প্রভাব ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইহারা ক্রমশ খাঁটি হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডির ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং নাথধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদের উপাস্য দেবতা নিরঞ্জন ধর্ম্ম শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে হিন্দুশাস্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছেন। এককালে যে ধর্ম্মঠাকুরকে এই দেশের হাড়ি, বাগদী, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূজা করিত, বর্ত্তমানে সেই ধর্ম্মঠাকুরকে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণ পূজা করিয়া থাকেন। এখন সেই অহিংসা-নীতির প্রচারক বুদ্ধরূপী ধর্ম্মের পূজায় ছাগ, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। এইরূপে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়।

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

এই পুস্তকখানি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বারা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি চার ভাগে বিভক্ত—আশ্চর্য্যচর্য্যাচয় *, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনখানির সংস্কৃত টীকা আছে। শাস্ত্রীমহাশয় উক্ত চারখানি পুঁথি নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া একত্রে ছাপাইয়াছেন। প্রাচীনতম বাঙ্গালা সাহিত্যের এই আবিষ্কার শাস্ত্রী মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার প্রকাশিত এই অমূল্য গ্রন্থ রহিয়া গেল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পূজারীগণ এই গ্রন্থেই শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিবেন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্পাদিত পুস্তক নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। তিনি অনেক স্থলে 'ঘটক-চূড়ামণি' স্থানে 'ঘট-কচু-ড়ামণি'-বৎ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাহার ফলে পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে এবং অর্থনির্ণয়ে অনর্থক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। সম্প্রতি সুনীতিবাবু ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় একত্রে আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ

* টীকায় আছে—শ্রীলূইচরণাদিসিদ্ধরচিতেহপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে"। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাসীতে এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যচর্য্যাচয় নামই সমীচীন মনে করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নাম কোথায় পাইলেন জানা যায় না। প্রবোধবাবু ও শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় কেন চর্য্যাশ্চর্য্য-বিনিশ্চয় নামকরণ করিলেন বুঝিলাম না।

প্রস্তুত করিতেছেন; শীঘ্রই ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইবে। মদীয় গুরু পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষের পাঠ শুদ্ধ করিয়া একটি সংস্করণ ফরাসী ভাষায় সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে ডাকার্ণবের একটি শুদ্ধ সংস্করণ ছাপাইয়াছি। এইরূপে শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্পাদিত "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা"র অশুদ্ধ পাঠ অনেকটা ঠিক হইয়াছে।

বৌদ্ধগান ও দোহার চারখানি পুঁথিই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের রচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার গঠনযুগে বৌদ্ধগান ও দোহার পদগুলির সৃষ্টি হইয়াছে; তবে পুথিগুলি তত প্রাচীন নহে। তাহাদের বয়স চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই সকল পুঁথিতে সহজিয়া-মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সহজিয়া ধর্ম্মের পুঁথিগুলি সন্ধা বা পারিভাষিক ভাষায় লিখিত। এসব ক্ষেত্রে নীতার্থ অচল, নেয়ার্থ অনুসারে পদের ব্যাখ্যা করিতে হয়, এজন্য সহজে অর্থবোধ হয় না। সাধকগণ গুরুপরম্পরায় এই সকল শব্দের নেয়ার্থ বুঝিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা নিয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা, বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা প্রাচীন বিহারী। এই মত সর্ব্বপ্রথম রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রচার করেন, পরে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ইহার বিশেষ পোষকতা করেন।* কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই উপযুক্ত যুক্তি দিতে পারেন নাই। যে যুগে এই সকল পুঁথি লেখা হইয়াছে, সে যুগের বাঙ্গালা ও বিহারী ভাষার প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। সেকালে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ও বিহারী ভাষা দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতিই একমাত্র কষ্টিপাথর। বিহারী ভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহার বর্ণমালায় মূর্দ্ধন্য ষ-কারের স্থান নাই। মূর্দ্ধন্য ষ-কারকে 'খ' গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষায় মূর্দ্ধন্য ষ-কারের বিস্তর প্রয়োগ আছে, অথচ এমন একটিও উদাহরণ নাই, যেখানে ষ-কারের স্থান খ-কার অধিকার করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দও আছে। আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের ভাষা নিয়া সুনীতিবাবু অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে এই ভাষাকে খাঁটি প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সুনীতিবাবুর মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। তিনি দেখাইয়াছেন, আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব থাকিলেও ইহার ষষ্ঠীবিভক্তিতে—এর, অর, চতুর্থীবিভক্তিতে—রে, সপ্তমীতে—ত, পদান্তে 'মাঝ',

*Presidential address to the Seventh All-India Oriental Conference of Baroda, 1933.

'অন্তর' ও 'সাঙ্গ' শব্দের প্রয়োগ; অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াবিভক্তি যথাক্রমে —ইল, ইব (কিন্তু বিহারীতে—অল, অব), শতৃপ্রত্যয়ে—অন্ত, কর্ম্মবাচ্যে—ইঅ, সংশয়ার্থে বা ভাবে—ইলে, ক্রিয়াপদ 'আছ', 'থাক' (কিন্তু মৈথিলীতে 'থিক', উড়িয়ায় 'থা'), এবং অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দেরও প্রয়োগ আছে। আশ্চর্য্যচর্য্যাচয় হইতে কয়েকটি নমুনা এখানে দিতেছি।

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস
সুনুপাখ ভিতি লাহু রে পাস ॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে[1] দিঠা
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা[2] ॥—চর্য্যা ১ ॥

[কায়া তরুবর, তাহার পাঁচটি ডাল আছে। কাল চঞ্চল চিত্তে প্রবেশ করিল। লুই বলিতেছেন, মহাসুখের পরিমাণ দেখিয়া (তাহা) গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান। সকল প্রকার সমাধির দ্বারা কি করিবে? সুখ ও দুঃখে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। ওরে ছন্দের বন্ধন এবং করণের প্রতিপত্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া শূন্যপক্ষরূপ ভিত্তির কাছে যাও। লুই বলেন, আমি ধ্যানে দেখিয়াছি, আমার দেবতা ধমণ ও চমণে অর্থাৎ আলি ও কালিতে আসন করিয়া বসিয়া আছেন।]

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই[3] ॥
আঙ্গন ঘর পণ[4] সুন ভো বিআতী[5]।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥
সসুরা[6] নিদ গেল বহুড়ী[7] জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগিঅ ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই[8] ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মঝেঁ একুড়ি অহিঁ সনাইড় ॥—চর্য্যা ২ ॥

১। মূলে 'সাণে'—নেওয়ারী 'ঝ' ও 'স'তে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ২। মূলে 'বইণ'। ৩। মূলে 'খাঅ'। ৪। প্রাপণ >পাপণ >পণ ('প্রাপ্য' অর্থে)। ৫। বিভাতা (=পরিশুদ্ধা) >বিভাতী (স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ') >বিহাতী >বিআতী। ৬। মূলে 'সুসুরা', টীকায়, 'সসুরা'। ৭। অবধূতী >বহূটী >বহুড়ী। ৮। কাল >কাড়।

[দুলি দুহিয়া পীঁড়িতে ধরিতেছে না। কুম্ভীর গাছের তেঁতুল খাইতেছে। ওগো বিআতী অঙ্গনকে ঘরে আন। অর্দ্ধরাত্রিতে কানেট চোরে (অঙ্গনকে) লইয়া গেল। সসুরা নিদ্রা গেল, অবধূতী জাগিয়া আছে। কানেট চোরে লইয়া গেল, কোথায় যাইয়া খুঁজিবে? দিবসে অবধূতি কালকে ভয় পায়, (কিন্তু) রাত্রিতে কামরূতে যায়। কুক্কুরী-পাদের দ্বারা এইরূপ চর্য্যা গীত হইল। কোটির মধ্যে একটিতে (অর্থাৎ একজনের হৃদয়ে) প্রবেশ করিল।]

জো মণ গোঅর[1] আলা জালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায় ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ॥
জে তই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে[2] সীসা কাল ॥
ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বি কইসা[3]।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥

[যাহা মনের গোচর (তাহা) বৃথা। আগম, পুঁথি এবং ইষ্টমালাও (বৃথা)। বল, কেমন করিয়া সহজ বা বলা যায়, যাহাতে কায়, বাক্ ও চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না। গুরু বৃথা শিষ্যকে উপদেশ দেন; যাহা বাক্‌পথের অতীত, তাহাকে কি করিয়া কহা যায়। যে তবু বলে, সে (লোককে) ভাঁড়ায়। গুরু বোবা (এবং) শিষ্য কালা। কাহ্নু বলিতেছেন, জিনরত্ন কেমন? যেমন কালা বোবাকে বুঝায়।]

আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের পদগুলিতে বিভিন্ন রাগের উল্লেখ আছে, নিম্নে দিতেছি—পটমঞ্জরী, গবড়া (গবুড়া বা গউড়া), অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ (দেশাখ), ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বরাড়ী (বড়ারী বা বলাড্ডি), শীবরী (শবরী), মল্লারী, মালশী (মালসী), কহ্নুগুঞ্জরী, বঙ্গাল।

ইহাতে সাতচল্লিশটি পদ আছে। বাইশ জন সিদ্ধাচার্য্য রচনা করিয়াছেন। পদ-কর্ত্তাদের এই এই নাম পাওয়া যায়—(১) লুই—২*; (২) কুক্কুরী—২; (৩) বিরুআ

১। মূলে 'গোএর'। ২। মূলে 'বোধসে'। ৩। মূলে 'বিকসই সা'।
*পদসংখ্যা।

(বিরূপ)—১ ; (৪) গুণ্ডরী (আর এক নাম ধর্ম্মপাদ)—১ ; (৫) চাটিল—১ ; (৬) ভুসুকু—৮ ; (৭) কাহ্ন—১২ ; (৮) কামলি (কম্বলাম্বর)—১ ; (৯) ডোম্বী —১ ; (১০) শান্তি—২ ; (১১) মহিত্তা (মহীধর)—১ ; (১২) বীণা—১ ; (১৩) সরহ (সরোরুহ বা সরোজবজ্র)—৪ ; (১৪) শবর (সবর)—২ ; (১৫) আজদেব (আর্য্যদেব) —১ ; (১৬) ঢেণ্ঢণ (ধেন্তন)—১ ; (১৭) দারিক—১ ; (১৮) ভাদে—১ ; (১৯) তাড়ক—১ ; (২০) কঙ্কণ—১ (২১) জয়নন্দি (জয়নন্দী)—১ ; (২২) গুঞ্জরী (আর এক নাম ধাম)—১ ।

অপর তিনখানি পুঁথির ভাষা ব্রজবুলির মতই কৃত্রিম। বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে উক্ত কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগ অনেক দিনের—মুসলমান দ্বারা বাঙ্গালা দেশ বিজিত হইবারও বহু পূর্ব্বের। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই নেপালে গিয়া আপনাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করেন। নেপালে মৈথিলদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই বাঙ্গালীর রচিত পুঁথিগুলির ভাষায় মৈথিলী প্রভাব পড়িয়াছিল। ইহাতে আবার শৌরসেনী অপভ্রংশেরও ছাপ আছে। নেপালীদের হাতে পড়িয়া ভাষা অনেক স্থলে বিকৃত হইয়াছে। সহজিয়ারা মুখে মুখে এই সকল গান গাইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া ইহাদের বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়। এমন কি সংস্কৃত টীকাকার এবং তিব্বতী অনুবাদকও অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পাঠ ধরিতে পারেন নাই। কাজেই অর্থেরও অনেক গোলমাল হইয়াছে। এই তিনখানি পুঁথি বাঙ্গালীর রচিত এবং ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ আছে বলিয়া ইহারা পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সরোজবজ্রের দোহাকোষ হইতে কয়েকটি নমুনা দিতেছি ;—

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শসি নাহ পবেশ।
তহি বট চিত্ত বিসাম কুরু
সরহে কহিঅ উবেশ ॥

[সরহ উপদেশ দিতেছেন—যেখানে মন ও পবন যাইতে পারে না, (যেখানে) রবি শশীরও প্রবেশ নাই, সেখানে চিত্ত বিশ্রাম করুক।]

ঘরে অচ্ছ, ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়বেশী পুচ্ছই ॥

[ঘরে আছ, ঘরে আছে, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোথায় ? পতিকে দেখিতেছে, (অথচ) প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে (পতি কোথায় ?)।]

পণ্ডিঅ সঅল সথ বক্‌খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই ॥
অমণাগমণ ণ তেন বিখণ্ডিঅ
তোবি ণিলজ্জই ভণই হউ পণ্ডিঅ ॥

[পণ্ডিত সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, (কিন্তু) দেহস্থিত বুদ্ধকে জানে না। ইহাতে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় না, তথাপি নির্লজ্জ বলে, আমি পণ্ডিত।]

একু দেব বহু অঙ্গম[1] দীসই।
অপণু ইচ্ছে ফুড় পড়িহাসই ॥

[একই দেব নানারূপে দেখা দেন। (তিনি) আপন ইচ্ছায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন।]

তিনি এই দোহাকোষ ছাড়া আরো অনেক বই, দোহা ও চর্য্যাপদ লিখিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে তাঁহার চারিটি চর্য্যা আছে।

এখন কৃষ্ণাচার্য্যপাদের দোহাকোষ হইতে কয়েকটি দোহা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

লোঅ[2] গব্ব সমুব্বহই হউ পরমথে পবিন।
কোটিঅ[3] মঝেঁ[4] এক জই[5] হোই নিরঞ্জনলীন ॥—দোহা ১ ॥

[পরমার্থপ্রবীণ বলিয়া লোকে গর্ব্ব করে। (কিন্তু) যদি কোটির মধ্যে একটিও নিরঞ্জনে লীন হয়।]

আগমবেঅপুরাণে পণ্ডিত[6] মান বহন্তি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভময়ন্তি[7] ॥—দোহা ২ ॥

[ভ্রমর যেরূপ পাকা বেলের বাহিরেই ঘোরে (আস্বাদন করিতে পারে না), (সেরূপ যাহারা) আগম বেদ ও পুরাণে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, (তাহারাও) বাহিরে ঘোরে (যথার্থ গ্রহণ করিতে পারে না)।]

এক ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরণি লই কেলি করন্ত।
ণিঅ ঘর ঘরিণী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবর্ণ বিহরিজ্জই ॥—দোহা ২৮ ॥

[মন্ত্র ও তন্ত্রে কোন কিছু করা যায় না। নিজের গৃহিণীকে লইয়া কেলি কর। যতক্ষণ না নিজের ঘর গৃহিণীতে মজ্জিত হয়, ততক্ষণ পঞ্চবর্ণ বিহারে কি হইবে ?]

এই দোহাকোষের দোহা ছাড়াও আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে ইঁহার বারটি চর্য্যা পাওয়া গিয়াছে।

ডাকার্ণব—এই পুঁথিতে গ্রন্থকার বা কোনো পদকর্ত্তার নাম নাই। ইহার সংস্কৃত টীকাও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা তিব্বতী অনুবাদকে আশ্রয় করিয়া ইহার একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছি। সঙ্গে সংস্কৃত ছায়া ও টীকা দিয়াছি। 'ডাকার্ণব' 'ডাক' ও 'অর্ণব' শব্দের সন্ধিতে উৎপন্ন। 'ডাক' শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে। প্রাচীন সংস্কৃতে এই শব্দটি স্থান পায় নাই, অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের

১। অগম > আগম। ২। মূলে 'লোঅহ'। ৩। মূলে 'কোটিহ'। ৪। মূলে 'মাহ'। ৫। মূলে 'জত'। ৬। মূলে 'পণ্ডিত্ত'। ৭। মূলে 'ভুমযন্তি'।

মনে হয়, তিব্বতী ‘গ্দগ্’ (=প্রজ্ঞা, জ্ঞান) শব্দ হইতে ডাকের উৎপত্তি। অতএব
‘ডাকার্ণব’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞানার্ণব’। এই পুঁথির দুই জায়গায় ‘ডাকার্ণবকে’ ‘জ্ঞানার্ণব’
বলা হইয়াছে। একেবারে গোড়ায় আছে—“শৃণ্বন্তু জ্ঞানসাগরান্।” (জ্ঞানসাগর
অর্থাৎ জ্ঞানার্ণব বা ডাকার্ণব শুনুন)। আবার প্রথম পটলের (অধ্যায়ের) শেষে আছে—
“ইতি শ্রীডাকার্ণবমহাযোগিনীতন্ত্ররাজে* জ্ঞানার্ণবাবতারঃ প্রথমপটলঃ।” (শ্রীডাকার্ণবমহা-
যোগিনীতন্ত্ররাজে জ্ঞানার্ণবের পূর্ব্বাভাস নামক প্রথম অধ্যায়)। সুতরাং ‘ডাক’ ও ‘জ্ঞান
যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ডাকার্ণব হইতে দুই একটি নমুনা এখানে দিতেছি ;—

সুণু সুণু বোহি[১] হো[২] পপঙ্কুগও[৩]
ণ কমন্ত উত্তারঅ[৪] চিত্ত হঅ[৫]।
মাই[৬] সহাবই[৭] অচ্ছসি[৮] তুম্ম
তিহুঅণ সল্ল উত্তারঅ[৯] জিম্ম[১০] ॥

[প্রপঞ্চগত বোধিকে শোন, কামাসক্ত চিত্ত (কাহাকেও) উদ্ধার করিতে পারে না।
মায়াস্বভাবে থাকিয়া ত্রিভুবনের সকলকে উদ্ধার কর।]

ইহই[১১] ণ ভাব অভাব[১২] ণ রগ্গ
বিরগ্গ সণ্ঠই ওবণ রজ্জ।
মজ্জট্ঠিও অও ধম্মু ণ রজ্জহ
রজ্জহ বজ্জ[১৩] বিণিধম্মু পমেজু ॥

[এখানে ভাব নাই, অভাবও নাই, রাগ নাই, বিরাগও নাই, কাজেই এখানে অনুরক্ত
হও। (আবার) মধ্যস্থিত ধর্ম্মে আসক্ত হইও না। যে বজ্র ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন, সেই বজ্রে
অনুরক্ত হও এবং তাঁহাকে নিয়া আনন্দ কর।]

ধম্মাধম্মু জই অথগিও[১৪]
তাই তু বন্ধসি বোহি মানু[১৫]।
সিজ্জ সুরাসুর[১৬] সেহ হেও
তুট্টই[১৭] আবইগই[১৮] নিজানু[১৯] ॥

---

* মূলে ‘রাজ্যে’।

১। মূলে ‘বোহিয়’। ২। মূলে নাই, পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩। মূলে ‘পঙ্কুগও’
৪। মূলে ‘উত্তানক’। ৫। মূলে ‘মায়’। ৬। মূলে নাই। ৭। মূলে ‘সইইহাবই’। ৮। মূলে
‘অটসি’। ৯। মূলে ‘উত্তার’। ১০। মূলে ‘অজিম্ম’। ১১। মূলে ‘ইহ’। ১২। মূলে ‘সভাব’।
১৩। মূলে ‘বজ’। ১৪। মূলে ‘অথগিও’। ১৫। মূলে ‘মান’। ১৬। মূলে ‘সুহাসুহ’।
১৭। মূলে ‘তুটই’। ১৮। মূলে ‘আবহগহ’। ১৯। মূলে ‘নিজারণু’।

[যেখানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অস্ত গিয়াছে, সেখানে বোধিতে তুমি মনোনিবেশ কর। সে-ই
সিদ্ধ সুর ও অসুর। নিজের সংসারবন্ধন ছিন্ন কর।]

বৌদ্ধগান ও দোহার পদগুলির রচনাকাল নিয়া আর এক সমস্যা। ডক্টর শ্রীযুত বিনয়তোষ
ভট্টাচার্য্য ও শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে এই সকল গান খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত
হইয়াছে। সুনীতি বাবু সিদ্ধাচার্য্যগণের আবির্ভাবকাল বিচার করিয়া খৃষ্টীয় দশম হইতে
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই বৌদ্ধগানগুলির রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবোধবাবুও
সুনীতিবাবুর মত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও সুনীতিবাবুর নির্দ্দিষ্ট কালই সঙ্গত বলিয়া
মনে করি।

প্রসঙ্গত আমরা এখানে জয়দেবের গীতগোবিন্দের আলোচনা করিয়া লইব। এই
পদাবলীখানি সরল সংস্কৃতে লেখা, কাজেই বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে ইহা অপাংক্তেয়
হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাকে একটু স্থান দিতে হইবে; নতুবা অত্যন্ত অবিচার
করা হইবে। ইহা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইহার
উপাদান। এই গীতিকাব্যখানি বাঙ্গালীর জাতীয়সম্পদ, পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালী
কবিগণের প্রধান উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যে
পর্য্যন্ত গীতগোবিন্দের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। অনেক পদকর্ত্তারা এই গ্রন্থ
অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এখনো বৈষ্ণবকীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তনের
পালায় গীতগোবিন্দের অংশবিশেষ গান করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থখানি সকল বাঙ্গালী
নরনারীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ছন্দের
ঝঙ্কারে ও ভাবের বৈচিত্র্যে ইহা যে কেবল বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা
নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও উহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।
এমন কি য়ুরোপেও এই গীতি-কাব্যখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। নিম্নে
দুই একটি নমুনা দিতেছি,—

রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে।
হৃদয়-মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ,
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০ ॥—সপ্তমঃ সর্গঃ।

[“হায়! কৃষ্ণ মৎপ্রতি নির্দ্দয়, কিন্তু আমার মন তাঁহাতেই অনুরাগী, সুতরাং
আমারই দোষ। যাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে সহচরীসঙ্গ শত্রুসঙ্গের ন্যায়,
সুস্নিগ্ধ সমীরণ বহ্নির ন্যায়, শীতরশ্মির স্নিগ্ধ কিরণ গরলের ন্যায় যাতনাপ্রদ হইতেছে,
সেই নির্দ্দয় হরির প্রতি যখন আমার মন এইরূপে ধাবিত হইতেছে, তখন

নিঃসন্দেহেই বুঝিলাম, রমণীজাতির প্রিয়সমাগমেচ্ছা দুর্দ্দমনীয় ও তাহাদিগের প্রতিকূল।"
—কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের অনুবাদ]

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী,
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচনচকোরম্।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্,
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥ ২॥— দশমঃ সর্গঃ।

["প্রিয়তমে! চারুশীলে! অকারণে আমার প্রতি অভিমান করিতেছ কেন? এ অভিমান ত্যাগ কর। তোমার মুখশোভা দেখিবামাত্র কামাগ্নি মদীয় হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আমাকে ত্বদীয় বদনপদ্মের মধুপান করিতে দেও। অয়ি মানময়ি! প্রফুল্লচিত্তে আমার সহিত একটীমাত্র কথা কহিলেও ত্বদীয় দশনজ্যোতিরূপ জ্যোৎস্নাতে আমার চিত্তের নিবিড় আকাঙ্ক্ষারূপ তিমিরজাল বিদূরিত হইবে। দেখ, ত্বদীয় বিধুবদন আমার নেত্রচকোরকে তোমার অধরসুধাপানে প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছে।"— কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের অনুবাদ]

গীতগোবিন্দের ছন্দে আমরা অপভ্রংশের কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাই। এজন্য কেহ কেহ বলেন, গীতগোবিন্দ প্রথমে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং পরে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই অনুমান নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। গীতগোবিন্দ সুরসংযোগে গীত হইত বলিয়া অনেক স্থলে মাত্রা বা যতির ব্যভিচার দেখা যায়। গায়কদের প্রয়োজন মত মাত্রার লঘুগুরুভেদ হইত বা যতি পড়িত। আবার যে যুগে গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে বাঙ্গালা ভাষা (অবশ্য প্রাচীনতম) ব্যাপকভাবে চলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালীরা তাহাদের কথা-বার্ত্তায় ও সাহিত্যে এই ভাষাকেই স্থান দিয়াছিল। তাহারা প্রাচীনতম বাঙ্গালা পদসকল সুর করিয়া পড়িত। তাহারা যে যে রাগ রাগিণীতে পদগুলি গাইত অবিকল সেই সেই রাগ রাগিণীতে গীতগোবিন্দও গাওয়া হইত। আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের রাগ রাগিণীর নামগুলির সহিত গীতগোবিন্দের রাগ রাগিণীর নামগুলি তুলনা করিলে অনেকগুলি নাম সাধারণ দেখা যাইবে। যেমন, আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে 'গউড়া' (গবুড়া বা গবড়া), 'গুঞ্জরী', 'ভৈরবী', রামক্রী', 'বরাড়ী' (বড়ারী), 'দেশাখ' (দ্বেশাখ) ইত্যাদি; গীতগোবিন্দেও 'গৌড়', 'গুজ্জরী, ভৈরবী', 'রামকিরী', 'বরাড়ী', 'দেশাগ' প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। কাজেই অনেক স্থলে গীতগোবিন্দের পদগুলি সংস্কৃত ছন্দের বিধি লঙ্ঘন করিয়া অপভ্রংশ বা প্রাচীনতম বাঙ্গালা ছন্দের মাত্রা ও যতির নিয়ম মানিয়া চলিত।

শূন্য-পুরাণ

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তকখানি আবিষ্কার করেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন "রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি"। এই পুস্তকের প্রথম সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। পুস্তকখানি কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন "শূন্য-পুরাণ"। কিন্তু পুঁথির কোন স্থানেই উক্ত দুই নাম পাওয়া যায় না। একটি স্থানে ইহাকে 'আগমপুরাণ' বলা হইয়াছে।

মহাপাপী বিনাসন করএ মুক্তাচানে।
রামাই পণ্ডিত কহএ আগমপুরাণে॥

কাজেই এই পুস্তকের প্রকৃত নাম আগমপুরাণ। শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মঠাকুরের পূজার বিধান লিখিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ইহার নাম রাখিয়াছেন 'শূন্যপুরাণ'। এখন ইহা শূন্যপুরাণ নামেই পরিচিত। আমরাও এই নাম গ্রহণ করিলাম। শূন্যপুরাণকে আবার 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৩৩৬ সালে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের আর একটি সংস্করণ সম্পাদন করেন। ইহা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, এখন আমাদের তাহাই বিচার্য্য। পুঁথিমধ্যে যে সকল ভণিতা আছে তাহাতে দেখিতে পাই— শ্রীজুত (যুত) রামাই, রামাই পণ্ডিত, পণ্ডিত রামাই, পণ্ডিত রাম, শ্রীরাম পণ্ডিত, রামাঞি, দ্বিজ রামাঞি। এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তকেও এই নাম পাওয়া যায়। এ অবস্থায় রামাই পণ্ডিতকে একজন কল্পিত লোক বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিত নামে যে একজন লোক ছিলেন এবং তিনিই যে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতিতে এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে;—

রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করে নিরন্তর।
তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর॥
তারপর দিকে দিকে রামাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন॥

শূন্য নিরঞ্জন ধর্ম্মের কথা প্রথমে লোকমুখে গীত হইত এবং পরে যে রামাই

পণ্ডিত তাহা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ অনেক স্থলেই দেখা যায়। শূন্যপুরাণে স্পষ্টভাবে—

"শ্রীধর্ম্মচরণে মহাভক্তি নিজোজিত।
স্বনিআ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত॥"

বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। ময়ুরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা ধর্ম্মপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি অপভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতেতর ভাষায় লিখিয়াছিলেন।

রামাই পণ্ডিতের পিতার নাম বিশ্বনাথ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজে পতিত হইলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক হিমালয়ে আসিলেন। উক্ত পর্ব্বতে রামাইর জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে রামাইর পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। অনাথ রামাই ব্রাহ্মণধর্ম্মবিরোধী অন্য কাহারো দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এইজন্য রামাইর প্রতিপালক তাঁহাকে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত না করিয়া ডোমপণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত তাম্রদীক্ষা দিলেন। উক্ত দীক্ষার পর ধর্ম্মপূজায় তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল।

অনিলপুরাণের মতে রামাই হিমাই পণ্ডিতের পুত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামাই পণ্ডিত হিমালয় পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতিতে আছে;—

হিমালয়মধ্যে জন্মব্রাহ্মণকুমার।
বৈশাখীয় শুক্লপক্ষে জনম তাহার॥

বোধ হয়, রামাই পণ্ডিতের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে হিমাই (=হিমালয়) পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। সিদ্ধাচার্য্যগণ পণ্ডিত বা মহাপণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন। ধর্ম্মপূজার পুরোহিতদিগকেও পণ্ডিত বা গুরুপণ্ডিত অর্থাৎ মহাপণ্ডিত বলা হয়;—

"ছত্রিশ জাতিকে দিবে তাম্র আমার বচনে।
গুরুপণ্ডিত নাম তার ঘুষিবে ভুবনে॥"

আবার ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি পণ্ডিতপদ্ধতি নামে পরিচিত।

রামাই পণ্ডিত চম্পানদীর তীরে হাকন্দ গ্রামে বাস করিতেন। ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে হাকন্দ-পুরাণ নামে ধর্ম্মপূজার একখানি পুঁথির উল্লেখ আছে। আমাদের মনে হয়, এই শূন্যপুরাণকেই হাকন্দ-পুরাণ বলা হইয়াছে। সম্ভবত হাকন্দ গ্রামে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই গ্রামের নামানুসারে পুঁথির নামকরণ করা হইয়াছে। শূন্যপুরাণ ছাড়া তাঁহার 'ধর্ম্মপূজা-বিধান' নামে আর একখানি পুঁথি আছে। ইহা মদীয় গুরু পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বৃদ্ধ বয়সে রামাই পণ্ডিত অজ্ঞাতকুলশীলা কেশবতী নামে এক দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মদাসের জন্ম হয়। যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতিতে দেখিতে পাই, রামাই পণ্ডিত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, সে ডোমের পুরোহিত হইবে;—

"এত শুনি ক্রোধে বলে রামাই পণ্ডিত।
কলিকালে হবে তুমি ডোমের পুরোহিত॥"

উক্ত পুস্তকের আরেকটি স্থানে লেখা আছে;—

"ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।"

এক্ষণে ডোমের অর্থনির্ণয় করা যাউক। ডোম একটি জাতিবিশেষ। রাঢ়দেশে এখনো এই জাতি আছে। ডোমেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সমাজে তাহাদের স্থান অতি নীচে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের জল স্পর্শ করেন না। হেমচন্দ্রের দেশীনামমালায় (৪।১১) এই জাতি 'ডুম্ব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দক্ষিণ তিব্বতে 'গ্তুম্- প' নামে একটি পার্ব্বত্য জাতি আছে। তিব্বতী 'গ্তুম্-প' শব্দের অর্থ 'চণ্ডাল'। তাহারা 'গ্তুম্-ম' (=চণ্ডী) দেবীর পূজা করিয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, এই জাতিরই একটি শাখা বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ডোম নামে পরিচিত হইয়াছে। আর তাহাদের দেবী 'গ্তুম্-ম' 'ডোম্বী' নাম গ্রহণ করিয়া ভগবতী দুর্গা দেবীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। সহজযানে ডোম্বী 'নৈরাত্মদেবী'রূপে এবং সন্ধা ভাষায় 'যোগাগ্নি' রূপে দেখা দিয়াছেন।

শূন্যপুরাণ হইতে রামাই পণ্ডিতের সময় নির্দ্দেশ করা যায় না। রামাই পণ্ডিতের কাল সম্বন্ধে মদীয় গুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "বিক্রমপুরের হরিচন্দ্র রাজার সহিত কেহ কেহ রামাই পণ্ডিতের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের হরিচন্দ্র উপাখ্যান. পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। ইহাতে মহাভারতোক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র রোহিতাশ্বের (ধর্ম্মপুরাণে 'রুহিদাস' বা 'লুহিদাস' বা 'লুয়ে') নাম এই আখ্যানে বিজড়িত দেখা যায়। কেবল রাজমহিষী শৈব্যার স্থান অধিকার করিয়াছে রাণী মদনা। তাহা ছাড়া দাতা কর্ণের উপাখ্যানটীও এই সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ স্থানে ধর্ম্মঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই বিভিন্নতাটী প্রকৃত বিভিন্নতা নহে। কারণ, ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে ধর্ম্মঠাকুর মূলতঃ বিষ্ণু দেবতা এবং ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তগণের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। সে যাহাই হউক, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা কেবল মাত্র রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ। এক বাঁকুড়া জেলাতেই পাঁচ শতাধিক ধর্ম্মশিলার পূজা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে। অথচ ঢাকা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ধর্ম্মশিলা একটীও পাওয়া যায় না, ধর্ম্মমঙ্গলের কবিও কেহ ঐ সকল অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন

নাই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কবিগণের গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও ক্ষুদ্র রাজার যশোগান সম্ভবপর বলিয়া ধরা যায় না। সে বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণও আবিষ্কৃত হয় নাই!

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, যে ধর্ম্মপাল পালবংশের গৌরবস্বরূপ, যিনি উত্তর-ভারতের সামন্ত-রাজগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাইয়াছিলেন, যাঁহার দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার এবং কীর-বংশের রাজগণ দাসত্ব করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মপালের সময় এবং তৎপুত্র দেবপালের সময় রামাই পণ্ডিত কলিঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। লাউসেন দেবপালদেবের কামরূপবিজয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় দশম শতকই লাউসেনের অবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।" সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয়সংখ্যা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

এরূপ অবস্থায় রামাই পণ্ডিতকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই মতকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামাই পণ্ডিত খৃষ্টীয় একাদশ শতকের লোক। তিনি বলেন, "১ম ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর দেবপালের নাম দিগন্তবিশ্রুত, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদার তট পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত তাঁহার কনিষ্ঠ জয়পালের নামও কেবল পালরাজগণের শিলালিপি বা তাম্রশাসন বলিয়া নহে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে বিঘোষিত! এরূপ স্থলে ১ম ধর্ম্মপাল বা তৎপুত্র দেবপালের সময় শূন্যপুরাণ-রচয়িতা রামাইপণ্ডিত অথবা লাউসেনের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে পারি না। তাহা হইলে অবশ্যই দেবপাল বা জয়পালের নাম কোন না কোন ধর্ম্মমঙ্গলে লিপিবদ্ধ দেখিতাম। তিরুমলয়-লিপি হইতে জানা যায় যে—যে সময় (খৃষ্টীয় ১১ শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় উপলক্ষে পূর্ব্বভারতে আগমন করেন, তৎকালে দণ্ডভুক্তি বা গৌড়ে ধর্ম্মপাল, উত্তররাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র আধিপত্য করিতেছিলেন। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উক্ত নৃপতি-চতুষ্টয়ের মধ্যে মহীপালের নাম বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, আজও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর অঞ্চলে যোগীজাতির মধ্যে 'মহীপালের গান' প্রচলিত। পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বেও যে গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গভূমে মহীপাল, গোপীপাল ও যোগীপালের গীত সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তিত হইত, আমরা বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে তাহার প্রমাণ পাই।

রঙ্গপুর জেলায় ডিমলা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপুরনামক স্থানে এক ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। এখনও লোকে সেই ধর্ম্মপালের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে।"—শূন্যপুরাণ, মুখবন্ধ, পৃ. ১৮/০—১৮৴০।

"ডিমলা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্র-চোলের শিলালিপি-বর্ণিত ধর্ম্মপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে। সুতরাং উত্তররাঢ়ে যে সময়ে ১ম ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়, তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজা ২য় ধর্ম্মপাল, রামাইপণ্ডিত, মানিকচান্দ, গোবীচান্দ বা গোবিন্দচন্দ্র ও লাউসেনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল" —শূ. পু., পৃ. ২।৶০।

শূন্যপুরাণে পঞ্চান্নটি অধ্যায় আছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত সূচী দিতেছি;—

(১) সৃষ্টি-পত্তন (২) জল-পাবন (৩) টীকা-পাবন (৪) পুষ্প তোলন (৫) দ্বারমোচন (৬) ঘর দেখা (৭) দানপতির ঘর দেখা (৮) দ্বার মোচন (৯) চনা পাবন (১০) নিয়ম ভাঙ্গা (১১) বাটী জোগান (১২) হোম (১৩) টীকা-প্রতিষ্ঠা (১৪) মন্দির-নির্ম্মাণ (১৫) যম-পুরাণ (১৬) যমদূত-সংবাদ (১৭) যমরাজ-সংবাদ (১৮) বৈতরণী (১৯) ধর্ম্মস্থান (২০) রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা (২১) অধিবাস (২২) বেড়া মন্নুই (২৩) ধুনা জ্বালা (২৪) ঘোড়া সাজান (২৫) বারমাসি (২৬) সন্ধ্যাপাবন (২৭) মন্নুই (২৮) ঢেঁকী-মঙ্গলা (২৯) গাম্ভারী-মঙ্গলা (৩০) ঘাট-মুক্তা (৩১) ধর্ম্মস্থান (৩২) তীর্থ-আবাহন (৩৩) ধর্ম্মস্নান (৩৪) ধর্ম্ম-সাজন (৩৫) পুষ্পাঞ্জলি (৩৬) দেবস্থান (৩৭) মুক্তা-মঙ্গলা (৩৮) ধর্ম্মপূজা (৩৯) মুক্তিস্নান (৪০) চাস (৪১) নিয়ম-ভঙ্গ (৪২) চনা-পাবন (৪৩) টীকা-প্রতিষ্ঠা (৪৪) হোম যজ্ঞ (৪৫) ধর্ম্মের হাট (৪৬) বৈতরণী (৪৭) মুখশুদ্ধি কপূর পান (৪৮) দেবীর মনক্রি (৪৯) ধর্ম্মের উদয় (৫০) ধর্ম্মস্থান (৫১) যজ্ঞ (৫২) তাম্রধারণ (৫৩) ধর্ম্মরাজ প্রণাম (৫৪) ছাগজন্ম (৫৫) শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।

উল্লিখিত অধ্যায়বিভাগে লক্ষ্য করিবার আছে। ইহাতে একই নামের কতকগুলি অধ্যায় দুইবার করিয়া আছে। সম নামের অধ্যায়গুলির লিখনপ্রণালী ও ভাষার পরস্পর পার্থক্য থাকিলেও অনেক স্থলে ভাবের সাদৃশ্য দেখা যায়। এক অধ্যায় অন্য অধ্যায়ের অনুকরণমাত্র। এই কারণে আমরা মনে করি যে, শূন্যপুরাণ একখানি খণ্ডিত পুঁথি, ইহাতে নানা লোকের রচিত একই ভাবের কিন্তু বিভিন্ন ধাঁচের বহু খণ্ড কবিতা স্থান পাইয়াছে।

বিষয় অনুসারে শূন্যপুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত—(১) 'সৃষ্টি-পত্তন' (২) 'জলপাবন' হইতে 'অথ অধিবাস' পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং (৩) 'অথ বেড়ামন্নুই' হইতে পুস্তকের শেষ অর্থাৎ 'শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা' পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। কিন্তু কবিতাগুলি পর্য্যায়ক্রমে স্থানলাভ করে নাই।

এখন শূন্যপুরাণের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শূন্যপুরাণের সৃষ্টি-পত্তনে দেখা যায়, প্রথমে কোনো কিছুই ছিল না—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস।
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল॥
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥ (১-২ পৃ.)

কিন্তু মহাশূন্যমধ্যে একমাত্র প্রভুই ছিলেন—

দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥ (২ পৃ.)

পরে তিনি নিজেই নিজের কায়া সৃষ্টি করিলেন—

বিসার উপরে পরভুর উপজিল দআ।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ॥ (৭ পৃ.)

এই কায়া হইতেই নিরঞ্জন জন্মিলেন—

দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।
পরভু সঙ্গতি কেহ নহ এক জন॥ (৭ পৃ.)

নিরঞ্জনই নারায়ণ। তাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম হইতে আদ্যা-শক্তির উৎপত্তি—

পৃথিবী ভরমিআ হুহে পরিসরম হইঞা।
অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিঞা॥
তাহে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে।
ঘামেত জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে॥ (২৭ পৃ.)

পরে এই আদ্যা-শক্তির গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হইল—

বিস মধু খাইলে তুঙ্গি মরিবার তরে।
বম্ভা বিষ্টু মহেস্সর জনমিল উদরে॥ (৪১ পৃ.)

শিব ও আদ্যাশক্তি হইতে সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুমত ও মহাযান বৌদ্ধ মতের মোটের উপর মিল আছে। শূন্যপুরাণে রাজা হরিচন্দ্র এবং সহধর্ম্মিণী রাণী মদনার ধর্ম্মপূজার উল্লেখ আছে;—

হরিচন্দ্র রাজা   করে ধর্ম্মপূজা
ভরএ নবাহুতি ঘর।
নৌতন মণ্ডপে   ধর্ম্মর সমীপে
রাণী মাগে পুত্রবর॥ (৬১ পৃ.)

কেহ কেহ রাজা হরিচন্দ্রকে পৌরাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যক্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না। তাঁহার নামের সহিত অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া অথবা মহাভারতের রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাঁহাকে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন হয় না। শূন্যপুরাণ ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। কাজেই ইহার মধ্যে অনেক অলৌকিক কাহিনী থাকা খুবই স্বাভাবিক। মহাভারতের রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তৎপুত্র রোহিতাশ্বের সঙ্গে রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র লুহিদাস, রুহিদাস বা লুয়েকে জড়াইবার কোনো হেতু দেখা যায় না। যদি হরিচন্দ্র ও লুহিদাসের নাম মহাভারত হইতে গৃহীত হইত, তাহা হইলে রাণী মদনা নিশ্চয়ই মহাভারতের হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা নামে অভিহিত হইতেন। ধর্ম্মপুরাণে বর্ণিত

হরিচন্দ্র-কাহিনীর সঙ্গে দাতা কর্ণের উপাখ্যানের খুবই মিল আছে। কিন্তু এই উপাখ্যানের সহিত মহাভারতের হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের কোনো সম্বন্ধ নাই। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারানাথ (একাদশ শতাব্দী) হরিচন্দ্র নামে একজন বঙ্গেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। শূন্যপুরাণের হরিচন্দ্র এবং তারানাথের ইতিহাসে বর্ণিত হরিচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে আমরা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রকে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না।

শূন্যপুরাণে এবং ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যসমূহে পাঁচ জন ধর্ম্মপূজাপ্রচারকের নাম দেখা যায়। সত্য যুগে সেতাই, তাঁহার গতি বা অনুচর সংখ্যা ৪০০; ত্রেতা যুগে নীলাই তাঁহার গতি সংখ্যা ৮০০; দ্বাপরে কংসাই, তাঁহার গতি সংখ্যা ১২০০; কলি যুগে রামাই, তাঁহার গতি সংখ্যা ১৬০০; শূন্য যুগে গোসাঞী, তাঁহার গতি সংখ্যা অনেক। আমাদের মনে হয়, এই পাঁচ জন পণ্ডিত পঞ্চ বুদ্ধের অনুকরণমাত্র। শ্বেতবর্ণ শ্বেতাই (সেতাই), নীলবর্ণ নীলাই, কাংস্যবর্ণ কংসাই এবং রক্তবর্ণ রামাই। কলিযুগে চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভ গৌতম রামাই-রূপে অবতীর্ণ হইয়া 'সসাগরা পৃথিবী মধ্যে' এবং 'ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন' করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ যুগে পঞ্চম বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয় গোসাঁই-রূপে আভির্ভূত হইবেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে গোসাঁই পণ্ডিত ও রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাস একই ব্যক্তি*।

চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভ গৌতমের বর্ণ রক্ত বা তাম্র বর্ণ। বোধ হয়, এই জন্য ধর্ম্মপূজকেরা তাম্রবর্ণের দ্যোতক তাম্র সূত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। তাম্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে শূন্যপুরাণে আছে;—

আদ্য রজে তাম্র উপজিল।
রজ গুন মহি তিন গুন হইল॥ (২২৫ পৃ.)

আর একটি স্থানে তাম্রের বর্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে;—

রামাই নামে পণ্ডিত পবিত্র কায়।
রক্ত বন্নের তাম্র করেতে চড়ায়॥ (২২৭ পৃ.)

শূন্যপুরাণে 'বারমতি'র উল্লেখ আছে;—

ধর্ম্মপদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।
শ্রীজুত রামাই গাএ মধুর ভারতী।॥ (১৭ পৃ.)

ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতিকে বারমতি বলে। এই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে এই শব্দটি 'ব্রহ্মাত্ম' শব্দের অপভ্রংশ;

---

* প্রবাসী, ১৩৩৪, ভাদ্র, ৬৪৪ পৃ.।

কারণ, অনেক স্থলে 'বারমতি' স্থানে 'ব্রহ্মাত্ম' বা 'ব্রহ্মতি' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়*। কেহ কেহ বলেন, দেবী 'বীরমতী'র নাম হইতে 'বারমতি' আসিয়াছে†। উক্ত যুক্তিগুলি একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। বারমতি শব্দের প্রকৃত অর্থ বারোটি গান। ঋগ্বেদে সূক্ত, স্তোত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি অর্থেও মতি শব্দে বিস্তর প্রয়োগ পাওয়া যায় §। ধর্ম্মপূজায় বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই বারো দিন ধরিয়া উৎসব চলিতে থাকে। প্রত্যেক দিনে ধর্ম্মপূজাবিষয়ক এক এক পালা গান করা হয় বলিয়া এই উৎসবের নাম হইয়াছে বারমতি এবং যে পুস্তকে এই বারোটি গানের পালা থাকে তাহাকে বারমতি বা বারমতী পুরাণ বলা হয়। ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল আমাদের এই মত সমর্থন করিবে ;—

প্রথম মতীতে আছে সৃষ্টি প্রকরণ।
রঞ্জার উৎপত্তি ইছায়ের বিবরণ॥
দ্বিতীয় মতীতে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
শালে ভর দিয়া রঞ্জা পুত্রবর পান॥
তৃতীয়েতে শিশু চুরি মন্ত্রিমন্ত্রণায়।
মল্লশিক্ষা দুর্গার ছলনা আখড়ায়॥
চতুর্থেতে মল্লবধ ফলক গঠন।
কুম্ভীরাদি বাঘজন্ম বাঘের নিধন॥
পঞ্চমে বারুই রঙ্গ সুরিক্ষা দলন।
ষষ্ঠমেতে হস্তী বধ দেশে আগমন॥
সপ্তমে কাউরে কলিঙ্গা পরিণয়।
অষ্টমে সম্বন্ধ আর লোহগণ্ডা ক্ষয়॥
নবমেতে মায়ামুক্ত ইছাই নিধন।
দশম মতীতে অতিবৃষ্টি নিবারণ।
একাদশে ধর্ম্মসেবা ময়না নিধন।
দ্বাদশে পশ্চিম উদয় স্বর্গ আরোহণ॥

বারমতি শব্দের সংক্ষেপে ব্রহ্মতি বা ব্রহ্মাত্ম হইয়াছে। যথা—বারমতি >বার্মতি, বার্ম্মতি > ব্রহ্মতি, ব্রহ্মাত্ম।

শূন্যপুরাণে পুরাতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার নিদর্শন দেখা যায়। যেমন—ওঁকার জয়ঙ্কার জয়দেব ধম্ম করতার নির থাএ নিরমান থাএ জোগাএ সিদ্ধেশ্বরী অমৃতমুখে

* Proceedings of the Asiatic society of Bengal, 1894, p. 137.

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ সাল, ১৭১-১৭২ পৃ.।

§ ১.৬,৬ ; ১.৫৭,১ ; ১.১১৪,১ ; ১.১৩৬,১ ; ১.১৪০,১ ; ৭.৪,১ ; ৭.৮৮,১।

বৈস বিদি বিদি কাল কেমন ঘরে রামন্তি রাম রামেশ্বর। মচ্ছ কুম্ভীর সতেক হাত অগ্নি সতেক হাত জল এতটা জলে স্নান করেন নিরেপ নৈরাকার। (১৪৭পৃ.)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামাই পণ্ডিত শূন্য নিরঞ্জন ধর্ম্মের কথা লোকমুখে শুনিয়া অপভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। পরে শিষ্যসম্প্রদায়ের মুখে মুখে ও লিপিকরদের হাতে হাতে ভাষা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। অনেক স্থলে আবার পরবর্ত্তী কালে নোতুন নোতুন বিষয় সংযোজিত এবং কোনো কোনো স্থানে অনেক বিষয় পুনরুক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে শূন্যপুরাণের ভাষায় বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত বা আংশিকরূপে সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অধ্যায়ে বহু ফার্শী শব্দ আছে।

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পুরবাদি   সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জ্জন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ   জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন॥ ১॥
মালদহে লাগে কর   দিলঅ কর যুন
দখিন্যা মাগিত্তে জাঅ   জার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিআ পুড়াএ ভুবন॥ ২॥
মালদহে লাগে কর   না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড়   দস বিস হয়্যা জড়
সদ্ধম্মিরে করএ বিনাস॥ ৩॥
বেদ করে উচ্চারন   বেরয়াঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মম্ম   সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥ ৪॥
এইরূপে দ্বিজগন   করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধম্ম   মনে ত পাইআ মম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার॥ ৫॥

ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ ৬॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলে ত দম্বদার।
জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হইআ গাজী কাত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥ ৮ ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥ ৯ ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহঁ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।
জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ ১০ ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ ১১ ॥

শূন্যপুরাণের অন্যান্য স্থলেও অনেক আরবী ও ফার্শী শব্দ পাওয়া যায়। যথা— আলাম, আলম্ব, দোকান, তরাজু, সুতরাস, মাল, গোজাল, বাজার, সয়াল পয়দল, সাদা প্রভৃতি। স্থানে স্থানে করিলেন, কহেন প্রভৃতি আধুনিক পদের প্রাচীন রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন— করিলেন্ত, কহেন্ত, রহিলেন্ত। দুই একটি নাম ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা— দাইআ (দা দিয়া কাটিয়া), কুদালেন (কোদাল দিয়া কাটিলেন)। সময় সময় পঞ্চমী বিভক্তি 'ত' বা 'থাকে' এবং ষষ্ঠী বিভক্তি 'ক' দিয়া হইয়াছে। যেমন— দেহেত (দেহ হইতে), কুথা থাকে (কোথা হইতে), তামাক (তামার)। 'আমি' স্থলে 'হাম' এবং 'তুমি' বা 'তুই' স্থলে 'তুআ' শব্দের ব্যবহার আছে। অনেক শব্দ আধুনিক কালে ব্যবহৃত হইয়া থকে। যথা— আমার, আপনার, আঁখি, করেন, ফিরিয়া, হইল, দেও, দিল, রহিল, কাটে, উড়িতে, বেচা, কেনা, চাঁছে, কভু, তবে প্রভৃতি।

ময়নামতীর গান

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয় উভয়ে মিলিয়া এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা কবি ভবানীদাস বিরচিত।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ার্সন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করেন। তিনি এই গাথাটি রংপুর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তা ছাড়া বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন কবি বিরচিত ময়নামতীর গানের অনেক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই সকল পুথি একই পালার বিভিন্ন পাঠ বা সংস্করণ।

তিলকচন্দ্র মেহারকুল বা পাটিকারার রাজা। তাঁহার একটিমাত্র কন্যা ছিল। তাঁহার নাম শিশুমতি। শিশুমতি অতি অল্প বয়সেই গোরক্ষনাথের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা করেন। গুরু তাঁহার নাম রাখিলেন ময়নামতী :—

বাপ মাহে নাম থুইল
শিশুমতী আই।
গোর্খনাথে থুইল নাম
সোন্দর মৈনাই ॥— ভবানীদাস, ১৩ পৃ.।

গৌড় দেশের রাজা মাণিকচন্দ্র গৌড় হইতে আসিয়া ময়নামতীকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুর বাড়ীতে ঘরজামাইর মত বাস করিতে থাকেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই ঘরজামাইর অদৃষ্টের ফল মাণিকচন্দ্রের উপর ফলিল। শ্বশুর বাড়ীতে কেহ আর তেমন আদর যত্ন করে না। সব সময়েই স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলিতে হইত। এই সকল কারণে মাণিকচন্দ্রের পক্ষে শ্বশুরালয়ে বাস করা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। "শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী" তাঁহার কাছে যমপুরীতে পরিণত হইল। তিনি মনের দুঃখে দেবীপুরের পাঁচ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু দেবীপুরের পাঁচ কন্যার সঙ্গে ময়নামতীর বনিবনাও হইল না। কাজেই বাধ্য হইয়া ছয় মাসের গর্ভবতী ময়নামতীকে রাখিয়া মাণিকচন্দ্র স্বদেশে চলিয়া গেলেন। ইহার অল্প কাল পরেই মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হন; কিন্তু মাতা ময়নামতী রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ময়নামতী সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। গোবিন্দচন্দ্র পরে আরো দুই বিবাহ

করেন। তন্মধ্যে একজন দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোলের কন্যা। আঠারো বৎসর বয়সে মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও দৃঢ়তায় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোবিন্দচন্দ্র বারো বৎসরের জন্য সিদ্ধ হাড়িফার নিকট দীক্ষা নিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এই সময় তাঁহাকে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। বারো বৎসর পর গোবিন্দচন্দ্র স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস এক সময়ে ভারতের সকল নরনারীর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। এই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী গাথা মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গীত হইত।

মাতা ময়নামতী পুত্রকে যোগ সাধনের জন্য বলিতেছেন—

শুন পুত্র গুবিচন্দ্র যোগে কর মন।
ধর্ম্ম রাজ গুবিচন্দ্র শুনহ বচন॥
*　　*　　*
বরাহ্মণ জ্ঞান সাদ যুগী হইবার॥
বরাহ্মণ জ্ঞান সাদিলে নাহিক মরণ।
*　　*　　* ॥-ভবানীদাস, ১পৃ.।

তার পর মাতা পুত্রকে যৌবন ক্ষণস্থায়ী বলিয়া উপদেশ দিতেছেন ;—

কচু পাতার জল যেন করে টলমল।
তেন মত যাবে তোহ্মার যৌবন সকল॥
নল খাগ কাটীলে যে হেন পড়ে পানী।
তেন মত হইব তোহ্মার জোওানি॥ ভবানীদাস, ২পৃ.।

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের যোগী হইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি মাতাকে বলিলেন—

আমি রাজা যোগী হৈব তার অধিক নাই।
এসুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার টাই॥
কার কাছে এড়ি যাউব হংসরাজ ঘোড়া।
কার টাক্রি এড়ি যাইমু গাএর খাসা জোড়া॥
ধমু বান কথাতে এড়িমু কাকে কাকে।
তির তাম্বু বান কাতে এড়িমু ঝাকে ঝাকে॥
গাঙ্গেত এড়িয়া যাইমু বত্তিস কাহন নাও।
পুরী মধ্যে এড়ি যাইমু তুমি হেন মাও॥
পিলঘরে এড়ি যাইমু আশী হাজার হাতী।
বৈদেশে গমন কালে কে ধরিবে ছাতি॥

পাইঘরে এড়ি যাইমু নএলাক ঘোড়া।
যোর মন্দিরে এড়ি যাইমু সাহে মানিক দোলা॥
পুরী মাঝে এড়ি যাইমু পঞ্চ পাত্র বর।
পান যোগানী এড়ি যাবে উন শত নফর॥
শেত বান্দা এড়ি যামু হারিয়া ছোঁহর।
অহুনা পহুনা এড়ি যাইমু কার ঘর॥
দোফারে এড়িয়া যাবে সত্তর কায়ন বেত।
গোঞালে এড়িয়া যাবে গাঁই বারশত॥
এহি সব এড়ি যাবে আপনে জানিয়া।
নএয়ান গড় এড়ি যাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৈরর সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কামলাক নগর॥
তুহ্মি মাএর যত বাড়ী কনিকা নগড়।
আহ্মি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আহ্মার গোচর।
আহ্মা হৈতে কোন জন আছয়ে ডাঙ্গর॥

—ভবানীদাস, ৫-৬ পৃ.।

অন্যত্র মাতা পুত্রকে সংসার অসার বলিয়া নানাপ্রকার তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ দিতেছেন ;—

মৈনামতী বোলে বাছা কিছু নহে সার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সংসার আন্ধার॥
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেহ নহে কার।
পুত্র কৈন্যা সঙ্গে রাজা না যাইব তোহ্মার॥
কাএয়া মাঞা সব ছারি বলে ধরি নিব।
এমন সোন্দর তনু কাকেত মিশাইব॥
ধন জন দেখিআ আপনা বোল তারে।
এ তনু আপনা নহে লৈয়া ফির যারে॥
কোন কর্ম্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত।
কি বুলি জোয়াব দিবা স্বামীর সাক্ষাৎ।
আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শৈন্য।
সঙ্গে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুণ্য॥

—ভবানীদাস, ৬ পৃ.।

মাণিকচন্দ্র রাজা গর্ভবতী স্ত্রী ময়নামতীকে পরিত্যাগ করিবার কারণ কি? রাজা কি ময়নামতীর চরিত্রে কোনো প্রকার সন্দেহ করিয়াছিলেন? রাণীর চরিত্রে কিন্তু আমাদের একটু সন্দেহ হয়। গোপীচন্দ্রের গানে লেখা আছে ;—

তিলেকচন্দ্র নামে রাজার কন্যা ময়নামন্ত্রি রাই।
এক রাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে।
এক পুত্র হইল মনির গোরখের বরে॥—৩৯৮ পৃ.।

গুরুভাই হাড়িফার সঙ্গে ময়নামতীর ভাব ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছিল। উভয়ে একত্রে বাস করিতেন। এমন কি পুত্রও মাতার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন। গোপীচন্দ্র মাকে বলিতেছেন;—

হাড়ির খাইছ গুআ মা হাড়ির খাইছ পান।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান॥
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে জননি একত্র করিয়া।
আমার পিতাক মারিছেন মা জহর বিস খোআইয়া।
কোনরূপে রাজার ছাইলাক সন্যাস পাঠাইয়া।
খাস কালে হবে ঘর ঐটা হাড়িক দিয়া॥

—গোপীচন্দ্রের গান, ৬৩ পৃ.।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু ও গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের মূলে একটা ষড়যন্ত্র ছিল।

গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, হাড়িফা রাণী ময়নামতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন এবং পরে গোবিন্দচন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া হাড়িফাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। নাথপন্থী লেখকগণ কুলটা ময়নামতী এবং দুশ্চরিত্র হাড়িফার নামের সঙ্গে নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির আরোপ করিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। তিব্বতী গ্রন্থ অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের পিতার নাম বিমলচন্দ্র, পিতামহের নাম বালচন্দ্র এবং প্রপিতামহের নাম সিংহচন্দ্র ছিল। উড়িষ্যার সংগৃহীত গাথার মতে গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম রূপচন্দ্র, পিতামহের নাম বিষ্ণুচন্দ্র এবং প্রপিতামহের নাম মেহচন্দ্র। মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত গাথা অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র। বাঙ্গালা দেশে যে সকল গাথা পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র ছিল। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে মাণিকচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥

বিক্রমপুরের রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই, তাঁহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র ছিল। দুর্লভ মল্লিক প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের গানের ধাড়িচন্দ্র এবং উক্ত ত্রৈলোক্যচন্দ্র উভয়ে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। 'ধাড়ি' শব্দের অর্থ 'বড়'। চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণের মধ্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাকে 'ধাড়িচন্দ্র' বলা হইত। কাজেই শ্রীচন্দ্র মাণিকচন্দ্রের সহোদর ভাই বলিয়া অনুমান করি। ময়নামতীর গান আমাদের এই মত সমর্থন করিবে। তাহাতে লেখা আছে, গোবিন্দচন্দ্রের খুড়া ও জ্যেঠা ছিলেন ;—

ইষ্ট মিত্র নিছে কত লেখা জোখা নাই।
খুড়া জেঠা নিছে কত না সহোদর ভাই॥

সম্ভবত বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্রই গোবিন্দচন্দ্রের পিতৃব্য ছিলেন। অতএব বিক্রপুরের চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণের বংশতালিকা এইরূপ,—
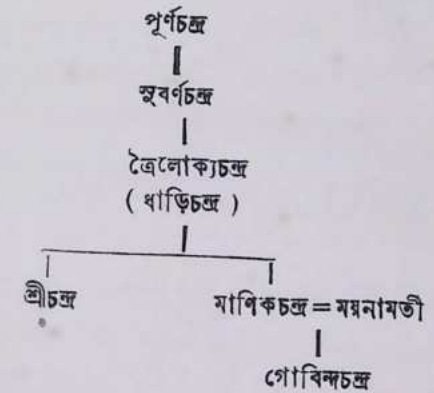
অনুমান হয়, এই চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণ কাম্বোজ জাতি ছিলেন। কাম্বোজ জাতি কোন্ দেশের অধিবাসী? পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে কাম্বোজ জাতি হিমালয়পর্ব্বতবাসী; বর্ত্তমানে উত্তরবঙ্গের কোচ, মেচ ও পলিয়া সেই কাম্বোজজাতীয়। কাম্বোজগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে গৌড় বা উত্তর-বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া রাঢ় দেশে আশ্রয় নিলেন। কাজেই পিতার মৃত্যুর পর মহীপাল রাঢ় ও বঙ্গদেশের কতক অংশের রাজা হইয়াছিলেন। কালক্রমে ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিলেন। এইরূপে তিনি গৌড় ও বঙ্গের একচ্ছত্র রাজা হইয়া পড়েন। ত্রৈলোকাচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিয়া গৌড়ে চলিয়া গেলে চন্দ্রবংশের প্রভাব পূর্ব্ববঙ্গে অনেকটা কমিয়া যায় এবং এই সুযোগে সাভারে হরিশ্চন্দ্র ও মেহারকুলে তিলকচন্দ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রকৃতপক্ষে

স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহা জানিতে পারিয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্র তদীয় পুত্র শ্রীচন্দ্রকে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিবার জন্য বিক্রমপুরের রাজা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য-চন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র মাণিকচন্দ্র গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র যে গৌড়াধিপতি ছিলেন তাহার প্রমাণ ময়নামতীর গানে আছে—

বৃদ্ধ রাজা যমে নিছে গৌড়ের গোসাই।
কি বুঝিছ গোপীচন্দ্র তোর নাই ঠাই॥

তিব্বতী গ্রন্থে দেখিতে পাই, গোবিন্দচন্দ্রের পিতা তীরভুক্তি, বঙ্গ ও কামরূপের রাজা ছিলেন।

মহীপাল রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের রাজা হইয়া 'অনধিকৃতবিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বোধ হয়, গৌড়াধিপতি মাণিকচন্দ্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া মহীপালদেবের অধীনে গৌড়রাজ্য শাসন করেন। এজন্যই গোবিন্দচন্দ্র বলিয়াছেন—

বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।
—ময়নামতীর গান।

ইহার পর মহীপালদেব পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গ, গৌড়, মগধ এবং তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্য্যন্ত মহীপালের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের শ্রীচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও তিলকচন্দ্র মহীপালের অধীন রাজা হইলেন। এজন্যই শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণের রাজ-মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, মহীপালদেব স্বীয় রাজধানী রাঢ়দেশ হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন নাই। তাই রাজেন্দ্রচোল ১০২৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর-রাঢ়ে মহীপালদেবকে দেখিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাণিকচন্দ্র তিলকচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিলকচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। এজন্য মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মাতামহ তিলকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য বিক্রমপুর-রাজ শ্রীচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। আবার তাঁহার শ্বশুর সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোনো পুত্র না থাকায় গোবিন্দচন্দ্র শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এইরূপে গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের একচ্ছত্র স্বাধীন রাজা হইলেন। দিগ্বিজয়ী বীর রাজেন্দ্র চোলের ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর যাদববংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামে কোনো সেনাপতি পশ্চিম ভারত হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া একটি নোতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, গোবিন্দচন্দ্র বজ্রবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে গোবিন্দচন্দ্রের বংশ লোপ হইয়াছিল

এবং বজ্রবর্ম্ম-বংশীয়গণ পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্র উপাধিধারী কাম্বোজজাতীয় রাজবংশের যবনিকাপতন হইল। তাই ভবানীদাস বলিয়াছেন—

"গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া।"

গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ে ছিল। ময়নামতী লালমাই পর্ব্বতের একটি অংশ, কুমিল্লা হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মুকুল বা মেহরকুল, পাটিকানগর বর্ত্তমান পাটিকারা, অহনামুড়া, পত্নামুড়া প্রভৃতি স্থান ত্রিপুরা জেলায় আছে। কুমিল্লার উপর দিয়া এখনো গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলের লোকেরা এখনো গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর সুড়ঙ্গ এবং হাড়িফার বাড়ী দেখাইয়া থাকে। তিব্বতী পুস্তকের মতে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী চট্টগ্রামে ছিল। আমাদের মনে হয়, তখন এই সকল স্থান চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গোরক্ষনাথ মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক লোক। মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের আবির্ভাব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধরিয়া লইলে গোরক্ষনাথের কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিব্বতী পুস্তক অনুসারেও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমিত হয়।

ময়নামতীর গানে আছে—

আন্ত মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগড়।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহর॥
আর আছে আইধ্য মাটী তরপের দেশ
চাটীগ্রাম পূর্ব্বমাটী জানিবা বিশেষ॥—১২ পৃ

ইহা হইতে অনুমান হয়, গোরক্ষনাথের মূল বাড়ী চট্টগ্রামে ছিল, সেখানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন; 'চাটীগ্রাম পূর্ব্বমাটী' দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। সেখান হইতে তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল পরগণায় কিছু কাল বাস করিয়া শ্রীহট্ট জেলার তরপ পরগণায় যাইয়া বাস করেন। তার পর গোরক্ষনাথ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। সেখানে তিনি মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। এজন্য গোরক্ষনাথ শিষ্যা ময়নামতীকে নিয়া রথে বিক্রমপুরে গিয়াছিলেন;—

তবে হস্তধরি গোর্খ রথে তুলি নিল।
রথখানা কুদাইয়া বিক্রমপুর নিল॥
—ময়নামতীর গান, ১৩ পৃ.।

তিব্বতী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Pag Sam Jon Zang-এ লেখা আছে, গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হইয়াছিলেন এবং পরে যোগিসম্প্রদায় গঠন করিয়া নাথধর্ম্ম প্রচার করেন। গোরক্ষনাথ নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রচলিত মত অনুসারে গোরক্ষনাথ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথের শিষ্য ছিলেন। উক্ত গুরুর কাছে তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই নোতুন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। ক্রমে বাঙ্গালা দেশের অনেকেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মেহার-কুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা তাঁহার শিষ্যা এবং হাড়িফা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের যোগী বা নাথগণ গোরক্ষ নাথের সম্প্রদায়ভুক্ত। গোরক্ষনাথ চৌরাশী সিদ্ধাচার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। কালক্রমে তাঁহার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তিনি নাথধর্ম্মের প্রধান উপাস্য দেবতা শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। শিব কৈলাসবাসী, কাজেই তিনিও কৈলাসবাসী হইলেন। গোপীচন্দ্রের গানের অনেক স্থলে এবিষয়ের উল্লেখ আছে। যেমন—

কৈল্লাস হোত্তে শিব গোরেকনাথ মঞ্চকে নামিল।
আস্তার মধ্যে ধরিয়া মএনাক বুঝাতে নাগিল।—৩৯ পৃ.।
নারদক নাগিয়া শিব গোরেকনাথ হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাকমধ্যে নারদমুনি আসিয়া হাজির হৈল ॥—৪০ পৃ.।
গুরু গুরু বলিয়া মএনা বুড়ি কান্দিতে নাগিল।
কৈল্লাসেতে ছিল শিব গোরকনাথ আসন নড়িল ॥—৬৪ পৃ.।
কৈলাসক নাগি শিব গোরকনাথ গমন করিল ॥
রভিশাপ দিয়া শিব গোরকনাথ কৈলাসে চলিয়া জান ॥—৬৭ পৃ.।

নাথগণ বাঙ্গালা দেশে, এমন কি, বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়া নাথধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এইরূপে নাথধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজ-পুতনা, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে এখনো এই ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার উৎপত্তিস্থান বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে ইহার প্রভাব বেশি নাই। নাথ-পন্থী এখন আর বাঙ্গালা দেশে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালার নাথগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খাঁটি হিন্দু হইতেছেন।

হাড়িফার বাসস্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি চট্টগ্রাম বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। নামের শেষে "ফা" উপাধিই আমাদের এই সন্দেহের কারণ। পূর্ব্বে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বহু স্বাধীন রাজা সম্মানসূচক "ফা" উপাধিতে বিভূষিত হইতেন। এই "ফা" তিব্বতী "ফ" (উচ্চারণ 'ফা'=পিতা, বাবা) শব্দ হইতে আসিয়াছে। কাজেই 'হাড়িফা' মানে 'হাড়িবাবা'; তুলনীয় মাধুবাবা, নাগাবাবা ইত্যাদি।

ময়নামতীর গান হইতে বাঙ্গালা দেশের তৎকালীন সামাজিক আচার ব্যবহার, পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্বন্ধে নানা বিষয় জানা যায়। ময়নামতীর গানে বিধবা বিবাহের উল্লেখ আছে। তখন সমাজে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল, তবে অনেক স্থলে আচার-ভ্রষ্টতা ও যথেচ্ছাচারিতা দেখা দিয়াছিল। সে সময়ে স্ত্রীলোকেরা মেঘনাল শাড়ী, খিরাবলী শাড়ী, তসরের কাপড়, হাতে শাঁখা ও সোনার তার, গলায় সোনার হার এবং কপালে সিন্দূর পরিত।

ময়নামতীর গানে বা গোপীচন্দ্রের গানে বিশেষ পাণ্ডিত্য না থাকিলেও মাঝে মাঝে কবিত্ব বেশ সুন্দর। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের জন্য রাণীদের বিলাপ অত্যন্ত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী;—

যে দেশে যাইবা প্রিয়া সে দেশে যাইব।
ধরিয়া যুগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব ॥
তুমি সে যুগিয়া রাজা আস্কিত যুগিণী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনি ॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্দি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোক্ষা শোন প্রাণ নাথ ॥
—ময়নামতীর গান, ৮ পৃ.।

অন্যত্র,

তোমা সঙ্গে প্রীতি করি অনলে দহিয়া মরি
পাঞ্জর দহিল কাল ঘুণে।
যদি মণি মুক্তা হৈত হার গাথি গলে দিত
পুষ্প নহে কেশেতে রাখিতুম ॥
আসিব আসিব করি আমি রৈলাম পন্থ হেরি
নএয়ান হইয়া গেল ঘোর।
এবার বছরের আমি আটার বছরের তুমি
বিধি বর মিলাইল ভালা ॥
যে দিন আছিল শিশু না জানিলাম দুঃখ কিছু
এবে যৌবন হইল পুরণ।
যৌবন হইল কাল মরিলে সে হএ ভাল
এরূপ যৌবন বৃথায় গেল ॥
এরূপ যৌবন ধন হারাইলাম অকারণ
বৃথায় বৃথায় দিন গেল গঞিয়া।
যৌবন হইল বৈরী সরম রাখিতে নারি
না ভজিল প্রিয়া গুণ নিধি ॥
তোমার মুখের বাক্য শুনি বিদরে আমার প্রাণী
তাপ দুঃখ সব গেল দূরে।
আজুকা তোমার সঙ্গে কৌতুক করিব রঙ্গে
পালঙ্গেতে করিব শএয়ন ॥
—ময়নামতীর গান, ২০ পৃ.।

রাণীদের অঙ্গ যৌবনে ঢলঢল। তাঁহারা "হালিয়া ডুলিয়া পরে যৌবনের ভরে"। বুক ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের মুখও ফুটিল, আর তর সহিল না। তাঁহারা রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বলিলেন—

রঙ্গমালা পুষ্প ফলে ভাঙ্গি পরে ডাল।
নারী হইয়া যৌবন রাখিব কত কাল॥
কতকাল রাখিবে যৌবন অঞ্চলে বান্দিয়া।
বাহের হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া॥
নেতে বান্দিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কার নয়॥
জোঁ্যামি দিছে কাপড় নারীর পালন।
কাপড় দেখিয়া সবে না জুড়ায় জীবন॥
একেত সুতার কাপড় না শুনয়ে বোল।
তা দেখিয়া চারি নারীর না জুড়ায় কোল॥
নেতে বান্দিলে যৌবন চটকিয়া উঠে।
শ্যামীকে পাইলে যৌবন কবু নাহি টুটে॥
ধান্য চাউল বসন নহে গোলা বান্দি থুমু।
রাজাএ রাজাএ যুদ্ধ নহে মাল যোগাইমু।
দাবী দারের দাবী নহে খোশাইয়া দিমু।
বাদশাই যাচক নহে মোহর মারিমু॥
মালী ঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাথিমু।
তেলি ঘরের তৈল নহে বাজারে বেচিমু॥
আবের কাঞ্চলি নহে দুই তন ঢাকিমু।
সুতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু॥
ধর্ম্ম বটী যৌবন মুহি কিরূপে রাখিমু।
যৌবনের ভার মুই কিরূপে সহিমু॥

ময়নামতীর গান, ১০ পৃ.।

ময়নামতীর গানগুলি যে যে ছন্দে বা রাগ রাগিণীতে গাওয়া হইত তাহাও প্রায়ই উল্লেখ করা আছে। এই এই ছন্দ বা রাগ রাগিণীগুলির নাম পাওয়া যায়—পয়ার ছন্দ, সিন্দুরা পয়ার, লগিয়ত রাগ, ত্রিপদী বা লাচাড়ী দীর্ঘ ছন্দ, বসন্ত রাগ, খর্ব্ব (খর্প) ছন্দ, ঝিঝির রাগ, ভাটিয়াল রাগ।

গোরক্ষ-বিজয় ও মীন-চেতন।

গোরক্ষ-বিজয় পুস্তকখানি মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আর মীন-চেতন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ (বর্ত্তমানে পি-এইচ্-ডি) মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। গোরক্ষ-বিজয় শেখ ফয়জুল্লা এবং মীন-চেতন শ্যামদাস সেন বিরচিত। উক্ত পুস্তক দুইখানি একই মূল পুস্তকের বিভিন্ন পাঠ বলিয়া অনুমান হয়। উভয় পুঁথির ভাব ও ভাষায়, এমন কি, অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে ও অক্ষরে অক্ষরে আশ্চর্য্য মিল আছে। যেমন—

গোরক্ষ-বিজয়	মীন-চেতন
(১) তবে যদি পৃথিবীতে য়াইল হরগৌরী॥ মীননাথ হাড়িফাএ করন্ত চাকরি॥ —পৃ.১০.৭।	তবে যদি হর গৌরী পৃথিবীতে যাইল। মীন নাথে… … … … …॥ —পৃ.১.২৩।
(২) চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিলা বচন। কিছু না শুনিলু আমি নিদ্রার কারণ॥ দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে। কহিতে বচন মুই হুঙ্কারিল কোনে॥ —পৃ.১৩.৯।	চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিল বচন। … … … …হর নিদ্রার কারণ॥ দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে। কহিতে হইবে কথা হুঙ্কারিল কোন জনে॥ —পৃ২,২২১।
(৩). পূর্ব্বেতে হাড়িফা গেল জথাতে কাহ্লাই। পশ্চিমে গেলেন গোর্খ উত্তরে মিনাই॥ পৃথিবী ভ্রমএ তারা জোগপথ ধ্যায়াই। কৈলাসেতে হর গৌরী য়াছে সেই ঠাই॥ —পৃ.১৫.১।	পূর্ব্বদিকে হাড়িকা গেল দক্ষিণে মীনাই। পশ্চিমে গোর্খনাথ উত্তরে কানাই॥ পৃথিবী ভ্রমএ সবে যোগ পথ ধ্যাই। কৈলাসেতে হর গৌরী আছে এক ঠাই॥ —পৃ.৩.১১।
(৪) ভুবনমোহন বেশ শঙ্করের নারী। কটাক্ষে চাহিতে প্রাণ নিতে পারে হরি॥ শিবের ঘরিণী দেবী বড়ই চতুর। স্ববর্ণের কোটেরা রাখিছে জলপূর॥ —পৃ.১৮.৩।	ভুবন মোহিনী দেবী সঙ্করের নারী। কটাক্ষে যে সিদ্ধাগণের প্রাণ নিল হরি॥ শিবের ঘরিণী দেবী বড়ই চতুর। সোবর্ণ কোটরা করি জল দিল ভর॥ পৃ.৩.২৭।

গোরক্ষ বিজয়	মীন-চেতন
(৫) মীননাথ আইল জবে দেখিয়া কদলি সবে	মিন নাথ যাইল যবে কদলি দেখিল তবে
তানে চাহে রাখিতে ভোলাই।	চাহে সবে রাখিতে ভুলাইয়া।
জ্ঞানে ধ্যানে দেখি স্থির সোন্দর জে শরীর	• •দেখি এই আমি সবে তারে পাই
আহ্মি সবে যদি তারে পাই ॥	আনন্দে রাখিব ভোলাইয়া ॥
মঙ্গলা কমলা দুই জতেক কদলি লই	মোঙ্গলা কমলা দুই যোলশত নারীলই
নানা রসে ছিঙ্গার করিব।	নিমেষেক করি সমুদীত।
মীননাথ ভোলাইতে সব য়াইল একচিত্তে	মিননাথ ভোলাইতে সব আইল একচিত্তে
চারি ভিতে বেড়িয়া রহিল ॥	বেরিয়া রহিল চারিভিতে ॥
—পৃ.২৪.৮।	—পৃ, ৫.১৫।
(৬) বিধবা জে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর।	বিধবা রমণী সে যে পুত্র রাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চএ তার ঘর ॥	দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর ॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল।	তার পুত্র গুপিচান্দে বান্ধিয়া রাখিল।
মাটির করিয়া ঘর তাহাদের থুইল।	মাটির করিয়া গড় তাহাকে থুইল ॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর ॥	হস্তি সব বান্দি থাকে তাহার উপর।
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর ॥	রাত্রি দিন বঞ্চে সিদ্ধা তাহার ভিতর ॥
—পৃ.৪৪.১।	—পৃ.৯.২৯।

এইরূপে আরো অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু পাঠকগণের ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে জানিয়া এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয় পুঁথির মূল একই। অনুমান হয়, মূল পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "মীননাথ-চৈতন্য গোরক্ষ-বিজয়" ছিল। কারণ, গোরক্ষ-বিজয়ের একখানি প্রতিলিপিতে "মীননাথ-চৈতন্য গোরক্ষ-বিজয়" লেখা আছে। পরে উক্ত নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া কোনো কোনো পুঁথিতে 'মীন-চেতন', কোনো কোনো পুঁথিতে বা 'গোরক্ষ-বিজয়' হইয়া গিয়াছে।

এক দিন হরগৌরী ক্ষীরাম্বু সাগরের মধ্যে টঙ্গির উপরে বসিয়া পরম তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় মীননাথ মীন-রূপ ধারণ করিয়া টঙ্গির নীচ হইতে তাঁহাদের সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া হুঙ্কার শব্দে গৌরীর ভয় জন্মাইয়াছিলেন। তখন তাহাকে—

হর বোলে হইবেক নারীর অধিন ॥
ক্রোধ হইয়া মহাদেব বলিল বচন।
যে শুনিলে এইখানে হৈবা বিস্মরণ ॥—মীনচেতন, ২-৩ পৃ.।

তার পর মহাদেব গৌরীর সিদ্ধাগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরী পরিবেষণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার রূপ দেখিয়া মীননাথের অন্তরে কামভাব জাগারত হইল। দেবী ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন—

কদলি সহরে মীন চলহ সত্বর ॥
শোল শত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি।
কদলীর রাজ্যে তুমি ঝাট যাও চলি ॥—মীনচেতন, ৩ পৃ.।

অগত্যা মীননাথকে কদলি শহরে যাইতে হইল। সেখানে যাইয়া তিনি কদলি রাজ্যের রাজা হইলেন এবং ষোল শত নারীর প্রেমে পড়িয়া সমস্ত তত্ত্বকথা ভুলিয়া গেলেন।

হাড়িফাও মনে মনে চিন্তা করিলেন—

এমন সোন্দরি তবে আহ্মি যদি পাই ॥
হাড়ি কর্ম্ম করি যদি থাকি তার পাশ।
পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস ॥
—গোরক্ষবিজয়, ১৯-২০ পৃ.।

দেবী তাহাকে এইরূপে শাপ দিলেন—

হাড়িরূপ ধরি জাও ময়নামতি ঘর ॥
হাতে ঝাড়ু লও তুহ্মি কাঁধেত কোদাল।

কাজেই হাড়িফা মেহারকুলে ময়নামতীর ঘরে যাইয়া হাড়ির কাজ করিতে লাগিলেন। এদিকে কালুফা তদীয় গুরু হাড়িফাকে খুঁজিতে আকাশ পথে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার সহিত গোরক্ষনাথের দেখা হইল। গোরক্ষনাথ কালুফা'র নিকট জানিতে পারিলেন, তাঁহার গুরু মীননাথ কদলী পাটনে যাইয়া নারী লইয়া কেলি করিতেছেন। গুরুর এই দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্ধার করিতে কদলী রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি কদলীনগরে পৌছিয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিলেন। কালুফাও গোরক্ষনাথের নিকট গুরু হাড়িফার কথা শুনিয়া মেহারকুলে উপস্থিত হইলেন।

নাথ-সাহিত্যে কদলী রাজ্যের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত অভিধানে 'সুন্দরী স্ত্রীলোক' অর্থে 'কদলীক্ষতা'-র প্রয়োগ আছে। অনুমান হয়, পরে 'কদলীক্ষতা' সংক্ষিপ্ত হইয়া 'কদলী'-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের গানে এবং গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতনে কদলি শব্দটি 'স্ত্রী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রী-সঙ্কুল দেশটি কোথায়? কদলী রাজ্যের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

আশ্চর্য্য দেখিলাম সেই রাজ্যের ব্যবহার।
স্ত্রী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের সঞ্চার ॥
স্ত্রী রাজা স্ত্রী প্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওয়ান।
স্ত্রী রাজা হইয়া করে রাজ্যের পালন ॥

অপূর্ব্ব রাজ্যের কথা শুনিতে অনুরূপ।
ঋতুস্নান করি নারী যায় কামরূপ॥
কামরূপ সহরে আছে পুরুষের বসতি।
তথা যায় যেবা নারী হয় ঋতুমতী॥
কামরূপে যাইয়া রতি ভুঞ্জেন শৃঙ্গার
ঋতু রক্ষা করে নারী গর্ভের সঞ্চার॥
যে নারীর উদরে সৃজন হয় বেটা।
রামচক্র বাণে তার মুণ্ড যায় কাটা॥
বৎসর অন্তরে ফিরে রামচক্র বাণ।
স্ত্রীয়া পাটনে নাই পুরুষের পরিত্রাণ॥

—গোপীচন্দ্রের গান, ৪২৫-৪২৫ পৃ.।

এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, কদলী রাজ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত, কামরূপের কাছাকাছি। ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাসহরই কি পূর্ব্বে কদলি সহর বলিয়া পরিচিত ছিল? কৈলাসহর অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে ইহা আহোমদিগের রাজধানী ছিল। এই স্থানে অনেক পুরাতন দীঘি ও প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতনের যে সকল পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের ভণিতায় চার জন কবির নাম পাওয়া যায়—(১) কবীন্দ্র দাস, (২) সেখ ফয়জুল্লা, (৩) ভীমদাস এবং (৪) শ্যামদাস সেন। একখানি গ্রন্থের চার জন প্রণেতা, ইহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কাজেই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা লইয়া এক বিষম গোল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতার অল্পতা দেখিয়া মনে হয়, এই দুই জন কবি অন্য কোনো কবির বচন শুনিয়া মীননাথের কাহিনী লিখিয়াছেন। আবার অনেকে মনে করেন, ভীমদাস নামে কোনো কবি নাই; লিপিকরের ভ্রমবশত 'কবীন্দ্রদাস' স্থলে 'ভীমদাস' হইয়াছে। উভয় কবির ভণিতা অভিন্ন বলিয়া তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি একেবারেই কাল্পনিক। কারণ, প্রথমত 'কবীন্দ্র' লিখিতে তিনি অক্ষর এবং 'ভীম' লিখিতে দুই অক্ষর—অক্ষরের সংখ্যা এক নহে; দ্বিতীয়ত 'ক' ও 'ভ' এবং 'ব' ও 'ম'-কারের মধ্যে পরস্পর কোনো সাদৃশ্য নাই; তৃতীয়ত ভীমদাসের ভণিতা কবীন্দ্রদাসের ভণিতার অনুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভীমদাসের ভণিতা এবং সেখ ফয়জুল্লার ভণিতা অভিন্ন বলিতে দোষ কি? যেমন—

বলে হীন ভীমদাসে মনে অনুমানি।
শুনিয়া রচিলা সিদ্ধার সঙ্কেত যে বাণী॥

আর,

কহে হিন ফজুল্লাএ মনে অনুমানি।
+রচিল সিদ্ধার সঙ্গীত জে বাণী॥

যে কারণে ভীমদাস ও কবীন্দ্রদাস অভিন্ন হইয়াছেন, সে কারণে ভীমদাস ও ফয়জুল্লা একই ব্যক্তি হইতে পারেন। সুতরাং ভীমদাস ও কবীন্দ্রদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। আমাদের মনে হয়, ভীমদাস একজন ভিন্ন কবি। তিনি ফয়জুল্লার লিখিত পুঁথি অনুসরণ করিয়া মীননাথের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন।

সেখ ফয়জুল্লার ভণিতা প্রাচীনতম। প্রত্যেক পুঁথিতেই তাঁহার ভণিতা পাওয়া যায়। এই দুইটি কারণে আমাদের মনে হয়, সেখ ফয়জুল্লাই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা। একটি ভণিতায় আছে—

কহেন কবিন্দ্র আত্ত কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥—গোরক্ষবিজয়, পৃ. ১০।

আরেকটি ভণিতায়—

কবিন্দ্র বচন সুনি ফয়জুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥

—গোরক্ষবিজয়, ১৩০ পৃ.।

এই দুইটি ভণিতা হইতে অনুমান হয়, প্রথমে গোরক্ষবিজয়-কাহিনী লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। পরে কবীন্দ্র দাস ইহা সংগ্রহ করিয়া নোতুন আকারে মৌখিক গাথা প্রচার করেন এবং সেখ ফয়জুল্লাই তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের কবিরা ফয়জুল্লার গ্রন্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মীননাথের কাহিনী লিখিয়াছেন।

গোরক্ষবিজয় বা মীন-চেতনে গোরক্ষনাথের চরিত্রের উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে। নানা প্রলোভনে পড়িয়াও গোরক্ষনাথ বিচলিত হন নাই। তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ও নির্ম্মল ছিল।

দিবা হৈলে বাঘিনী জগত মোহিনী রে
রাত্রি হৈলে সর্ব্বাঙ্গ শোষে॥

—গোরক্ষবিজয়, ১৮৭ পৃ.।

কিন্তু এ হেন নারীও গোরক্ষনাথের রক্ত শোষণ করিতে পারিল না। নারীর কুহক তাঁহার কাছে একেবারে ব্যর্থ হইল।

গোরক্ষনাথের গুরু-ভক্তি আদর্শস্থানীয়। তিনি নর্ত্তকীর বেশে কদলি নগরে যাইয়া গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি গুরুকে তত্ত্ববিষয়ক একত্রিশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নগুলি পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত।

ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গান এবং মীন-চেতন বা গোরক্ষ-বিজয় একই বৃহৎ-পালার দুইটি ভাগ। মীন-চেতনে বা গোরক্ষ-বিজয় পূর্ব্বভাগ এবং ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গান উত্তর ভাগ। এই পুঁথিগুলি নাথধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। মীন-গোরক্ষ-নাথের কথা এবং ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী ভারত-ব্যাপী প্রচলিত।

ডাক ও খনার বচন

বাঙ্গালীদের চিরকালই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। গতানুগতিক কোনো কিছু নির্ব্বিচারে মানিয়া চলা তাহাদের ধাত নয়। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা তাহারা নোতুন করিয়া চিন্তা করিয়াছে এবং তাহাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, কাজেই বাঙ্গালীরা কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছে। জ্যোতিষতত্ত্বও তাহাদের গবেষণার বিষয় ছিল। প্রচলিত কৃষিতত্ত্ব বা জ্যোতিষতত্ত্বে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা তাহাদের দেশের ও নিজেদের উপযোগী করিয়া এই দুই শাস্ত্র নোতুন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছিল। প্রাচীন কাল হইতে এই সকল বিষয় ডাক ও খনার বচন নামে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এমন কি নিরক্ষর স্ত্রীলোক এবং কৃষকগণের মুখেও ডাকের বচন, বিশেষ করিয়া খনার বচনের আবৃত্তি শোনা যায়।

ডাক ও খনার বচন গৃহস্থের জ্ঞান-ভাণ্ডার। ইহাতে জ্যোতিষতত্ত্ব, গৃহস্থালী, স্ত্রী-চরিত্র প্রভৃতি নানা বিষয় এবং কৃষকগণের জন্য বহুবিধ উপদেশ আছে। নিম্নে কয়েকটি ডাক ও খনার বচন উদ্ধৃত করিতেছি ;—

বৃষ্টিগণনা—

চইত হেরেণী বৈশাখ জাড়া।
প্রথম জ্যৈষ্ঠে ভরে গাড়া॥
ডাক বলে এ তিন বাণী।
আষাঢ় শ্রাবণ না হয় পানি॥

পৌষ গরমী বৈশাখ জাড়
প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাড়া
খনা বলে শুনহে স্বামী।
শ্রাবণ ভাদরে না হবে পানি

কৃষিসম্বন্ধে—

বৈশাখের প্রথম জলে।
আশুধান দ্বিগুণ ফলে॥
খনা বলে শুন ভাই।
তুলায় তুলা অধিক পাই॥

খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো

বাঁধো আগি আলী।
রোও তবে শালী॥
না যদি ফল ফলে।
গালি পেড়ো খনা বলে॥

ডেকে ডেকে খনা গান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥

জ্যোতিষসম্বন্ধে—

খনা কয় বরাহেরে কোন লগ্ন দে
লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ এক
আছে শনি সপ্তম ঘরে।
অবশ্য তারে খোঁড়া করে॥
থাকয় রবি ভ্রমায় ভূখণ্ড।
চন্দ্র থাকয় করে নব খণ্ড॥
মঙ্গল থাকে করে খণ্ড খণ্ড।
অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড॥

থাকে বুধ বিষয় করায়।
গুরু শুক্র থাকে বহুধন পায়॥
লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা।
লগ্নে দি ভানুতনুজা॥
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ।
মরে জননী পীড়ে বাপ॥

কি কি বেচা উচিত—

বুড়ো গরু বস্ত্র পুরাণ, চোরা গাই গাধি চুবা ধান।
ডাক বলে সেই সেয়ান, যে বেচিতে না করে আন॥

কি কি পরিত্যাগ করা উচিত—

চোর সেবক চোরা গাই।
খল পড়সি দুষ্ট ভাই॥
দুষ্টা নারী পুত্র জুয়ার।
ডাক বলে দূরে কর পরিহার॥

সুগৃহিণী সম্বন্ধে—

মিঠা রাঁধে সরু অকাটে।
সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে॥
চড়কা[১] পিঁড়ি, চড়ক[২] ধুতি।
রাঁধে বাড়ে না লাগে কাতি[৩]॥
অতিথ দেখিয়া মরে লাজে।
তনু তার পূজায় সাজে॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভক্তি॥
রৌদ্রে কাঁটা ঝুটায় রান্ধে।
খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে॥
আয় ব্যয় করে শাশুড়ি পূজে।
সর্ব্বকাল স্বামীকে ভজে॥
কাঁখে কলসী পানিকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাউকে না চায়॥
যেমন যায় তেমনি আসে।
ডাক বলে গৃহিণী সেই সে॥

১। উঁচু। ২। খাট। ৩। দাগ।

কুগৃহিণী সম্বন্ধে—

গৃহিণী হইয়া রূপে ভুলে।
স্বামীর পিঁড়ি পায়ে ঠেলে
প্রভাত কালে নিদ্রা যায়।
বাসি শয্যা সূর্য্য পায়॥
উদয়ে ছড়া সাঁজে ভাড়া।
সেই গৃহিণীর মুখ পোড়া॥
যে গৃহিনী আয়ুদড়মুণ্ডী[১]।
খায় দায় না পালে হাণ্ডি॥
ফেলায় খায় চায় প্রচুর।
ডাক বলে নিকালহ দূর॥

স্ত্রীলোকের লক্ষণ—

অতি দীঘল হয় রাঁড়ী, নির্দ্ধন হয় নাড়া মুড়ী॥
পিঙ্গল আঁখি চপল মতি, ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি॥
পেট পিঠ উচ্চ ললাট, তা দেখিয়া ছাড়হ বাট॥
দেবর বধে স্বামী মারে, ডাক বলে আর কিবা করে॥
নাক বাজে যার নিদ মহলে, কথ্য ভাষে দুষ্য বলে॥

ভুমি কাঁপে পায়ের ঘায়ে।
তার আয়তি ক দিন রহে॥
যাহার বহু ঝি দূরে যাতি।
নিকটে যার বৈঠে অসতী॥
কথা কইতে করে হাস।
বলে ডাক তার নির্জ্জাস॥
পানি ফেলিয়া পানিকে যায়।
আন পুরুষে আড়ে চায়॥
তারে নাহি বলিহ সতী।
স্বরূপে সে দুষ্টমতি॥
হাসিয়া চাহে আউড় দৃষ্টি।
বলে ডাক সেই সে নষ্টী॥

১। অতিভোজনকারিণী।

খট মটায়ে হাঁটে নারি, কট মটায়ে চায়।
মাসেক খানের ভিতর তার সিঁতের সিন্দুর যায় ॥

যার ঘরে নাই ঢেঁকি মুষল।
তার বউ ঝির নাই কুশল ॥
রাণ্ডী হইয়া ভোগ বালাই।
ডাক বলে তারে আগে সামলাই ॥

আমাদের দেশে ডাক ও খনা সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী আছে। ডাককে ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ডাক কুম্ভকারজাতীয় এবং আসাম প্রদেশের 'লোহিডাঙ্গরা' নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া কথিত আছে। আবার ইহ'ও বলা হইয়াছে যে, তিনি জাতিতে গোপ ছিলেন। এইরূপে খনাকে নিয়াও অনেক গবেষণা করা হইয়াছে।

ডাক কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। 'ডাক' শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞা' বা 'জ্ঞান। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, কাজেই এখন আর এ বিষয়ে কিছু বলিব না। তবে এখানে একটিমাত্র কথা বলিতে চাই। তন্ত্রে 'ডাকিনী' শব্দের উল্লেখ আছে। এই ডাকিনী যোগিনীবিশেষের নাম। ইহা 'ডাক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহার অর্থ 'জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'। তিব্বতীতে ডাকিনীকে বলা হইয়াছে, "য়ে শেস্-কা-হ্‌থ'-'গ্রো-ম" অর্থাৎ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কাজেই ডাকের অর্থ যে 'প্রজ্ঞা' বা 'জ্ঞান' ইহা তাহাই সমর্থন করিতেছে।

খনাকে বরাহমিহিরের স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং আমাদের দেশে এসম্বন্ধে, নানা প্রকার আজগুবী গল্প আছে। বরাহমিহির উজ্জয়িনীর অধিবাসী। তাঁহার স্ত্রী কৃষিতত্ত্ব ও জ্যোতিবতত্ত্ব উজ্জয়িনীর প্রচলিত ভাষাতে না লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছেন, ইহা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। খনার বচনে বরাহমিহিরের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই নামের উল্লেখ হইতে খনাকে বরাহমিহিরের স্ত্রী বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। খনার বচন বাঙ্গালার জ্যোতিষশাস্ত্র। সেই সময় বাঙ্গালা দেশে বরাহমিহিরের জ্যোতিষশাস্ত্রেরও প্রচলন ছিল। খনার কোনো কোনো বচনে বরাহমিহিরের মত খণ্ডন করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

যেবার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে।
সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে ॥
নানা শস্যে পূর্ণ এই বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয় ॥

আমরা খনার বচনে 'শ্বশুর' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। যথা—

(১) কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥

(২) আষাঢ়ে নবমী শুকল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা ॥

কিন্তু এই 'শ্বশুর' শব্দের অর্থ স্বামীর বা স্ত্রীর পিতা নহে। এখানে এই শব্দটি 'পূজ্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (শ্বশুরঃ পূজ্যঃ—ইতি মেদিনী) এবং ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বরাহমিহিরকেই বুঝাইতেছে।

এখন দেখা যাউক 'খনা' শব্দের অর্থ কি? আমরা এই শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতে পাই না। একমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রচলন আছে। আমাদের মনে হয়, ইহা তিব্বতী 'ম্‌খন্' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। তিব্বতী "ম্‌খন্-পো" শব্দের অর্থ 'জ্ঞানী' বা 'উপদেষ্টা'। কাজেই খনার বচনের অর্থ 'জ্ঞানী' বা 'উপদেষ্টার বচন'।

অতএব ডাক বা খনার বচন কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা স্ত্রীবিশেষের উক্তি নহে। এইগুলি প্রবচনমাত্র, বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সম্পদ, বহুদিন হইতে লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

ডাক ও খনার বচনের কাল কত কাল, বলা বড় শক্ত। বর্ত্তমানে আমাদের এমন কোনো উপকরণ নাই যাহার সাহায্যে ডাক ও খনার বচনের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে ভাষাই একমাত্র সম্বল, কিন্তু প্রবচনগুলির অত্যধিক প্রচলন হেতু ভাষার এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বও একেবারে নিরব।

ডাক ও খনার বচনকে বৌদ্ধ-যুগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় আমাকে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। আর না দিলে পাঠকগণই বা আমায় ছাড়িবেন কেন? বৌদ্ধযুগের শেষ সময়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের মুমূর্ষু অবস্থা, তখন বাঙ্গালা দেশে ঘোর নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতার দিনে এই প্রবচনগুলি রচিত হইয়াছিল। এই যুগে নাস্তিক বলিতে বৌদ্ধদিগকেও বুঝাইত। যে জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের অঙ্গ বলিয়া পরিচিত, সেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রমূলক অভিযান, ইহার মূলে বৌদ্ধ-প্রভাব ছাড়া আর কি হইতে পারে?

নবম স্তবক

(২) মঙ্গল-কাব্যের প্রথম যুগ

কালক্রমে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজেদের ধর্ম্মের ও দেবদেবীর মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহারা নিজেদের দেবদেবীকে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পোষাক

পরাইয়া ছদ্মবেশে প্রচার করিবার চেষ্টা করিলেন। এইরূপে বহু বৌদ্ধ দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নাম গ্রহণ করিয়া, কোনো কোনো স্থলে বা নোতুন নামে প্রচ্ছন্নভাবে পূজা পাইতে-ছিলেন। এই সকল সংস্কারপ্রাপ্ত দেবদেবীর অদ্ভুত শক্তি, মাহাত্ম্য এবং পূজা প্রচারের জন্য একপ্রকার কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম মঙ্গল-কাব্য। এই কাব্য গান করিলে অথবা শুনিলে গায়ক বা শ্রোতার মঙ্গল হয় বলিয়া ইহাকে মঙ্গল-কাব্য বলা হয়। ইহা পুরাণ নামেও পরিচিত। সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণ অনুসারে এই সকল বাঙ্গালা পুরাণ রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণে আছে—

> "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
> বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥"

সংস্কৃত পুরাণের মত এই সকল পুরাণে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার মহিমা ও পূজা প্রচার করা হইয়াছে এবং সেই দেবতার মাহাত্ম্য দেখাইতে যাইয়া তাঁহার ভক্ত কোনো রাজা বা মহাপুরুষের চরিত্র এবং বংশ বর্ণিত হইয়াছে।

মঙ্গল-কাব্যে বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্ম শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুরূপে, বৌদ্ধ শক্তি তরিতা মনসা-রূপে এবং বজ্রতারা বাশুলী (সংস্কৃত 'বিশালাক্ষী'?) নাম গ্রহণ করিয়া চণ্ডীর সহিত অভিন্ন হইয়া পূজা পাইয়াছেন। চৈতন্যপূর্ব্ব মঙ্গল-কাব্যের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষ্ণু-দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহার সহচরী ছিলেন রাধা। 'কেন্দুবিল্বসম্ভব-রোহিণীরমণ' জয়দেব এবং চণ্ডীদাস এই বিষ্ণুদেবতারই লীলা গান করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপুরাণ

আমরা ইতিপূর্ব্বে ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণের উল্লেখ করিয়াছি। দীনেশবাবু এই পুথির কোনো আলোচনা করেন নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র ভূমি-কায় সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছিলেন। ১৩৩৭ সালে উক্ত পুস্তকখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মদীয় গুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুথিখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ সাংজাত খণ্ড এবং দ্বিতীয় ভাগ চরিত-খণ্ড বা রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনের কথা। পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয় কেবল-মাত্র প্রথম খণ্ডের সম্পাদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম খণ্ডের শেষে দ্বিতীয় খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। এই পুঁথিখানিতে সৃষ্টিখণ্ড বা দেবতাখণ্ডের কোনো উল্লেখ নাই।

পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য পড়িতে গেলেই ময়ূরভট্টের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের আদিকবি। তিনি ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য সর্ব্বপ্রথম রচনা করেন। পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ তাঁহার দোহাই দিয়াছেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—

> বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট করি সুকোমল।
> দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

ঘনরাম বলেন,

> স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
> ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্যকবি ॥

ধর্ম্মপুরাণ হইতে ময়ূরভট্টের অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। ময়ূরভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তদীয় ধর্ম্মপুরাণে আছে—

> কাতর অন্তরে নৃপ করিল গমন।
> ভনে দ্বিজ ময়ূরক ভাবি নিরঞ্জন ॥—৫পৃ.

ময়ূরভট্ট রাজা ধর্ম্মসেনের ধর্ম্মপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন ধর্ম্মসেন মৃগয়া করিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন। এই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধর্ম্মঠাকুরের স্বপ্না-দেশে ধর্ম্মসেন ধর্ম্মপূজা করেন। এই উপলক্ষ্যে রাজার আদেশে ময়ূরভট্ট ধর্ম্মপুরাণখানি রচনা করিয়াছিলেন। ময়ূরভট্ট ধর্ম্মসেনের সমসাময়িক। এই ধর্ম্মসেন চিত্রসেনের পুত্র এবং লাউসেনের পৌত্র। ধর্ম্মপুরাণে ধর্ম্মসেনের বংশপরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

> ময়না নামেতে দেশ দক্ষিণেতে স্থিতি।
> ক্ষত্রিয়বংশীয় তথা ছিল নরপতি ॥
> কনকসেনের পুত্র নাম কর্ণসেন ॥
> গৌড়ের অধীন প্রজা পালন করেন ॥
> ধর্ম্মের কৃপায় তার হইল তনয়।
> লাউসেন নাম ধরে সর্ব্বগুণময় ॥
> ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তিনি প্রকাশ করিল।
> চিত্রসেন নামেতে তাহার পুত্র হৈল ॥
> চিত্রসেনের পুত্র নাম ধর্ম্মসেন।
> রামের সমান প্রজা পালন করেন ॥—২পৃ.।

আমরা রামাই পণ্ডিতের কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া লাউসেনকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ফেলিয়াছি। কাজেই খৃষ্টীয় একাদশ শতকে লাউসেনের পৌত্র

ধর্ম্মসেনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়। অতএব ময়ূরভট্ট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ময়ূরভট্টের পুঁথির ভাষা বংশজ, কৌলীন্য রক্ষা করিতে পারে নাই। গায়কদিগের মুখে এবং পুঁথিলেখকদের হাতে পড়িয়া ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন রূপ আর নাই বলিলেই চলে, আধুনিক ছাঁচে ফেলা অত্যন্ত একালের ভাষা। ইহাতে কতকগুলি আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন—নফর, ফতু (আরবী 'ফতেহ'), বাকি, মহল, সাজা, সাহেব, হাজার প্রভৃতি। মনে হয়, এই সকল শব্দ পরবর্ত্তী কালে আমদানী হইয়াছিল। স্থানে স্থানে আবার সংস্কৃতের মত কতকগুলি পদ সাধিত হইয়াছে, যথা—পিতৃকাছে, বিশ্বকর্ম্মনে ইত্যাদি।

ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ হইতে বরপণ, বাল্যবিবাহ, ইন্দ্রিয়াসক্তি, নানা প্রকার ব্যভিচার প্রভৃতি বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। কলিযুগের বর্ণনা অতি সুন্দর। তাহা হইতে তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারা যায়।

ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণে দেখিতে পাই, ধর্ম্ম বিষ্ণুমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দিয়াছেন। কলিকালে ধর্ম্ম ও বিষ্ণু অভিন্ন দেবতা—

কলিযুগে অবতীর্ণ জগতের পিতা।
যিনি ধর্ম্ম তিনি বিষ্ণু নাহিক অন্যথা॥...৮পৃ.।

উক্ত পুথিতে লেখা আছে, সাবিত্রীর অভিশাপে নারায়ণ ধর্ম্মশিলারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—

বিষম বেদনা যেবা দিল মোর মনে।
শিলামূর্ত্তি হয়ে থাক মরতভুবনে॥
সাবিত্রীর অভিশাপ শুনি নারায়ণ।
তথাস্ত বলিয়া হরি করিল গ্রহণ॥—৯পৃ.।

কাণা হরিদত্ত

আমরা বলিয়াছি, মনসাদেবী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবী। কাণা হরিদত্ত সর্ব্বপ্রথম এই দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তিনিই মনসা-মঙ্গল কাব্যের আদিকবি। তবে নানা কারণে তাঁহার রচিত মনসা-মঙ্গল কাব্য তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়গুপ্তের সময়ে পুঁথিখানি বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত তদীয় পদ্মাপুরাণে কাণা হরিদত্তের মনসা-মঙ্গল এবং তাহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
—৪পৃ.।

আমাদের মনে হয়, কাণা হরিদত্তের সময়ে এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবী সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, তখনো বিবর্ত্তন চলিতেছিল। কাজেই হরিদত্ত মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বিশেষ শ্রদ্ধা বা ভক্তির সহিত লিখেন নাই এবং এই জন্যই—

"গীতে মতি না দেয় কেহ মিছে লাঁফ ফাল"।—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, ৪পৃ.।

এই কারণে তাঁহার রচিত মনসা-মঙ্গল কাব্য স্বতন্ত্র ছিল এবং তাঁহার গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইবার বোধ হয়, ইহাই কারণ। মনে হয়, এই জন্যই পরবর্ত্তী কালে বিজয়গুপ্ত কাণা হরিদত্তের কাব্যের তীব্র নিন্দা করিয়া সম্পূর্ণ নোতুন ধরণে একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বিজয়গুপ্তের সময়ে মনসাদেবী খাঁটি হিন্দুদেবী হইয়া পড়িয়াছেন, দেখা যায়।

মনসা-মঙ্গলের আদিকবি কোন সময়ে কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রথমে মনসাদেবীর গান শুনাইয়াছিলেন, তাহা এখনো জানা যায় নাই। তবে সম্প্রতি মৈমনসিংহ জেলা হইতে কাণা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, কাণা হরিদত্ত পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। দীনেশবাবু তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে কাণা হরিদত্তের কবিতার একটা নমুনা দিয়াছেন। আমরা তাহাই পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেখি বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিতের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিনী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী॥

কণক নাগে কৈল কণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি ॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা ॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥"

এখন কাণা হরিদত্তের কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাউক। এই কবির কালনির্ণয়ের জন্য আমাদিগকে বিজয়গুপ্তের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিজয়গুপ্তের সময়ে কাণা হরিদত্তের মনসা-মঙ্গল কাব্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিজয়গুপ্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের সময়ের লোক। কাজেই কাণা হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের সময় হইতে আন্দাজ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক হইবেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ কাণা হরিদত্তের কাব্য হঠাৎ একদিন বা এক বৎসরে বিলুপ্ত হয় নাই; লুপ্ত হইতেও দুই তিন শত বৎসর লাগিয়াছে। এই অনুমান অভ্রান্ত হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকই মনসা-মঙ্গল কাব্যের আদিকবি কাণা হরিদত্তের অবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

চণ্ডীদাস

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসই বাঙ্গালী জাতিকে শ্যাম নাম শুনাইয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই বাঁশীর সুর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া শত শত বাঙ্গালী নর-নারীর প্রাণ আকুল করিয়া আসিতেছে। আত্ম-দানে যে প্রেমের পরিণতি, তিনি সেই প্রেমের বাণী শুনাইয়া বাঙ্গালীদের ঐহিক শান্তি ও পারত্রিক পুণ্য অর্জ্জনের মহাব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাণী শুনিয়া বাঙ্গালী জাতীর জীবন সার্থক হইয়াছে, বাঙ্গালীরা ধন্য হইয়াছে। তাঁহার পদের উন্মাদনা আছে মহাপ্রভু তাঁহার পদ শুনিয়া মাতোয়ারা হইতেন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের বাড়ী নান্নুর গ্রামে। এই গ্রামটি বীরভূম জেলায়। উক্ত গ্রামই তাঁহার সাধনাক্ষেত্র। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আরাধ্য দেবতা 'বাশুলী' বা 'বাসুলী'। এই বাশুলী বাগীশ্বরী-মূর্ত্তি—বিদ্যাদেবী, বিশালাক্ষী। এই দেবীর পাষাণমূর্ত্তি প্রসন্নবদনা, চতুর্ভুজা। উক্ত দেবীই চণ্ডীদাসের প্রেম-প্রচারের গুরু এবং তাঁহারই পূজারীরূপে তিনি সহজ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন,—

চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারই চাপড়ে নিদ্রা ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল সুরু॥

চণ্ডীদাস বিবাহিত ছিলেন। এক স্থানে তিনি বাশুলীদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে॥

চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি নিজের স্ত্রীর সংসর্গ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরকীয়া-প্রেমই তাঁহার আদর্শ। তাঁহার সহজ-সাধনের উত্তর-সাধিকা রজকিনী রামী। নরহরি দাসের মতে তাহার নাম ছিল "তারা ধুবনী"। সম্ভবত রামীর প্রকৃত নাম "রামতারা" ছিল এবং এই "রামতারা" নামই সংক্ষিপ্ত হইয়া কোনো কোনো স্থলে "রামী", কোনো কোনো স্থলে বা শুধু "তারা" হইয়া গিয়াছে। রামী অনাথা ছিল এবং অল্প বয়সেই বাশুলীদেবীর মন্দিরে দেয়াসিনী (<দেববাসিনী) অর্থাৎ সেবিকা নিযুক্ত হইয়াছিল,—

অলপ বয়সে দুঃখিনী রামিনী
সেবাতে নিযুক্ত হল।
চণ্ডীদাস কহে শশিকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥

চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের তুলনা হইতে পারে না। চণ্ডীদাসের প্রেম নিষ্কাম ছিল বলিয়াই তিনি প্রেমকে উপভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ও রামীর মধ্যে যে প্রেম ছিল তাহা কামগন্ধহীন, রক্তমাংসের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না,—

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

চণ্ডীদাস জগতে রামী ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। রামীই তাঁহার সব; রামীর চরণকেই তিনি সার বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নের তারা॥
তোমা বিনা মোর সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি॥
ও রূপমাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনারস॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার॥

চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম পার্থিব প্রেমের বহু উপরে ছিল। আত্মত্যাগেই তাঁহাদের প্রেমের সার্থকতা। কিন্তু চণ্ডীদাসের গ্রামবাসীরা তাঁহাদের নির্ম্মল অপার্থিব প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সকলে মিলিয়া ঘোঁট পাকাইয়া—

পিরীতি করিল জগতে ভাসিল
ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল কলঙ্ক ভাসিল
কাণাকাণি লোক জনে॥

রজকিনীর সংসর্গহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন ;—

ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে
জাতি পাতে হল্য ছাড়া॥

এমন কি, এইজন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরাও সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—

তোমার পিরীতে আমরা পতিত
নকুল ডাকিয়া বলে।

নকুলঠাকুর গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, সম্পর্কে চণ্ডীদাসের ভাই। চণ্ডীদাস তাঁহাকে ভাই সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

সুন হে নকুল ভাই।

নকুলঠাকুরও চণ্ডীদাসকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন,—

শুনিয়া নকুল কহিতে লাগিল
শুন চণ্ডীদাস ভাই।

নকুলঠাকুর চণ্ডীদাসকে সমাজে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এজন্য তিনি গ্রামের ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছিল। পরে তাঁহার অনেক অনুনয়-বিনয়ে ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীদাসকে সমাজে তুলিতে সম্মত হইলেন এবং চণ্ডীদাসকে রামীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বলা হইল। কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদ—

শুনি চণ্ডীদাস ছাড়িয়া নিশ্বাস
ভিজিয়া নয়ন জলে।

আশা ছিল—

ধোপানী সহিতে আমি যেন তাথে
উদ্ধার হইব কুলে॥

যাহা হউক নকুলঠাকুর দিবারাত্রি একমনে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাড়ীতে জিলেফি, মালপা, কচোরী, আলফা, পূরি, খিরি, সীতা, মিশ্রী প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য তৈরী হইতেছে। আর এদিকে রামী,—

নয়নের জলে কান্দিয়া বিকল
মনে বোধ দিতে নারে।

পরে—

গৃহেকে জাইঞা পালঙ্কে পাড়য়া
শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে
পৃথিবী ভিজিয়া যায়॥

কিন্তু রামীর এই করুণ আর্ত্তনাদে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজন আরম্ভ হইল। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণগণের পাতে ভাত পরিবেষণ করিলেন। তারপর—

দ্বিজগণে ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে
ধোবিনী তখন ধায়।

ধোবিনী রামীর উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণ-ভোজন পণ্ড হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই; কারণ, পুঁথির সেই অংশের লেখা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিংবদন্তী আছে, ইহার পর অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং চণ্ডীদাস রামীর সহিত সমাজে উঠিয়াছিলেন। এই প্রবাদটি অমূলক বলিয়াই মনে হয়। বীরভূমের ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত গোঁড়া। অলৌকিক কিছু ঘটিলেও যে তাঁহারা ধোপানী রামীকে ব্রাহ্মণ-সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বোধ হয়, গ্রামের ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের গভীরতা ও পবিত্রতা দেখিয়া তাঁহাদের উভয়ের মিলনে আর কোনা প্রকার বাধা দেন নাই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক ছিলেন। পদকল্পতরু ও গীতকল্পতরুর কয়েকটি পদ হইতে জানা যায়, তাঁহাদের উভয়েই পরস্পরের কবিতায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা পরস্পরকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের আগ্রহ পূর্ণ হইল। বসন্তকালে সুরধুনীতীরে বটগাছতলায় উভয়ের মিলন হইল;—

সময় বসন্ত যাম দিন মাঝ হি
বটতলে সুরধুনী তীরে।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুলকে কলেবর গীর॥

এবং আনন্দে—

দুহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, এক দিন তিনি রামীর সহিত কীর্ণাহারের এক নাটমন্দিরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নাটমন্দির চাপা পড়িয়া তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় আরেকটি প্রবাদের উল্লেখ আছে;—

"নান্নুরের বাশুলী-মন্দিরের নিকটে যে ভগ্ন গৃহের চিহ্নাদিসহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে একটি নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবন-বিজয়ী কীর্ত্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব্ তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়-মন্ত্র—তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাবের বেগম সাহেব একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্ডীদাসের গীতি শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোন প্রকারেই বেগম সাহেবাকে শাসন করিতে পারিলেন না। চণ্ডীদাসের সুর সত্যই তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, এই মর্ম্ম-প্রবেশী সংগীত লজ্জা-ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল।

নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়াছিল, সেই সময় সহসা প্রেম-স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব-সৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দল সহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এখন সেই স্তূপের নীচে নর-কঙ্কাল পাওয়া যায়, হয় ত সেই নর-কঙ্কালের কোন না কোনটি বাঙ্গালার প্রিয়তম কবির হইবে।"

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গীতি কবিতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কবিতাটি চণ্ডীদাসের শোকে রামীর করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী বিলাপ। কিন্তু ইহা রামীর রচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা নিম্নে কবিতাটির কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

কাঁহা গেয়্যো বন্ধু চণ্ডিদাস।
চাতকি পিয়াসীগণ না পাইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস॥
কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।
না জানিঞা প্রেম লেহ বেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥

কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুর আবির্ভূত পশু নর
মানিনীর না রহিল মান॥
গান শুনি পাচ্ছার বেগম।
অস্থির হইল মন ধৈর্য্য নহে একক্ষণ
রাজারে কহে জানিঞা মরম॥
রাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিল।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরাণিত হস্তি আনি পিঠে পেলি বান্ধ টানি
পিঠ খুদে বৈরী ছাড় গিয়া॥ ইত্যাদি।

এই পদ হইতে জানা যায়, চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের প্রাসাদে গান করিতে গিয়াছিলেন। নবাবের বেগম চণ্ডীদাসের গানে মুগ্ধ হইয়া হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নবাব ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার আদেশে চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

নবাবের ক্রোধই চণ্ডীদাসের মৃত্যুর কারণ। গৌড়ের এই নবাব কে? বোধ হয়, গণেশের পুত্র যত্থ। তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে পাতসাহ ও রাজা এবং তাঁহার রাণীকে বেগম ও রাণী, দুইই বলা হইয়াছে। যত্থ বা জালালুদ্দিন ১৪১৪ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বীরভূমের মহাকবি চণ্ডীদাস যত্থর সমসাময়িক। সুতরাং এই চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

আমরা নিম্নে রামীর ভণিতাযুক্ত আরো দুইটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করিতেছি;—

(১) কোথা যাও ওহে প্রাণবঁধু মোর
দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ ফাটে মোর বুক
ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে এ দেহ সঁপিনু
মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া মথুরা যাইবে
বল হে সে কথা শুনি॥

তোমার এ সারথি ক্রূর অতিশয়
বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে দুঃখসিন্ধুনীরে
অবলা ভাসাইতে নাই॥
পিরীতি জালিয়া যদি বা যাইবা
কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন করহ শ্রবণ
দাসীরে করহ সাথ॥

এই পদে 'মথুরা যাইবে' বলিতে রামীকে ত্যাগ করিয়া 'সমাজে উঠিবে' এবং 'সারথি' বলিতে নকুলঠাকুরকে বুঝাইতেছে।

(২) তুমি দিবাভাগে নিশা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুঃখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল মানি সুজঞ্জাল
যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে মন নহে স্থির
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল কত সুনির্ম্মল
শ্রীমুখমণ্ডলশোভা।
হেরি লয় মনে এই দুই নয়নে
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
চাহে সর্ব্বক্ষণ হয় দরশন
নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক কি কব অধিক
দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি যে আমার আমি হে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার॥

উক্ত দুইটি পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। আমরা এস্থলে আর বিশেষ কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। পদ দুইটি রামীর রচিত কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার এই নাম পুথির কোনো স্থানে পাওয়া যায় না। পুথিখানির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "পুথির আদ্যন্ত-বিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই; এমন কি, পুথির নামটি পর্য্যন্ত না। দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর অস্তিত্বমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল।" বসন্তবাবু ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পুথিখানির নাম দিয়াছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। এখন এই পুথিখানি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; কাজেই আমরাও ইহাকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামেই অভিহিত করিলাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি খণ্ডিত পুঁথি। ইহার প্রাপ্ত অংশ তের খণ্ডে বিভক্ত—(১) জন্ম-খণ্ড, (২)তাম্বূল-খণ্ড, (৩)দান-খণ্ড, (৪)নৌকা-খণ্ড, (৫)ভার-খণ্ড, (৬) ছত্র-খণ্ড, (৭) বৃন্দাবন-খণ্ড, (৮) কালিয়দমন-খণ্ড, (৯) যমুনা-খণ্ড, (১০) হার-খণ্ড, (১১) বাণ-খণ্ড, (১২) বংশী-খণ্ড, ও (১৩) রাধার বিরহ-খণ্ড। জন্ম-খণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের জন্ম-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিদশের নাথ, শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী জগন্নাথ হরি। তিনিই ভগবান্ স্বয়ং। শ্রীরাধা লক্ষ্মীর অবতার; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য সাগরের ঔরসে এবং পদুমার (পদ্মা) গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জন্ম-খণ্ডে বড়ায়ির রূপের বর্ণনাটি চমৎকার হইয়াছে;—

> শেত চামর কেশে।
> কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
> আহি চুনরেখ যেহ দেখি।
> কোটর বাটুল দুই আখি॥
> যাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
> উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
> বিকট দন্ত কপট বাণী।
> ওঠ আধর উঠক জিণী॥
> কাঠি সম বাহু বাহুযুগলে।
> নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
> কুটিল গমন ঘন কাশে।

বড়ায়ির চরিত্র আকারসদৃশ ছিল। তিনি পদ্মার পিসী, কাজেই সম্পর্কে রাধার বড় আই (= মাতামহী)। বড়ায়ি রাধাকে বলিতেছেন,—

> আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।—শ্রীকৃ.৭পৃ.।

রাধাও বলিয়াছেন,—

> তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী।—শ্রীকৃ.৮পৃ.।

তাম্বূল-খণ্ডে কৃষ্ণ বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ ও নব যৌবনের কথা শুনিয়া কামাচার উপহারস্বরূপ তাম্বূল প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পরিচয় পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রথমেই নায়কের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাটিতে বীভৎস অশ্লীলতার পূতিগন্ধ পাওয়া যায়। নায়ক নায়িকাকে কখনো দেখেন নাই, অথচ একদিন অন্যের মুখে নায়িকার রূপ ও যৌবনের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। নবীনা কিশোরীর সহিত দৈহিক মিলনের লালসা-বহ্নি নায়কের হৃদয়ে দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। অগত্যা তিনি বড়ায়ির শরণাপন্ন হইয়া সানুনয়ে বলিলেন,—

> না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি
> আপণে চিন্ত উপাএ।
> রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ায়ি
> কাহ্নাইর প্রাণ জাএ॥
> আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি
> মনে না করিহ হেলা।
> দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
> তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা॥
> আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী
> তোহ্মার ভয়িলা দাসে।
> এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন
> চলহ রাধার পাশে॥

আরো বলিলেন,—

> পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি
> তাম্বূলেঁ ভরাআঁ ডালী।
> মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
> আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধারই অপর নাম চন্দ্রাবলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাস চন্দ্রাবলী নামে আর অন্য নায়িকার সৃষ্টি করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের কাতর উক্তি শুনিয়া বড়ায়ি রাধার কাছে যাইয়া—

কথা থানি থানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বূল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে॥

উপহার দেখিয়া রাধা প্রশ্ন করিলেন,—

কহির কপুর তাম্বূল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহ্লী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর॥

বড়ায়ি উত্তর করিলেন,—

আস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহে জরেঁ তেহেঁ জয়িলা
পাঠাইল তোহ্মা বেহাঁ॥

তিনি অরণ্যে রোদন করিলেন। রাধার মন গলিল না, বরং ফল ফলিল উল্টা—

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
জালএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥

ইহা দেখিয়া—

উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল
হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন
তোর দরশনে জীএ॥

রাধা উত্তর করিলেন,—

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥

ইহা শুনিয়া বড়ায়ি বলিলেন,—

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

তখন রাধা চটিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

বড়ায়ির মারফৎ কৃষ্ণের কাতর প্রেমনিবেদন রাধার অন্তরে সাড়া দিল না, সকলই পণ্ড হইল। কিন্তু দূতী বড়ায়ি দমিলেন না, রাধাকে নানাভাবে সুরত-কেলির বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁহাকে লইয়া মথুরার হাটে চলিলেন।

দান-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লাভ করিবার জন্য দানী সাজিলেন। একাদশবর্ষীয়া মামীর রূপ ও যৌবনে কৃষ্ণের মন আকৃষ্ট হইল। রাধা বার বার মামী সম্বন্ধের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু কামাসক্ত কৃষ্ণ মামীর সহিত রতিকেলি করিতে ব্যাকুল হইলেন। তিনি রাধাকে ফুসলাতে লাগিলেন—

আনেক সময় যৌবন যে নারী
আপণ শরীরে শাঁচে।
আতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি
আপণে আপণা বঞ্চে॥
যাহার যৌবন নর উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ
যেহ্ন বিকসিত মাহ্লী॥

রাধা দেখিলেন, তাঁহার রূপ ও নব যৌবনই সকল অনর্থের মূল;—

চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাসে জগতের বৈরী॥

কামক্লিষ্ট কৃষ্ণ মামী-ভাগিনেয় সম্বন্ধ মানিবেন না দেখিয়া রাধা বলিলেন—

উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে।
আম্বার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুঁভরে॥
ইক্ষুলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে।
আঘোর পাপেঁ তোএ গায় বেআপিবেঁ॥

কিন্তু লম্পট কৃষ্ণের কাছে সকল যুক্তিই বিফল হইল। তিনি রাধার নিষেধবাক্য শুনিলেন না, তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং পরে—

হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে॥

নৌকা-খণ্ডে ষোল শ গোপী বড়ায়ির সহিত মথুরার হাটে বেচা-কেনা করিতে চলিল। রাধাও তাহাদের সঙ্গে গেলেন। কৃষ্ণ কাণ্ডারীবেশে ব্রজবালাদিগকে যমুনা পার করিলেন। পরে রাধা একাকী একখানি ভাঙ্গা নৌকায় উঠিয়া বলিলেন,—

অতি সাবধানে কাহ্নাঞিঁ কর মোরে পার॥

নৌকা নদীর মাঝখানে আসিতেই 'পর্ব্বত সমান ঢেউ' উঠিল। বড় বড় ঢেউ দেখিয়া রাধা ভয় পাইলেন এবং কৃষ্ণকে বলিলেন,—

দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে॥

এই সুযোগে কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—

চ্ছতরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।
সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর॥

তারপর রাধা বলিলেন,—

পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ।
যমুনাত পার হয়িলে আলিঙ্গন দিবোঁ॥

তখন কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন, নৌকাখানি তোমার দেহ-ভারে আক্রান্ত, তোমার অঙ্গের বসনভূষণ যমুনার জলে নিক্ষেপ কর। রাধা তাহাই করিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল। তখন—

কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার।
ছল করি টালিলেক রাধার পসার॥
তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞি কে মাঙ্গে কোল॥

তারপর কৃষ্ণ নৌকাখানি জলে ডুবাইয়া রাধাকে কোলে করিয়া ভাসিতে লাগিলেন। তিনি জলের ভিতর রাধার সহিত রতিকেলি করিলেন। কৃষ্ণের আলিঙ্গন, চুম্বন ও মর্দ্দনে রাধা ইচ্ছড়ে পাকিয়া গেলেন। ফলে কৃষ্ণ রতিসুখ সম্যগ্রূপে উপভোগ করিলেন। পরে তিনি সাঁতরাইয়া রাধাকে যমুনা পার করিলেন। রাধা বড়ায়ির সহিত নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

ভার-খণ্ডে কৃষ্ণ পুনরায় রাধার সহিত সুরতকেলির আশায় তাঁহার দধির ভার লইয়া মথুরার হাটে চলিলেন। মথুরার নিকটে দধির ভার নামাইয়া কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন,—

ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।

ছত্র-খণ্ডে রাধা রৌদ্রে চলিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন এবং পরে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাধাকে কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—

কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাগী॥

বৃন্দাবন-খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিলেন,—

রাধা তোর মোর দেখি মাঝ বৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হ...'ন যৌবনে॥

কৃষ্ণের মিলন-প্রার্থনা শুনিয়া রাধা উত্তর করিলেন,—

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেমন মণে॥
যত দেখ মোর সখিগণে।
কাহারো ভাল নহে মণে॥

* * * * * *

ফুল ফলের দিআঁ আশে॥
সখিগণ নেহ চারি পাশে।

রাধার এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন,—

আপণে কহিলে মোর মনের কথা।
মুনির্ত্তা খণ্ডিল সব বেথা॥
ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সব্ধার তোষিব আহ্মে মন॥

এই বলিয়া তিনি রাসের আয়োজন করিলেন। তারপর—

আনেক হুরিত্তা তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥
* * * * * * *
চির মনোরথ পুরি।
রসময় মন করী।
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে লইয়া কেলি করিলেন। রাধা বুঝিলেন—

বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে॥

কাজেই তিনি মান করিলেন। কৃষ্ণ নরম-গরম হইয়া রাধার মান ভাঙ্গিলেন। পরে রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাক্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া—

আল হের
এহি জাগে তোহ্মার চরণে।
প্রাণ কাহ্নাঞি ল
আহ্মা সম না করিহ আনে॥

কালীয়দমন-খণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধা ও গোপীদের অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। গোপীগণ কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল;—

দেখিতেঁ রাপাম্বিল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে॥

প্রেমাকুলিত চিত্তে রাধাও—

নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝে তেজি লাজ ভএ॥

যমুনা-খণ্ডে গোপীগণসহ কৃষ্ণের জল-কেলি এবং তাহাদের হার ও বস্ত্র-হরণ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক রাধা ও গোপীদের হার ও বস্ত্র লইয়া কদম্ব বৃক্ষের উপর উঠিয়া আনন্দে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—

তোমার বসন হের আহ্মার হাতে॥
যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর।
তাবত বসন নাহিঁ দিব দামোদর॥

তখন—

আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী।
জলে বিবসিনী ডাক পাড়ে রে গোআলী॥

তারপর রাধা করজোড়ে বলিলেন,—

হার বসন দেহ দেব বনমালী॥

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ—

হার লুকায়িআঁ রাধাক দিল বাস।

হার-খণ্ডে হার অপহরণের জন্য রাধা যশোদার নিকটে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। ইহা শুনিয়া যশোদা রাগ করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—

বাঁরে বাঁরে যে কাম নিষধিএ আহ্মে।
নিষেধ না শুনী সেসি করহ তোহ্মে॥

তিরস্কৃত হইয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে জননীকে রাধা ও গোপীগণের দোষ জ্ঞাপন করিলেন।

বাণ-খণ্ডে যশোদা-সমীপে অভিযোগের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতি মদন-বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাধা সংজ্ঞাহীন হইলেন। তাঁহাকে মহানিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়া কৃষ্ণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ অতি করুণ ও হৃদয়স্পর্শী। নমুনাস্বরূপ বিলাপের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

বালী জগছে জাগহে।
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল॥

অবশেষে—

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আম্বিল তাহার॥
ধেয়ান করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরে গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে॥

বংশী-খণ্ডে বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কে এই মনোহারী বাঁশী বাজাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি বড়ায়িকে বলিলেন ;—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

রাধার আর কোনো কাজে মন বসিল না। অবশেষে তিনি সেই বাঁশী চুরি করিলেন। পরে কৃষ্ণের অনেক অনুনয়ে বাঁশী ফিরাইয়া দিলেন।

রাধাবিরহ-খণ্ডে রাধার বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাতর হইয়াছেন, তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ হইয়াছে, বাহু হইতে বলয় বার বার খুলিয়া পড়িতেছে। বিরহ-বিধুরা রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে॥

রাধা বনে বনে কৃষ্ণকে অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী॥
ববেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী॥
এবেঁ মোঞ হৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্ন গেলা কতী॥

তারপর রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ এবং কৃষ্ণের মথুরাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুর গানের পালা। সঙ্গীত-দামোদরে ঝুমুরের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদু।
একৈব ঝুমরীর্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥"

অর্থাৎ শৃঙ্গাররসপ্রধান, মধুজাত মদ্যের মত মধুর ও মৃদু এবং বর্ণাদির নিয়মহীন গানের নাম ঝুমরী বা ঝুমুর। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি আদিরসের কাব্য। ঝুমুর গানের মত ইহাতে প্রশ্ন, উত্তর, প্রত্যুত্তর, উপহাস, গালাগালি, জয়পরাজয় প্রভৃতি সকলই আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দুইটি ধারা—একটি ধারায় এক দেবতা অন্য দেবতার ভক্তকে বধ করিয়া আপন ভক্তের জয় প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং অন্য ধারায় কোনো দেবতা প্রতিপক্ষের ভক্তকে নানা-ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা প্রতিপক্ষীয়া ভক্ত, কৃষ্ণের অনুরাগিণী হইতে নারাজ। তাঁহাকে কৃষ্ণের ভক্ত করিয়া তুলিবার জন্য নানা-রূপ ছল-কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে, তিনিই জগন্নাথ, নারায়ণ, তিনিই দশাবতারে দশ রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে—

তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদিনী বিদারিলে।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলে॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলে দুষ্টজন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ॥

—কালীয়দমন-খণ্ড।

পরে কৃষ্ণেরই জয় হইল। রাধা তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট। গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেকগুলি পদ গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার এই সকল অনুকরণে মূল শ্লোকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ অনুকরণে তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ও যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দের—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥
—১০ম সর্গ।

এই শ্লোকের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলে
হএ তোর আনুরূপে॥
—বৃন্দাবন-খণ্ড।

এই পদটি রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবন-খণ্ডে—

তোর রতি আশোআশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥ ইত্যাদি—

পদটি গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্। ইত্যাদি—

প্রসিদ্ধ পদের অনুবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবন-খণ্ডে—

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে॥ ইত্যাদি—

পদটি গীতগোবিন্দের দশম সর্গে—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী। ইত্যাদি—

পদের উৎকৃষ্ট অনুকরণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহ-খণ্ডে ‘নিন্দএ চান্দ চন্দন’ ইত্যাদি পদটি গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে ‘নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি’ ইত্যাদি পদের আদর্শে রচিত। উদাহরণের অভাব নাই, কিন্তু পাঠকগণের ধৈর্য্যের অভাব ঘটিতে পারে ভাবিয়া এখানেই বিরত হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জনবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সমালোচনায় লিখিয়াছেন, “এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখা নাই, অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয়া নর্ম্মসখী নাই, ললিতা-বিশাখা নাই, কেলিকদম্ব নাই” ইত্যাদি। উপরের বিশেষত্বগুলি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই গ্রন্থখানি যে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রত্নলিপিতত্ত্বের (Paloeography) সাহায্যে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিপীকৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সকল পদ একই সময়ের বা একই কবির রচিত নহে। এই পুথিতে এক বা একাধিক লোকের তিন ধরণের হস্তাক্ষর দেখা যায়। কাজেই সমগ্র পুঁথিখানি যে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

অনেক খুঁজিলাম, কিন্তু যে চণ্ডীদাসের সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোথাও সেই চণ্ডীদাসের সন্ধান পাইলাম না। আমাদের মনে হয়, সেই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন নাই; তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাস হইতে সম্পূর্ণ আলাদা, দুই ভিন্ন কবি। সেই চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম, তিনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও মহাকবি এবং তিনিই দ্বিজ চণ্ডীদাস; আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাসের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানি বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও বাঁকুড়া জেলায়। বাঙ্গালার অন্য কোনো স্থানে, এমন কি বীরভূমেও উক্ত গ্রন্থের আর কোনো পুঁথি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুর গানের পুঁথি। এক কালে বাঁকুড়া জেলায় ঝুমুর গানের খুব বেশি প্রচলন ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাস সেকালে প্রচলিত ঝুমুরের পালা অনুসারে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম অনন্ত, অনেক ভণিতায় এই নাম পাওয়া যায়। তাঁহার উপাধি বড়ু, ‘বড়ু’ শব্দের অর্থ ‘অবিবাহিত’। ছাতনায় প্রবাদ, চণ্ডীদাস বিবাহ করেন নাই। কিন্তু পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের ‘দারা’ ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাস বাসলীগণ, বাসলী-সেবক। এই দেবী এখনো ছাতনায় প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং রীতিমত পূজা পাইতেছেন। ছাতনার বাসলী দেবী

মঙ্গলচণ্ডী বা চণ্ডী-মূর্তি। তিনি দ্বিভুজা, দক্ষিণহস্তে খড়্গ ও বামহস্তে খর্পর; তিনি অসুরবাহিনী, এক চরণ অসুরের জঙ্ঘায় এবং অন্য চরণ অসুরের মাথায়; তিনি রুধির-পায়িনী, ভীষণদর্শনা। দেবীর দুই পাশে দুই সহচরী। রাধাবিরহ-খণ্ডে চণ্ডীদাস এই দেবীপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন ;—

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥

চণ্ডীপূজা করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে। তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ। এখন তিনি বড়ু-চণ্ডীদাস নামেই পরিচিত, তিনিই আদি চণ্ডীদাস। আর পদকর্তা চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীর উপাসক। তাঁহার বাশুলী সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি, তিনি চতুর্ভুজা, প্রসন্নবদনা (১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাসের রাধা সাগরের মেয়ে এবং তাঁহার অপর নাম চন্দ্রাবলী। কিন্তু পদকর্তা চণ্ডীদাসের রাধা বৃষভানুর মেয়ে, 'রাজার কুমারী'—

সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥
—চণ্ডীদাসের পদাবলী।

তিনি চন্দ্রাবলী নামে পৃথক্ নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন ;—

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ভীত হইয়া
আসিলা রাধার ধাম॥
—চণ্ডীদাসের পদাবলী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব, গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন রচনা করিয়াছেন; তাঁহার কৃষ্ণ ত্রিদশের নাথ, নারায়ণ এবং তাঁহার রাধা লক্ষ্মীস্বরূপিণী। কিন্তু পদকর্তা চণ্ডীদাস খাঁটি সহজিয়া, তাঁহার মতে রাধাকৃষ্ণ মনুষ্যদেহে বিরাজিত, স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের ভিতর দিয়াই তাহার অনুভূতি হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাস কাম-উদ্দীপনার কবি, তিনি পার্থিব প্রেমের প্রচারক, তাঁহার প্রেম কাম-বিজড়িত, কাজেই আত্মসুখে তাহার পরিতৃপ্তি, দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ। আর পদকর্তা চণ্ডীদাস স্বর্গীয় প্রেমের কবি ; তিনি সহজ কথায়, সরল ও মধুর ভাষায় প্রেমের বৈচিত্র্য

ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই বিচিত্রতার মধ্যে অনেক স্থলে দৈহিক মিলনের কথা থাকিলেও তাহার ভিতর দিয়া এমন এক মাধুর্য্য ও দিব্য ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা একেবারেই উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাস পদ-কর্তা চণ্ডীদাস অপেক্ষা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনেক মালমশলা সংগ্রহ করিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাণস্পর্শী সরল ও সহজ ভাষায় পদকর্তা চণ্ডীদাস যেরূপ দিব্য প্রেমের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেরূপ এক-খানি ছবিও দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে বীভৎস অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার সহিত পদকর্তা চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কোনো তুলনাই হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কাম ও ভোগের একটা উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়; তিনি প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু পদ-কর্তা চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের প্রেম অপার্থিব, কামগন্ধহীন; সে প্রেমে ত্যাগ আছে, ভোগ নাই; সঙ্কোচ আছে, প্রগল্ভতা নাই; স্থৈর্য্য আছে, চঞ্চলতা নাই; আন্তরিকতা আছে, ছল-চাতুরী নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাস সম্প্রদায়বিশেষ বা দেশবিশেষের কবি, আর পদ-কর্তা চণ্ডীদাস জনসাধারণের কবি, বিশ্বের কবি। পদকর্তা চণ্ডীদাসের রাধিকা নিষ্কাম প্রেমের সজীব মূর্তি। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় এবং রাধিকা প্রেমময়ী। তাঁহার পদাবলীতে রাধা-ভাব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই রাধা-ভাবেরই মূর্তিমান্ বিগ্রহ।

এই সকল কারণে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসকে দুই ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। তাঁহারা দুই জন না হইলে তাঁহাদের লেখায় কখনো এরূপ পার্থক্য দেখা যাইত না।

পদাবলী–সাহিত্যে চণ্ডীদাস

পদাবলী-সাহিত্যে আমরা তিন জন "চণ্ডীদাস" দেখিতে পাই—(১) বড়ু, (২) দ্বিজ ও (৩) দীন। উপাধি বা উপনাম অনুসারে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের—বড়ু চণ্ডীদাস প্রায় দেড় শত বৎসরের এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে এই তিন "চণ্ডীদাস" আবির্ভূত হইয়া পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত বহু পদ পদাবলী-সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে। আবার অনেক নগণ্য পদকর্তারা নিজেদের রচনা চণ্ডীদাসের নামে চালাইতেন। কীর্তনীয়ারাও পদের গৌরববৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পদকর্তার ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম জুড়িয়া দিতেন। ভণিতায়

বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি উপনাম নির্ব্বিচারে ব্যবহৃত হইত। অনেকে আবার চণ্ডীদাসের রচিত পদের ভাব ও ভাষা স্থানে স্থানে কিছু কিছু অদলবদল করিয়া নিজেদের রচনা বলিয়া চালাইতেন। এইরূপে আসলে নকলে তাল পাকিয়াছে। কাজেই ভণিতায় কেবলমাত্র নাম দেখিয়াই কোনো পদবিশেষকে স্বনামপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসবিশেষের বা পদকর্ত্তাবিশেষের বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। এই সকল ভেজাল পদ হইতে খাঁটি পদ বাছিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সুনীতিবাবু ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদাবলী-সাহিত্য হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি চব্বিশটি পদ বাছিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদিত পুস্তকের নাম চণ্ডীদাস-পদাবলী; ১৩৪১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি তিন ভাগে বিভক্ত—[ক] বড়ু-চণ্ডীদাসের পদ, [খ] চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ ও [গ] দীন-চণ্ডীদাসের পদ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের শেষে পরিশিষ্ট দেওয়া হইয়াছে। সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় পদাবলীর পরীক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে কষ্টিপাথররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ. মহাশয়ের সম্পাদকতায় দীন-চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলির বিস্তর পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। মূল পুঁথিতে ৪২১টি এবং পরিশিষ্টে ১১টি—মোট এই ৪৩২টি পদ আছে। পুস্তকের ভূমিকা এবং পদের টীকা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অতি মূল্যবান্। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এখনো দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিচার হয় নাই। জানি না, কবে কোন শুভ লগ্নে তাঁহার পদাবলীর বিচার আরম্ভ হইবে?

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহারাজ শিবসিংহের রাজপণ্ডিত ছিলেন। দরভঙ্গা জেলার অন্তর্গত জারৈল (জরাইল) পরগণায় বিস্ফী গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে উক্ত গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতিঠাকুর। তাঁহার একটি পদে আছে—

জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
রহতহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহা ভাণ॥
—পদসমুদ্র।

গণপতিঠাকুর শিবসিংহের জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; উক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতা মহারাজ গণেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মিথিলায় প্রবাদ, বিদ্যাপতি শিবসিংহ অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। ২৯৩ লক্ষ্মণ সম্বৎ (ল-সং) অর্থাৎ ১৩২৪ শকাব্দে (১৪০২ খৃষ্টাব্দে) শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। কাজেই শিবসিংহের ২৪৩ ল-সং অর্থাৎ ১২৭৪ শকাব্দে এবং বিদ্যাপতির ২৪১ ল-সং অর্থাৎ ১২৭২ শকাব্দে (১৩৫০ খৃষ্টাব্দে) জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতি নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দুই কবির মিলন হইয়াছিল। এই বিষয়ে এবং চণ্ডীদাসের সময়সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যাপতি একটি পদে লিখিয়াছেন,—

বেকতেও চোরি গুপত কর কতিখণ বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি চিরেজীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

বিদ্যাপতি কবি বলিতেছে, প্রকাশ্য চুরি কতক্ষণ গোপন করিবে? যুগপতি গ্যাসদেব (ইহা) অবগত আছেন, (তিনি) চিরজীবী হইয়া জীবিত থাকুন। আমাদের মনে হয়, এই গ্যাসদেব বাঙ্গালার পাঠান বংশীয় শাসনকর্ত্তা সুলতান গিয়াস্-উদ্দিন। তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পারস্যদেশে সীরাজের প্রসিদ্ধ কবি হাফিজ সময় সময় তাঁহাকে কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি ১৩৮৯ হইতে ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কাজেই বিদ্যাপতি উক্ত কবিতাটি ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীতে নসির শাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নসির শাহ ১৪৪২ হইতে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তখন বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অতএব বিদ্যাপতি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে এরূপ একটা অনুমান করা যায়।

বিদ্যাপতি সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। অনেক শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি মহারাজ শিবসিংহের আদেশে পুরুষপরীক্ষা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শৈবসর্ব্বস্বসার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিভাগসার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ

প্রণয়ন করেন। তা-ছাড়া তিনি মৈথিলী ভাষায় হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের বহু পদ লিখিয়াছেন। তিনি অবহট্ট (<অপভ্রষ্ট) ভাষায় কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তিপতাকা নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থেই কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত এবং কতক খাঁটি অপভ্রংশ রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 'কবিশেখর' ও 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন। তিনি শিবের উপাসনা করিতেন। একটি পদে তিনি লিখিয়াছেন,—

আন চান গান হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভক্ত বছল প্রভু বান মহেসর
ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥

চন্দ্র, অন্য দেবগণ, কমলাসন হরি সকলকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। বাণ মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল—ইহা জানিয়া তোমার সেবা করিয়াছি। মিথিলায় বিদ্যাপতি শৈব কবি বলিয়াই পরিচিত। তবে তাঁহার গোঁড়ামি ছিল না। তাঁহার উদার হৃদয়ে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার নিকট হরি এবং হর একই, কোনো প্রভেদ ছিল না। তিনি তাহাদিগকে একই মহাশক্তির বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—

এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খণহি কৈলাস॥
ভণই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
ও নারায়ণ ও শূলপাণি॥

বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি বলিয়া জানে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণের গান শুনিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সময়ে তাঁহার পদ এদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্যদেব এই সকল পদ শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেন। নিম্নলিখিত পদটি মহাপ্রভুর বড় প্রিয় ছিল,—

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ অছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি-পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল॥
ভণই বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔষধে ন রহ বেয়াধি॥

কীর্ত্তনে ভাবসম্মিলনের এই উচ্চ শ্রেণীর পদটি শুনিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইত। প্রেম-ভক্তির জগতে উক্ত পদের সমকক্ষ আর কোনো পদ আছে বলিয়া আমরা জানি না।

বিদ্যাপতির উপমা অতি সুন্দর। প্রত্যেক কথায়ই তাঁহার উপমা। তাঁহার একটি পদে আছে—

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনি
বেকত কয়ল সুমেরু॥

চঞ্চল অঞ্চলে বক্ষঃস্থল ঢাকিতে যাইয়া পয়োধরের অর্দ্ধেক দেখা গেল, যেন বায়ুদ্বারা মেঘ অপগত হইয়া সুমেরু প্রকাশ করিল। আর একটি পদে রাধা নীল শাড়ি পরিয়া নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে চলিলেন, যেন ভ্রমরী মসিতে ডুবিয়া গেল;—

অম্বর সকল বিভূষণ সুন্দর
ঘনতর তিমির সামরী।
কেহু কতহু পথ লখহি ন পারলি
জনি মসি ডুবলি ভমরী॥

বিদ্যাপতির রচনায় যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের পারিপাট্য এবং বর্ণনার বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোনো বৈষ্ণব কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় না। বর্ষাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, বিরহ ও মিলনের বর্ণনা এক একটি সজীব চিত্র। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর।

বিদ্যাপতি আদিরসে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পদে আদিরসের স্পর্শ আছে সত্য, কিন্তু রচনাচাতুর্য্যে কদর্য্যতা বা অশ্লীলতা ঢাকা পরিয়াছে। বিদ্যাপতির—

হসি হসি পহু আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
আচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনি ভেটল সুমেরু॥

যব নীবিবন্ধ খসাওল কান।
তোহর শপথ হম কিছু যদি জান॥
রতি চিনে জানল কঠিন মুরারি।
তোহর পুণে জীয়ল হম নারী॥
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধু রাই।
ন কহ সুধামুখি গেল চতুরাই॥

এই পদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে।
রাধার বদনে কাহ্নাঞি কইল চুম্বনে॥
কুচ কনককমলকোরক আকার।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার॥
তখন পাইল কাহ্নাঞি যতেক হরিষে।
তাহাক বলিতেঁ নারী সকল বএসে॥
নাগর সুন্দর কাহ্নাঞি কৈল নখাঘাত।
তখণে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত॥
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন॥
ধীরেঁ ধীরেঁ পরসিআঁ রাধার জঘন।
সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞিঁ মানিল জীবন।
রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতিসুখে॥
জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী।
তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী॥

পদটি তুলনা করুন।

বিদ্যাপতি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার পদে জয়দেবের রচনার ভাব, এমন কি কথা পর্য্যন্ত মিলিয়া যায়।

পরিশেষে আমরা কবি-কণ্ঠে নিনাদিত মাধবের বন্দনা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে॥

মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিন্দে গমাওল
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রস রঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয় আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥
ভণই বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে
তুয় বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা॥

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় নহেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ও মিথিলার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এক কালে মিথিলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল; উভয় দেশের একই সংস্কৃতি ছিল। বাঙ্গালায় লক্ষ্মণাব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মিথিলায় তাহা এখনো চলিতেছে। বিদ্যাপতির সময়ে বহু বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় যাইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেন এবং অনেক মৈথিল ছাত্রও বাঙ্গালায় আসিয়া নানা শাস্ত্র পাঠ করিতেন। সে যুগে বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার খুবই সাদৃশ্য ছিল। প্রাদেশিকতা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার পার্থক্য ছিল না। কাজেই তখনকার কালে বাঙ্গালীর পক্ষে মৈথিলী ভাষা বুঝা বা মিথিলাবাসীদের পক্ষে বাঙ্গালা বুঝা তেমন একটা কঠিন কাজ ছিল না। উভয় দেশের অধিবাসীরাই অতি সহজে এবং অতি অল্প আয়াসেই উভয় দেশের প্রচলিত ভাষা বুঝিতে পারিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালী ছাত্রেরা মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিতেন। তাঁহাদের অনেকেই মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির পদ শিখিয়া আসিতেন এবং দেশে তাহা প্রচার করিতেন। এইরূপে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাপতির পদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের মুখে বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির এমন অনেক পদ আছে যাহাতে তাঁহার ভাব ও ভাষা আছে কি নাই, আছে মাত্র ভণিতা। যে বিদ্যাপতির পদের

মাধুর্য্যে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস মধুময় হইয়াছে, কীর্ত্তনীয়ারা যাঁহার পদাবলী ভক্তি-সহকারে কীর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালীদিগকে বহুকাল হইতে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার পদাবলী শুনিয়া মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইত, যাঁহার পদাবলীর অনুকরণে বঙ্গদেশীয় মহাজনেরা অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন, সেই বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে তত দিন তাঁহার অমৃতময় বাণী বাঙ্গালা সাহিত্যে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় সুললিত কলকল রবে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে এই দুঃখদৈন্যপূর্ণ ও অশান্তির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মরজগতে অপরিসীম আনন্দ ও চির-বাঞ্ছিত শান্তি দান করিবে। তাঁহার পদাবলীতে বাঙ্গালা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীরা তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়াছে।

আমরা পদাবলী-সাহিত্যে যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাই, তাঁহারা কোনো বিশেষ চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি নহেন। গায়ক নিজের ও শ্রোতার রুচি অনুসারে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নোতুন রূপ দিয়াছেন। এই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কীর্ত্তনীয়াদের তৈরী। চণ্ডীদাস অনেকেই থাকিতে পারেন এবং আছেনও সত্য, কিন্তু সাহিত্যে আমরা যে চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাই, তিনি কীর্ত্তনীয়াদের চণ্ডীদাস। তাঁহারা পদ-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই চণ্ডীদাস সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই সাহিত্যের চণ্ডীদাস বড়ু, দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। বিদ্যাপতির বাড়ী মিথিলা, কিন্তু বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়ারা তাঁহাকে নিজের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য তাঁহার পদের ভাব ও ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সুতরাং সাহিত্যের বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর বিদ্যাপতি, মৈথিল বিদ্যাপতি নহেন।

আদিকবিকঙ্কণ

চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বাঙ্গালা দেশে বহু মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়। মঙ্গল-কাব্যের চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। মঙ্গল-কাব্যের চণ্ডী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবী, ধর্ম্মের শক্তি, বাসলী বা বাশুলীর রূপান্তর। এইজন্যই বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীপূজার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই চণ্ডীদাস ছাড়া তখনকার যুগে আর একজন কবি চণ্ডীদেবীর মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম আদিকবিকঙ্কণ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই কবির নাম করিয়াছেন*। তাঁহার রচিত কোনো গ্রন্থ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা তাঁহার নামমাত্রই পাইয়াছি। এই কবিই বোধ হয়, চণ্ডীমঙ্গলকারগণের অগ্রদূত; কারণ, তিনি 'গীতের গুরু' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কার চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়।

* গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীগুরু কবিকঙ্কণ।

বিজয়গুপ্ত

বিজয়গুপ্তের নাম বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে তাঁহার রচিত মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ পঠিত হইয়া থাকে। বিজয়গুপ্ত বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামটি গৈলা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত স্বীয় জন্মভূমির পরিচয় দিয়াছেন এইরূপ,—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥—৫পৃ.।

বিজয়গুপ্তের পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী এবং স্ত্রীর নাম জানকী। তিনি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ॥

অন্যত্র,—

জানকী নাথের বাণী শুন দেবী ব্রহ্মাণি
দাস করি রাখিবা চরণে॥

বিজয়গুপ্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। স্বপ্নে মনসা দেবী বলিলেন,—

গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও।
মনে ভয় না করিও দেখিয়া নাগ হাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী॥
মোর পায় ভক্ত তুমি সেবক প্রধান।
স্বপ্ন উপদেশ বলি না করিও আন॥
আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥—৩পৃ.।

পরিশেষে দেবী বলিলেন,—

কহিলাম সকল কথা যে জানি বৃত্তান্ত।
গীত নহে জানিও এই মনসার মন্ত্র ॥
যথা গীত শুনি আমি তোমার রচিত।
সত্য করি কহি তথা যাইব নিশ্চিত ॥
মোর গীত শুনি যাহার হৃদয় কৌতুক।
মোর বরে হবে তার মহাধন সুখ ॥
অহঙ্কারে মোর গীত করে উপহাস।
মোর কোপে হবে তার সবংশে বিনাশ ॥

দেবতার স্বপ্নাদেশে কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা প্রাচীন কালের একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয়গুপ্তের মত বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য বহু কবি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মনসার অপর নাম বিষহরী, পদ্মা বা পদ্মাবতী। তিনি নাগকুলের অধিশ্বরী, নাগমাতা। শক জাতি নাগকুল বা নাগবংশ নামে পরিচিত ছিল, কারণ তাহাদের উপাস্য দেবতা ছিল নাগ। তাহারা সূর্য্যকেও পূজা করিত। তাহারা সূর্য্যের কিরণকে নাগ কল্পনা করিত এবং সেই সূর্য্যই পরে ফণিভূষণ শিবে পরিণত হইয়াছেন। তাহারা সূর্য্যকেই শিব বলিত। তারপর বৈদিক রুদ্র সূর্য্যদেবতা শিবের সঙ্গে মিলিত হন। আবার শকদিগের দেবী সূর্য্যের শক্তি তবিতা হিন্দু তন্ত্রে ত্বরিতা হইয়া দুর্গার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন এবং সেই দেবীই বৌদ্ধ তন্ত্রে বৌদ্ধশক্তি তরিতা বা তবিতারূপ ধারণ করিয়া পরবর্ত্তী সংস্করণে মনসাদেবীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুরা বৌদ্ধদেবী তরিতাকে মনসারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পূজা করে। কাণা হরিদত্ত মনসাদেবীকে হিন্দু দেবদেবীর একাসনে বসাইতে পারেন নাই। বিজয়গুপ্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ক্রমে হিন্দুরা এই বৌদ্ধদেবীকে বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল—মনসাদেবী হিন্দু সমাজে চল হইয়া গেলেন। যাঁহারা মনসাপূজার নিন্দা করিতেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য মনসামঙ্গল রচিত হইল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়গুপ্ত মনসাদেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য মনসামঙ্গল রচনা করিলেন। পুথিখানি পদ্মাপুরাণ নামে পরিচিত।

পদ্মাপুরাণে পুথির রচনাকাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক ॥—৫ পৃ.।

১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে হুসেন সাহার আমলে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল

রচনা করেন। হুসেন সাহা ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন*। ১৪০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ পুঁথির রচনাকাল ধরিলে হুসেন সাহার রাজত্বকালের সঙ্গে মিল থাকে না। নয় বৎসরের গোলমাল।

অন্যত্র—

শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় সামী ॥
নিদ্রায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন।
হেন কালে বিজয় গুপ্ত দেখিল স্বপন ॥

*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিদ।
হরি হরি নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ ॥
প্রভাত সময়ে প্রকাশ হইল দশ দিশা।
স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা ॥
হরিনারায়ণ ভাবি নির্ম্মল করে চিত।
রচিতে আরম্ভ করে মনসার গীত ॥—৩-৫পৃ.।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া দেখা যায়, ১৪০৬ শকাব্দে শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা-পঞ্চমী তিথি ছিল না, সেই বৎসর মনসা-পঞ্চমী তিথি সোমবারে ছিল। সুতরাং উল্লিখিত দুইটি কারণে ১৪০৬ শকাব্দ মনসামঙ্গল পুথির রচনাকাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

আর একখানি পুঁথিতে আছে—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতিতিলক ॥

১৪১৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হুসেন সাহার রাজত্বকালে মনসামঙ্গল রচিত হয়। এই রচনাকালের সঙ্গে হুসেন সাহার সময়ের কোনো গরমিল হয় না। কাজেই ১৪১৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমানের অনুকূল আর একটি বিষয়ের উল্লেখ

---

* The Oxford History of India (1923), p. 264.

করা যাইতে পারে। বিজয়গুপ্তের রচিত মনসামঙ্গলের মধ্যে কোথাও চৈতন্যদেবের নাম পাওয়া যায় না। উক্ত পুঁথিতে মহাপ্রভুর নাম না থাকায় ইহা অনুমিত হয় যে, যখন মনসা-মঙ্গল রচিত হয়, তখন চৈতন্যদেব অবতার বলিয়া পূজিত হন নাই। বিজয়গুপ্তের পুথির পর যে সকল মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেক পুঁথিতেই দেববন্দনা মধ্যে চৈতন্যদেবের নাম দেখা যায়। মহাপ্রভু ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার নাম দিগন্তবিশ্রুত হয় এবং তিনি অবতার বলিয়া পূজা পাইতে থাকেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনাকালে দেশবাসী তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে পূজা করেন নাই বলিয়া মনে হয় না কি? এসম্বন্ধে প্যারীবাবু মনসামঙ্গলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই উভয় শকের মধ্যে কোন্‌টী ঠিক তাহা স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এই সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, বিজয়গুপ্ত রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, যে বৎসর বিজয়গুপ্ত গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসর মনসা-পঞ্চমী তিথি রবিবারে ছিল। দিনচন্দ্রিকা মতে জ্যোতির্গণনা দ্বারা দেখা যায়, ১৪০৬ শকে ১২ই শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পরে মনসা-পঞ্চমীর আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৪১৬ শকাব্দে মনসা-পঞ্চমী ২২শে শ্রাবণ রবিবার কয়েক দণ্ড পরে আরম্ভ হয় এবং তৎপর দিবস ২৩ শে শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি করে; রবিবার পূর্ব্বাহ্নে পঞ্চমীর আরম্ভ হয় না। কিন্তু তৎপর দিবস সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত তাহার স্থিতি থাকে। এই জন্য মনসাপূজা পর দিবস কর্ত্তব্য হয়; কিন্তু মনসা-পঞ্চমী রবিবারেই প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং ১৪০৬ শকের পরিবর্ত্তে ১৪১৬ শকই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।"

ইহা হইতে অনুমান হয়, কবি বিজয়গুপ্ত উল্লিখিত কালের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। মনসা যে খাঁটি হিন্দু সমাজের দেবতা নন তাহার প্রমান পদে পদে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের উপাখ্যান হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে,হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী চান্দসদাগর প্রথমে মনসাপূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার আরাধ্য দেব শিব এবং আরাধ্যা দেবী পার্ব্বতী। তিনি মনসাকে দেবতা বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। তিনি এই দেবীকে নানাভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনসাকে 'লঘুজাতী কাণী' বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাঁহার ঘটে লাথি মারিয়াছেন, হেতালের বাড়ি দিয়া তাঁহার কাঁকাল কুঁজা করিয়াছেন। তবুও মনসা চান্দের পূজা পাইতে একান্ত ইচ্ছুক। তিনি দুই হাত পাতিয়া চান্দের নিকট ফুল ও জল মাগিয়াছেন। কিন্তু চান্দ মনসার সকল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন চান্দের উপর মনসার রাগ হইল। তিনি চান্দের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। মনসার রাগে চান্দের ছয় পুত্র নষ্ট হইল, চৌদ্দ ডিঙ্গা জলমগ্ন হইল, তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল, কিন্তু মনসা তাঁহাকে প্রাণে মারিলেন না; কারণ চান্দ মরিলে যে তিনি হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় হন।

চান্দ সকল বিপদকেই অগ্রাহ্য করিলেন। ছয় পুত্রের শোকে কাতর চান্দ লক্ষীন্দরকে* পাইয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিবাহের রাত্রিতে লোহার বাসরঘরে মনসার সাপ লক্ষীন্দরকে দংশন করিল। মাতা সোনেকা পুত্র শোকে পাগল; কিন্তু চান্দের চিত্ত এই অসহ্য বিপদেও বিক্ষুব্ধ হইল না। তিনি স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

> মিছামিছি বলি কেন তোমার আমার।
> যে দিছিল লক্ষীন্দর সে নিল আর বার॥
> শোক তাপ এড় প্রিয়ে ভাব মহেশ্বর।
> তুমি আমি জীয়া থাকি শতেক বৎসর॥—২৩৯ পৃ.।

চান্দকে আরো অনেক কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই নত হইলেন না, হেন্তালবাড়ি ছাড়িলেন না। কাজেই বিরোধও মিটিল না। পরে চণ্ডী মধ্যস্থ হইলেন! তিনি চান্দকে ডাকিয়া বলিলেন—

> পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
> একই মুর্ত্তি দেখ সব না ভাবিও পর॥
> যেই জন দেখ বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
> কুবের বরুণ দেখ চন্দ্র দিবাকার॥
> যেই জান ভগবতী সেই বিষহরী।
> পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি॥—২৭৫ পৃ.।

তখন চান্দ সদাগর নিমরাজি হইয়া উত্তর করিলেন—

> দক্ষিণ হস্তে পূজি আমি ত্রিদশ কোটী দেবা।
> বাম হস্তে দিব পুষ্প মার্গে দিব সেবা॥—২৭৫ পৃ.।

তার পর—

> পদ্মা দুর্গা সম দেখি নয়নগোচর।
> তবে সে পূজিব পদ্মা বলিল সত্বর॥—২৭৫ পৃ.।

সেই সময়ে—

> এক রথে পদ্মা দুর্গা অন্তরীক্ষে স্থিতি।
> দুই জন দেখে চান্দ একই মুরতি॥
> দোহার সমান বেশ দেখিয়া তখন।
> চিনিতে না পারে চান্দ পদ্মা কোন জন॥

---

* লক্ষ্মীন্দ্র > লক্ষীন্দর—স্বরভক্তি।

দক্ষিণেতে দশভূজা বামে পদ্মাবতী।
করযোড় করি চান্দ করিলা মিনতি ॥
এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই।
এতকাল মোরে কেন না বলিলা আই ॥
যেই মুখে বলিয়াছি লঘু জাতি কাণী।
সেই মুখে ভস্ম দেও জগত জননী ॥
পূজিতে প্রতিজ্ঞা করে চান্দ সদাগর।
হরিষ হইল বড় পদ্মার অন্তর ॥—২৭৪ পৃ.।

ভগবতী দুর্গা মনসা ও চান্দের বিবাদ মীমাংসা করিলেন। চান্দ ভক্তির সহিত মনসা দেবীর পূজা করিলেন। তাঁহার পূজায় তুষ্ট হইয়া মনসা তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তখন হইতে মনসা হিন্দুসমাজে দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন। মনসাপূজা প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে মনসাপূজার ধূম চলিল।

চান্দ সদাগরের পিতার নাম ছিল বিজয় সাধু, চম্পক নগরে তাঁহার বাড়ী এবং বণিক্ কুলে তাঁহার জন্ম। কিন্তু তাঁহার জীবনীতে অলৌকিক আখ্যায়িকার সমাবেশ দেখিয়া অনেকেই তাঁহার ব্যক্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে পৌরাণিক কল্পনার সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন। দীনেশবাবু চান্দ সদাগরকে কাল্পনিক পৌরাণিক ব্যক্তি বলিতে চান। তিনি লিখিয়াছেন, "কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচলী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার আরম্ভও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং অলৌকিক কাহিনীর উপর এমনই একটি কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন যে তাহা সত্যের আকার ধারণ করিয়া আমাদের বিভ্রম জন্মাইতেছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এবিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। মনসাদেবীর সঙ্গে বিবাদে চাঁদসদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথা ও পৃথিবী-বাসিগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ দুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার ইটকে গাথিয়া উঠান হইয়াছে।" কিন্তু আমরা চান্দ সদাগরের ব্যক্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ করি না। সংস্কৃত পুরাণের মত এই সকল পুরাণেও ইতিহাসের সহিত কল্পনার, মানুষের সহিত দেবতার, লৌকিকের সহিত অলৌকিকের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। যেখানে চান্দ মনসার সঙ্গে বিবাদ করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, অথবা যেখানে পুত্রবধূ বেহুলা স্বর্গে যাইয়া নৃত্য গীতাদিদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত স্বামীর জীবন লাভ করিয়াছে, এই সকল ঘটনা অলৌকিক বলিয়া অনৈতিহাসিক হইলেও পুস্তকের স্থানে স্থানে যে সত্য কথা আছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ভারতচন্দ্র তদীয় মানসিংহ কাব্যে চাঁদবেণে ও চম্পক নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান-দান ॥
রহে চম্পানগর ডাহিনে কত দূর।
চাঁদবেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥

এই বর্ণনাটি কবির নিছক কল্পনা, ইহাতে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য নাই, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে রাজি নহি। ভারতচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি মানসিংহের বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া জগন্নাথ-দর্শনের বর্ণনায় একজন কাল্পনিক পৌরাণিক ব্যক্তি ও তাঁহার বাসস্থানকে অমর করিয়া নিজের কাব্যে গাঁথিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না। সুতরাং চান্দ সদাগরের জীবনীতে অলৌকিক কাহিনী সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাঁহার ঐতিহাসিক সত্তা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না।

বেহুলার চরিত্র অতুলনীয়। ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সহনশীলতা ও সতীত্বগৌরব তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বামীই তাহার দেবতা। তাহার আদর্শ ছিল—

"পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ ॥"

স্বামীর সঙ্গে তাহার মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়া। এই অল্প সময়ের পরিচয়েও বেহুলা সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া স্বামীর মৃত দেহকে বরণ করিয়াছিল এবং কামনা করিল—

জন্মে জন্মে যদি মুই পূজম শঙ্কর।
শত জন্মের পতি যেন হয় লক্ষীন্দর ॥—২৩৫ পৃ.।

প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর শবের পাশে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাঙ্গালার সতীলক্ষী অন্ধকারে ভাসিয়া চলিল। পথে অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সতীত্ব-গৌরব ঘাতপ্রতিঘাতে মলিন হয় নাই। বেহুলা সতীত্বের জোরে সকল বিপদ অতিক্রম করিল। তাহার যাত্রা জয়যুক্ত হইল। স্বামীর মৃত দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল।

বেহুলার চরিত্র প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয়। কিন্তু একটি স্থলে একটু ত্রুটি দেখা যায়। বেহুলা শ্বশুরকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়াছে সত্য, কিন্তু একটি স্থানে বলিয়াছে—

সর্ব্ব নষ্ট হইল দুষ্ট শ্বশুরের বাদে।—২৬০ পৃ.।

পদ্মাপুরাণে মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। চান্দ সদাগর একজন বিরুদ্ধপক্ষীয় ভক্ত। মনসা দেবী তাঁহাকে আপনার অনুরক্ত করিয়া লইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি চান্দ

:সদাগরকে স্পষ্টই জানাইয়াছেন, তিনিই ত্রিদশের ঈশ্বরী, তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন কিন্তু চান্দ তাঁহার পূজা করিতে নারাজ। তিনি মনসার প্রতি কত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, কত গালি দিয়াছেন, কিন্তু শেষে মনসারই জয় হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মনসাবিরোধী চান্দকে পরাজিত করিয়া একেবারে মনসার অনুচরদের সামিল করিয়া ফেলা হইয়াছে।

বিজয়গুপ্ত সাধক ও কবি। তিনি যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে দেখিতে পাই, তিনি মনুসংহিতার একটি শ্লোকের হুবহু তর্জ্জমা করিয়াছেন। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

এই শ্লোকের সঙ্গে মনসামঙ্গলের—

তিন কালে স্ত্রীলোক নহে স্বতন্ত্র।
শিশুকালে রক্ষিতা বাপ থাকে সেই ঘর।
যুবা কালে রাখে স্বামী প্রাণের ঈশ্বর।
বৃদ্ধকালেতে থাকে পুত্রের অভ্যন্তর ॥—এই কয়টি পঙ্‌ক্তি তুলনা করুন।

মনসামঙ্গল কাব্য বাইশ পালায় বিভক্ত। পুঁথিখানি গানের পালা, কাজেই সুরের খাতিরে কবি অনেক স্থলেই ছন্দের বাঁধা-ধরা নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। এই কাব্যমধ্যে কোনো কোনো স্থানে অশ্লীল রসিকতার উল্লেখ আছে। এখানে একটি নমুনা দিলাম,—

হাসি বলে শূলপাণি আয়ো ভাণ্ডিতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াইব লেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান আয়োর উড়িবে প্রাণ
লজ্জা পাইয়া সবে যাবে ঘরে ॥—২৬ পৃ.।

এই পুঁথিতে 'হাসন্তি', কহন্তি', 'করতি' প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া পদ এবং 'জীম' (=জীবিত থাকিব), 'পেম'(=পান করিব), 'কম'(=কহিব), 'সম' (=সহিব), 'লম' (=লইব), 'দিম' (=দিব) ইত্যাদি ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের বিস্তর প্রয়োগ দেখা যায়। গ্রন্থখানিতে আমরা বহু আরবী শব্দ পাই। যেমন,— মোছদ্দী (<মুচ্ছদ্দী=ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী), কাজি, মোকাম (<মুকাম=বাসস্থান), গোলাম, ওয়াশীল (=আদায়), বাকী, আমল ইত্যাদি। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত অনেকগুলি শব্দ এই পুঁথিতে পাওয়া যায়। যথা,—পিড়া (=ঘরের দাওয়া), জাল (=বা), কুইয়া (=গলিত পচা), পেঁচাল পাড় প্রভৃতি।

কাণা হরিদত্ত ছাড়া কবি কর্ণপুর, বর্দ্ধমান দাস, পুরুষোত্তম দাস প্রভৃতি কয়েক জন মনসার গীত লেখকের নাম গ্রন্থমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই নামগুলি পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

বিজয়গুপ্তের পুঁথিতে মুসলমানের অত্যাচারকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে;—

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা ॥
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে ॥
—৫৮-৬০ পৃ.।

অন্যত্র,—

হারামজাদ হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটী খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা ॥
—৬১ পৃ.।

বিজয়গুপ্তের সময়ে বিবাহে কন্যাপণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যার বিবাহে পণ লওয়া হইত। তখন পূর্ব্ববঙ্গে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ঢাকাই কাপড় বাহির হয় নাই। বড় বড় লোকেরা চটের কাপড় পরিতেন। সেই সময়ে দেশের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

দশম স্তবক

বৈষ্ণব-যুগ

ভারতবর্ষে চারিটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে—(১) শ্রীসম্প্রদায়, (২) হংসসম্প্রদায়, (৩) রুদ্রসম্প্রদায় এবং (৪) ব্রহ্মসম্প্রদায়। শ্রীসম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, রামানুজ এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। হংসসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নিম্বার্ক, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ প্রচার করেন। রুদ্রসম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য। ব্রহ্মসম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের একটি শাখা।

বৈষ্ণব সমাজে ভাগবতপুরাণই অমূল্য গ্রন্থ। সকল সম্প্রদায়ই এই পুরাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পুরাণে রাধিকার নাম নাই, কিন্তু ভাগবত উজ্জ্বলরসে রাধিকার রসময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে রাধিকা ও তাঁহার সখীগণের নাম পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের সেবাই সহজধর্ম্মের মূল। সহজিয়ারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবদের চিন্তার ধারা অন্যরূপ। তাঁহারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য* স্বীকার করিয়া তাঁহারই প্রকাশস্বরূপ সকল জীবের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম—

> জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
> ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল রসতত্ত্ব এবং রসতত্ত্বের মূল আশ্রয় ও বিষয়। ভক্ত অর্থাৎ যে সাধক রসের ভোক্তা, তাঁহাকেই আশ্রয় বলা হয় এবং ভগবান্ অর্থাৎ যিনি রসের মূল তিনিই বিষয়। এজন্য বৈষ্ণবেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই রস বলিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লী সপ্তম অনুবাকে বৈষ্ণবদের এই উক্তির মূল দেখিতে পাই—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি।"

জীব আনন্দের ভোক্তা এবং ভগবান্ আনন্দের উৎস। কাজেই ভগবান্ আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাবনের গোপীগণের অহৈতুক স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। রাসলীলায়

*গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভগবানের মাধুর্য্য-ভাবের উপাসক, ঐশ্বর্য্য-ভাবের নহে।

তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার এবং গোপীরা জীবাত্মার প্রতীক। আবার রাধিকা সেই গোপী-সমষ্টির প্রতীক। গোপীগণের পুঞ্জীভূত রূপ রাধিকাতে পরিব্যক্ত। রাধিকা মধুর প্রেমের উচ্চ আদর্শ, স্বর্গীয় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ আধার এবং বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমেরই পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাঁহার অন্তরে কোনপ্রকার কামনা নাই। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র আকর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার প্রেমের একমাত্র অধিকারী। তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না; তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে অনুরাগিণী, কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী। রাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে ধন,মান, যশ ও কুল উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি নিজের সুখসাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি দিয়াও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদনে সচেষ্ট। বৈষ্ণবধর্ম্মে রাধিকার চরিত্রই একমাত্র আদর্শ ও কাম্য। রাধা-ভাবই বৈষ্ণবদের সাধনমার্গের প্রধান অবলম্বন। সাধক আপনাকে রাধা ভাবিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি মনে করিয়া উপাসনা করে।

অমরকোষের মতে রস আট প্রকার। যথা,—(১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, (৫) বীর, (৬) ভয়ানক, (৭) অদ্ভুত, এবং (৮) বীভৎস। সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ শান্ত ও বাৎসল্য এই দুইটিকেও রসের তালিকায় স্থান দিয়াছেন। আলঙ্কারিক ভোজরাজ প্রেমকেও রস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মতে রস এগারো প্রকার। হিন্দু আলঙ্কারিকদের মতে এই বিভিন্ন রস আনন্দেরই রূপান্তরমাত্র। বৈষ্ণবেরা রসতত্ত্বের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রস বারো প্রকার। যথা,—(১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য, (৫) মধুর, (৬) হাস্য, (৭) অদ্ভুত, (৮) বীর, (৯) করুণ, (১০) রৌদ্র, (১১) বীভৎস এবং (১২) ভয়ানক। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি মুখ্য এবং দ্বিতীয় সাতটি গৌণ রস।

> শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
> কৃষ্ণ ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
> হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
> পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
> পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
> সপ্তগৌণ আগন্তুকে পাইয়ে কারণে॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

মুখ্য রসগুলির প্রথমেই শান্ত, শান্তের পর দাস্য, দাস্যের পর সখ্য, সখ্যের পর বাৎসল্য এবং বাৎসল্যের পর মধুর রস। মধুর রসই পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি রসের পরিণতি। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি রস পর পর রসকে বর্দ্ধিত করিয়া মধুর রসে শেষ হয়। এই রস লইয়াই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হয়।

শান্তরসে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা। ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় বলিয়া এবং ভগবানকে ঐশ্বর্য্যময় বলিয়া মনে করে। ভগবানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা

ও বিশুদ্ধভক্তি এবং তৃষ্ণাত্যাগই এই রসের উপাদান। ভগবান্ ভক্তের নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে সেবার অধিকার দান করেন। এইরূপে শান্তভক্ত দাস্যভক্ত হয়।

দাস্যরসে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্বন্ধ—ভৃত্য ও প্রভু। ভৃত্য যেমন সর্ব্বদা প্রভুর সেবা করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট, তেমনি ভক্তও সর্ব্বদা ভগবানের সেবা করিয়া ভগবানকে সুখী করিতে চেষ্টা করে। ভগবানের সেবা ও পূর্ণ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই এই রসের প্রধান ধর্ম্ম। নানাপ্রকার সেবাদ্বারা ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মে এবং তখন ভগবান্ ভক্তকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন।

সখ্যরসে ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন। এই রসে ঐশ্বর্য্য নাই, ভেদজ্ঞান নাই। ভগবান্ ভক্তের সখা ও সহচর। উভয়েই উভয়ের সখ্য-প্রেমে বন্দী। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে খেলা করে, কৌতুক করে, আনন্দ করে। ভক্ত তাহার সখার নিকট প্রাণ খুলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে, কোথাও একটুও সঙ্কোচ থাকে না। এই রসের প্রধান ধর্ম্ম বিশ্বাস। ইহাই গাঢ় হইয়া বাৎসল্যরসে পরিণত হয়।

বাৎসল্যরসে বিশ্ব-পিতা পুত্র এবং বিশ্ব-পালক পাল্য। এই রসে ভক্ত ভগবানকে আপনার সন্তান বলিয়া মনে করে। মাতা যেমন নিজের সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আবার সময় সময় শাসনও করেন, ভক্তও ভগবানকে স্নেহ ও শাসন করে সেইরূপ। এই রসে ভক্ত ভগবান্ যে ঐশ্বর্য্যময়,ইহা একেবারে ভুলিয়া যায় এবং ভগবানকে প্রাণাধিক প্রিয় আপন শিশু সন্তানের মত দেখে। সন্তানের মত তাঁহাকে সে আদর ও যত্ন করে। বাৎসল্য রসের মূল মমতা। এই রসের পরিপাকে মধুর রসের উৎপত্তি।

মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রসে ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না, এবং কিছুই মনে থাকে না। সে সর্ব্বজীবে ভগবান্ দেখে। ভগবানের আনন্দের জন্য তাঁহার চরণে নিজের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সে নিজেই পরম আনন্দ লাভ করে। ভগবানের চিন্তাই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শয়নে স্বপনে তাঁহার চিন্তাই সার। ভগবানের চিন্তায় হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াও তাহার শান্তি নাই, পাছে প্রিয়তমকে মনোমন্দিরে আট্‌কাইয়া রাখিতে না পারে, পাছে প্রিয়তমের প্রেমময় মূর্ত্তি বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই রসে ভক্ত আপনাকে পত্নী ভাবিয়া এবং ভগবানকে পতি মনে করিয়া ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণই এই রসের প্রধান ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় সাতটি গৌণ রস প্রথম পাঁচটি মুখ্য রসেরই অন্তর্গত। পাঁচটি মুখ্য রসের উপভোগেই তাহাদের বিকাশ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্ত্রী-ভাবে ভগবানের সেবার বিধি আছে। ভগবানের কাছে স্ত্রী-পুরুষে কোনো প্রভেদ নাই সত্য, তবে স্ত্রী-ভাবে ভজন করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস সহজে ও সুস্পষ্টরূপে

বিকশিত হয় বলিয়াই স্ত্রী-ভাবে ভগবানের সেবা করা প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক নিউম্যান (Newman) সাহেবের মত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—"if thy soul is to go on into higher spiritual blessedness,it must become a woman."

বৈষ্ণবেরা বলেন, রতি বা ভাবের উন্মেষ না হইলে সুন্দরের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন রতি বা ভাব বিকশিত হয় না।

প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান্॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তব কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২য় পরিচ্ছেদ।

উপাসনা দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের উপাসনা করাকে সকাম এবং নিঃস্বার্থভাবে প্রেমময় সুন্দরের উপাসনা করাকে নিষ্কাম উপাসনা বলে। নিষ্কাম উপাসনার সঙ্গে সকাম উপাসনার তুলনা হইতে পারে না। স্বার্থের সঙ্গে সকাম উপাসনার সম্বন্ধ, তাহা বাসনা-বিজড়িত। কাজেই এই উপাসনায় আত্মদান নাই, আছে শুধু আত্মপ্রীতি। কিন্তু নিষ্কাম উপাসনায় সাধক তাহার আরাধ্য দেবতা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ভগবানের চরণে আত্মদান করিয়াই সে পরিতৃপ্ত। ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াই সে আত্মসমাহিত হয়। বৈষ্ণবদের মতে নিষ্কাম উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আর্থিক বা পার্থিব কোনো প্রকার লাভের আশায় রসময় শ্রীকৃষ্ণের উপসনা করেন না। ভালবাসার জন্যই তাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে ভালবাসিয়াই, যে তাঁহারা ভূমানন্দ লাভ করেন;—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীকবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

[হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা কবিত্বশক্তি, এ কিছুই চাই না। জন্মে জন্মে যেন ঈশ্বরের প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর।]

বৈষ্ণব ভক্তের নিকট তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ও প্রেমময়, তিনি মধুর এবং তাঁহার সকলই মধুর,—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবদের দান যথেষ্ট। সহজিয়াদের পর লোকিক দেবতার উপাসকগণ এবং লৌকিক দেবতার উপাসকগণের পর বৈষ্ণবেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদান যোগাইয়াছিলেন। এই যুগের সাহিত্য রাধাকৃষ্ণের লীলারসে ভরপুর।

বৌদ্ধ যুগের অবসানে বৌদ্ধদের অনুকরণে দেবতাদিগের মাহাত্ম্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়। যখন বঙ্গদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ মঙ্গলসঙ্গীতে মুখরিত, তখন চৈতন্যদেব ভক্তি-ব্যাকুল কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী গাহিয়া এদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তারপর হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোত বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিতে থাকে।

চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার সময় পবিত্র নবদ্বীপধামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরের (উপাধি 'ভ্রমরবর') ভয়ে উড়িষ্যা হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র অধ্যয়নের জন্য শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শচীদেবীর গর্ভে দশটি সন্তান জন্মে। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বেই জগন্নাথ মিশ্রের আটটি সন্তানের মৃত্যু হয়। নবম গর্ভজাত সন্তান বিশ্বরূপ ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দশম গর্ভের সন্তান চৈতন্যদেব। তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর। মৃতবৎসা জননীর সন্তান বলিয়া তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকা হইত এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণের জন্য অনেকেই তাঁহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। তাঁহার গুরুদত্ত নাম চৈতন্য।

শৈশবে বিশ্বম্ভর বড়ই চঞ্চল ও দুরন্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাস্নান করিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেন। তাঁহারা এই সকল দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া জগন্নাথ মিশ্রের নিকট বিশ্বম্ভরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন ;—

ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহো বোলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
কেহো বোলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি।
কেহো বোলে মোর লই পলায় উত্তরী॥
কেহো বোলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥

কেহো বোলে মোর পৃষ্ঠে দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পড়িবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল॥

—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৪র্থঅধ্যায়।

বালিকাগণ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিলে বিশ্বম্ভর তাহাদের উপরও দৌরাত্ম্য করিতে ছাড়িতেন না। তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া—

শচী সম্বোধিয়া সভে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরাণি নিজ পুত্রের করণ॥
বসন করয়ে চুরি বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয় করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।
কেহো বোলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥

—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

বাল্যকালে বিশ্বম্ভর নানাপ্রকার পাগলামি করিলেও বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ও একাগ্রতা ছিল। অতি শৈশবেই তিনি অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। নয় বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভরের পৈতা হইয়াছিল। এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি ব্যাকরণ, ন্যায়, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়নকালে তাঁহার সহিত বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর কিছু দিন বাড়ীতে থাকিয়া বিশ্বম্ভর অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুনিলেন, সর্পাঘাতে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর মাতৃভক্ত বিশ্বম্ভর মাতার আদেশে সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কুড়ি বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভর একটি টোল স্থাপন করিলেন। তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য প্রতিভার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। দেশবিদেশ হইতে বহু ছাত্র তাঁহার

টোলে পড়িতে আসিল। এই সময়ে তিনি অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরও তাঁহার পাণ্ডিত্যের কাছে হার মানিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর পিতৃপিণ্ডদান করিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণের মুখে বিষ্ণুপাদপদ্মের মাহাত্ম্যকীর্তন শুনিয়া এবং শ্রীপাদপদ্ম দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর হইয়াছিল;—

চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে॥

—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১২শ অধ্যায়।

এই স্থানে ঈশ্বরপুরী নামে এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত বিশ্বম্ভরের পরিচয় হইয়াছিল। কিছুদিন পর বিশ্বম্ভর এই ব্রহ্মচারীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গিগণকে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা সকলে গৃহে চলিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাইব না। আমি আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে মথুরায় যাইব।"

প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা।

—চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ১২শ অধ্যায়।

কিন্তু সঙ্গিগণ তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন।

বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজ গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥

—চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ১২শ অধ্যায়।

নবদ্বীপে আসিয়া তিনি সাধনভজন ছাড়া আর কোনো কাজই করিতেন না। কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণের চিন্তাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল। এইরূপে ক্রমশ সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১৪৩১ শকাব্দে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) চব্বিশ বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভর গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

তাঁহার গুরু তাঁহার চৈতন্য নাম দিয়াছিলেন। দীক্ষার পর চৈতন্যদেব কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ধর্মবন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। চৈতন্যদেব কয়েক দিন নীলাচলে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পরে আবার পুরুষোত্তমে গিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেও যাতায়াত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে ভ্রমণকালে চৈতন্যদেব নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের শেষজীবন বৃন্দাবনে ও পুরুষোত্তমে কাটিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে নানা প্রকার অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। এই সকল গল্পের ঐতিহাসিক কোনো মূল্য নাই। ভক্তগণ অদ্ভুত কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল গল্প রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে এসম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আষাঢ় মাসে একদিন কীর্ত্তন করিবার সময় চৈতন্যদেবের পদ ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে ক্ষত হয়, দুই এক দিনের মধ্যে বেদনা খুব বাড়িয়া যায়, শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন এবং সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিনে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল (১৪৫৫ শকাব্দ বা জুলাই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)।

বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবকে পূর্ণব্রহ্ম এবং স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ—

অবতরি ভূমণ্ডলে চৈতন্যরূপেতে।
শ্রীরাধিকাভাবকান্তি-প্রেম আস্বাদিতে॥

—রসসার, ৬ পৃ.।

অন্যত্র,—

জন্মে নারায়ণ শচীগর্ব্ভেতে আসিয়া।
ভাবকান্তি রাধিকার ভূষণ করিয়া॥

—রাগময়ীকণা, ১১ পৃ.।

অমৃতরসাবলীর ৪ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

অকৈতব প্রেমবস্তু নহে আস্বাদন।
এই লাগী শচীগর্ভে লভিল জনম॥

কিন্তু কেহ চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি অত্যন্ত রাগ করিতেন। রামানন্দ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করাতে—

প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড।

চৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণের মুক্তির জন্য যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥—নারদীয়পুরাণ।

[কলিতে কেবলই হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম, ইহা ছাড়া অন্য কোনো গতি নাই।]

যখন স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের আদেশ বাঙ্গালার হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, যখন বাঙ্গালার হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম, পরকীয়া প্রেম ও বামাচার শাক্তধর্ম্মের মাঝখানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল এবং অপরদিকে যখন ইস্‌লামধর্ম্ম এই সকল ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালায় প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রেমবন্যায় বাঙ্গালা দেশ এমন কি, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানও প্লাবিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ চৈতন্যদেবের উদ্ভাবিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। নর্ত্তন এবং নাম-কীর্ত্তনই এই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এই ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। জাতিনির্ব্বিশেষে আপামর জনসাধারণ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী। ইতর জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনেও এই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। এই ধর্ম্মে উচ্চ জাতিও নীচ জাতির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে। চৈতন্যসম্প্রদায়ে সকলেই, এমন কি, ব্রাহ্মণগণও 'দাস' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন।

চৈতন্যদেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবগণ তাঁহার লীলাবিষয়ক নানা পদ ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহারা এই সকল পদ ও গ্রন্থ জনসাধারণের বোধগম্যের জন্য সংস্কৃত ভাষায় না লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য, তাঁহার ধর্ম্মমত এবং তাঁহার পারিষদবর্গের জীবনী অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি পদকর্ত্তারা বহুসংখ্যক পদ এবং অনেক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যদেব ও তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা চৈতন্যদেবের পারিষদবর্গ ও পদকর্ত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অদ্বৈতাচার্য্য

অদ্বৈতাচার্য্যের আসল নাম কমলাকর চক্রবর্ত্তী। তিনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাউড় হইতে নবগ্রামে এবং নবগ্রাম হইতে পরে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। এই নাড়িয়াল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'নাড়াবুড়া' বা 'নাড়া' নামে ডাকিতেন। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী এবং স্ত্রীর নাম সীতাদেবী। চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কয়েক জন বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহার জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন ;—

(১) বাল্যলীলাসূত্র—লাউড়-নিবাসী কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন।

(২) অদ্বৈতমঙ্গল—অদ্বৈতাচার্য্যের মৃত্যুর কিছু দিন পর হরিচরণদাস এই গ্রন্থ রচনা করেন।

(৩) অদ্বৈতপ্রকাশ—ঈশাননাগর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়।

(৪) অদ্বৈতমঙ্গল—অদ্বৈতাচার্য্যের মৃত্যুর এক শ' বৎসর পরে শ্যামদাস এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন।

(৫) অদ্বৈতবিলাস—নরহরিদাস খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি।

নিত্যানন্দ

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম সুন্দরমল্ল, তাঁহার পিতার নাম হাড়াই ওঝা এবং মাতার পদ্মাবতী। তাঁহার বসুধা ও জাহ্নবী নামে দুই স্ত্রী ছিল। মাধাই নিত্যানন্দের কপালে ভাঙ্গা কলসীর কানা দিয়া আঘাত করিলে বৈষ্ণব ভক্ত নিত্যানন্দ রক্তাক্ত দেহে বলিলেন—

"ও ভাই মাধাই রে মাল্লি মাল্লি কল্লি ভাল।
তবু একবার চাঁদবদনে হরি বোল॥"

জগাই ও মাধাই দুই সহোদর। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগতে এমন কোনো দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা তাঁহারা করেন নাই। নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তগণের উপরও তাঁহারা নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁহাদের চরিত্রসম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

অন্নযোনি বিচার নাহিক দুই ভাই।
স্নানসন্ধ্যাবিবর্জ্জিত জগাই মাধাই॥
গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ কত জত।
বলে ছলে গুরু পত্নী হরে কত শত॥
গোমাংস শূকরমাংস করে সুরাপান।
ধর্ম্মকথা না শুনে না করে গঙ্গাস্নান॥
শিশুসব আছড়িঞা মারে শিলাপাটে।
কত কত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে॥
গলে যজ্ঞসূত্র বান্ধা জেন সিংহনাদ।
উত্তম বধির প্রায় মহাপরমাদ॥
উদ্‌ভ্রান্ত জ্ঞান নাহি মদিরাভক্ষণে।
ঘূর্ণিতলোচনচারু পূর্ণ শক্রাসনে॥
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই।
বুকে বাঁশ দিঞা কারো সর্ব্বস্ব নেই॥

লোচনদাসও তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥
দেবগুরুব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনে বধে না যায় ঘর॥
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীবধ শত শত।
লিখিতে না পারি পাপ করিয়াছে কত॥

—চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড, ১১২-১৩ পৃ.।

পরে এই দুই মহাপাপীও চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রূপ ও সনাতন দুই সহোদর ছিলেন। হোসেন শাহ এই দুই ভাইকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে সনাতনের জন্ম হইয়াছিল এবং ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামী ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহাদের পিতার নাম কুমারদেব। যশোহর জেলার ফতেহাবাদ নামক স্থানে তাঁহাদের মূল বাড়ী ছিল। পরে তাঁহারা গৌড়ের নিকটে রামকেলী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া রূপ ও সনাতনের সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দুই ভাই রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন ও তাঁহাদের সহোদর বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিবাদের বিশ্লেষণ করিয়া বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া আমাদের আলোচনার বাহিরে পড়িয়াছে। সনাতনগোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত, রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও লঘুভাগবতামৃত এবং জীবগোস্বামীর সর্ব্বসংবাদিনী, সংকল্পকল্পদ্রুম, ভাগবতসন্দর্ভ ও ষট্‌সন্দর্ভ বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

উদ্ধারণ দত্ত ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। তিনি আটচল্লিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ছয় বৎসর পুরুষোত্তমে এবং ছয় বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

যশোহর জেলার (কাহারো কাহারো মতে রাঢ় দেশে) বুঢ়ন গ্রামে যবন হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মুসলমানগণ তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করেন। হরিদাস মুসলমান হইয়া হরিনাম জপ করিতেন বলিয়া মুলুকপতির আদেশে মুসলমান পাইকগণ তাঁহার পিঠে নির্দ্দয়ভাবে কশাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু হরিদাস হরিনাম ছাড়িলেন না। পাইকগণের এই দুর্ব্যবহারেও তিনি তাহাদের অনিষ্টচিন্তা করেন নাই। তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

"এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ সভার অপরাধ॥"—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।

হরিদাস সর্ব্বদা চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকিতেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নবদ্বীপনিবাসী জগদানন্দ পণ্ডিত চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কথন॥
দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল॥—আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ।

জগদানন্দ চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তিনি সময় সময় মহাপ্রভুর আদেশে শচীদেবী ও ভক্তগণকে প্রভুর কুশলসংবাদ জানাইবার জন্য নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিতেন। যে চারি জন ভক্ত চৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন, পণ্ডিত জগদানন্দ তাঁহাদের মধ্যেএকজন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

নিত্যানন্দগোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারি জনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে।—মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নরহরি দাস ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দদাস হোসেন শাহের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহাদের পিতার নাম নারায়ণ সরকার। নরহরি দাস চৈতন্যদেবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের প্রধান ভক্ত ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে নরহরি দেহ-ত্যাগ করেন।

মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যভাগবতে আছে—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥

নবদ্বীপে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের পাশের বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি চৈতন্য-দেবের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনিও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে মুরারি গুপ্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমুরারি গুপ্ত গুপ্তপ্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥

১৪৩৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের জীবনী সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থ মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে গদাধরমিশ্রের জন্ম হইয়াছিল। তিনি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে স্বহস্তলিখিত একখানি শ্রীমদ্ভাগবত উপহার দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের দেহান্তরের এক বৎসরের মধ্যে গদাধর মিশ্র দেহ-ত্যাগ করেন।

গোবিন্দদাসের কড়চা

স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় প্রথমে গোবিন্দদাসের কড়চা জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদাসের কড়চা প্রকাশিত হয়। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন ও জয়গোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গোবিন্দদাসের কড়চার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে; অনেক প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কড়চার মৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য দীনেশবাবু ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু কোনটিই নির্ভরযোগ্য নহে। যুক্তিগুলি একেবারে খাপছাড়া! সম্প্রতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় তাঁহার 'গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য' নামক পুস্তকে তাঁহাদের মতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তাঁহার যুক্তি অকাট্য। তবে সমালোচনা মাঝে মাঝে বড় কড়া হইয়াছে, একটু মোলায়েম হইলেই ভাল হইত।

প্রথম প্রশ্ন উঠে, কড়চার রচয়িতা কে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে দুই রকম প্রমাণের আশ্রয় নিতে হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। বাহিরের প্রমাণ অর্থাৎ সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনো গ্রন্থে লেখকের এবং তাঁহার রচিত পুস্তকের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় কি না এবং ভিতরের প্রমাণ পুস্তকের ভাব

ও ভাবা লইয়া। গোবিন্দদাস এবং তাঁহার কড়চা সম্বন্ধে বাহিরের কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের একটু পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল। তথাকথিত কড়চায় গোবিন্দদাস আত্মপরিচয় দিয়াছেন এইরূপ—

বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নিগুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥
চৌদ্দশ তিশ শাকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাই চাই॥

—করচা, ১পৃ.।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এবং প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীতে গোবিন্দের নাম আছে সত্য, তবে ইনি যে গোবিন্দ কর্ম্মকার ইহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। চৈতন্যভাগবতে পাঁচজন গোবিন্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু জাতিতে কামার এমন কোনো গোবিন্দের নাম উক্ত গ্রন্থে দেখা যায় না। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম পাওয়া যায়। ভক্তিভূষণ মহাশয় এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "জয়ানন্দের পুথিতেও এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। দীনেশবাবু বলিতেছেন,— 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইখানি চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম রহিয়াছে।' এই পুথিদ্বয়ের অপর কোনস্থানে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম বা পরিচয় আছে কি না, এবং এই দুইখানি ভিন্ন এইস্থানে বা অপর কোন স্থানে এই পুথি আর পাওয়া গিয়াছে কি না, এবং পাওয়া গেলে তাহাতে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম ও পরিচয় আছে কি না,—সে সম্বন্ধে দীনেশবাবু কিছুই বলেন নাই। অথচ বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা করিতে হইলে এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

অপর পক্ষে, আমরা সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং আরও ২।১ টি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রাচীন পুথিতে 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' স্থলে 'গোবিন্দানন্দ আর' পাঠ দেখিয়াছেন।

কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যখন মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গমন করেন, তখন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে নিত্যানন্দ ও মুকুন্দের সহিত এক গোবিন্দ মহাপ্রভুর অনুগামী হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দের পরিচয় জয়ানন্দের গ্রন্থে নাই। তবে জয়ানন্দের দুইখানি পুথিতে তাঁহার নাম 'গোবিন্দ কর্ম্মকার', এবং অন্য কয়েকখানিতে 'গোবিন্দানন্দ আর' পাওয়া যাইতেছে।

এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে জয়ানন্দের যে গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে যে গোবিন্দ গিয়াছিলেন, তাহার নাম এই ভাবে লেখা আছে—

'মুকুন্দদত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গা পার॥'

কিন্তু তাহার পরে আছে—

'মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হইল গৌরচন্দ্র।'

সন্ন্যাসের পর আছে—

'শান্তিপুরে গেল গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।
নবদ্বীপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইঞা॥'

অবশেষে পুরীতে যাইয়া—

'সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিংহদ্বার তলে।'

এখানে শেষের তিনটি পয়ারে আমরা 'গোবিন্দানন্দ' পাইতেছি। সুতরাং প্রথম পয়ারেও 'গোবিন্দ কর্ম্মকার' না হইয়া 'গোবিন্দানন্দ আর' হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আবার প্রথমে তিনটি পয়ারে 'মুকুন্দ ও গোবিন্দানন্দ' নামদ্বয় এক সঙ্গে আছে। জয়ানন্দের গ্রন্থের আরও কয়েক স্থানে ও চৈতন্যভাগবতেও 'মুকুন্দ ও গোবিন্দ' একত্রে পাইতেছি।" আমরা ভক্তিভূষণ মহাশয়ের মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি। গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের রচিত কড়চার কথা আমরা কোনো গ্রন্থে দেখিতে পাই না।

এখন ভিতরের প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কড়চাখানি পড়িয়া মনে হয়, পুথিখানির লেখক আধুনিক যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কড়চার অনেক স্থলেই আধুনিক রচনার আভাস পাওয়া যায়। যে গোবিন্দকে তাঁহার স্ত্রী শশিমুখী 'নিগুণে মূরখ' বলিয়া গালি দিয়াছে, সেই মূর্খ গোবিন্দদাসের পক্ষে মার্জ্জিত ভাষায় নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

গোবিন্দ কর্মকার নামে যে একজন ভৃত্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একখানি কড়চা লিখিয়াছেন, ইহার কোনো প্রকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কড়চার হস্তলিপি সমস্তই যে জয়গোপাল গোস্বামীর নিজের হাতের লেখা তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, গোবিন্দদাসের কড়চা জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের রচিত।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতৃদেব পুস্তক-সম্পাদন কালে স্থানে স্থানে প্রাচীন জটিল শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি অন্যত্র আবার লিখিয়াছেন, "হয়ত কখন কোন কীটদষ্ট ছত্রাংশ লুপ্ত হওয়াতে তাহা তিনি পূরণ করিয়াছেন।" জয়গোপাল গোস্বামী যে গোবিন্দদাসের কড়চা রচনা করিয়াছেন, ইহা দীনেশবাবু ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় সোজাসুজি স্বীকার করিলেই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইত। কিন্তু দীনেশবাবু ও গোস্বামী মহাশয় জাগ্রৎ-অবস্থায় ঘুমের ভান করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদিগকে জাগানো অত্যন্ত কঠিন। ভক্তিভূষণ মহাশয় শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে জাগাইতে পারিবেন কি না, সন্দেহ।

জয়ানন্দমিশ্র

বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে (১৫১১-১৫১৩ খৃষ্টাব্দে) জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদিনী। মৃতবৎসা মাতার পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম ছিল 'গুইঞা'। চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বর্দ্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে তাঁহার শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্রের 'গুইঞা' নাম ঘুচাইয়া 'জয়ানন্দ' নাম দিয়াছিলেন। জয়ানন্দ অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আদেশে রচনা করেন। গ্রন্থখানি নয়টি পালা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি বাসস্থান, তাঁহার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা, তাঁহার তিরোভাব প্রভৃতি বিষয় উক্তগ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জয়ানন্দ চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি বহু নূতন ও বাজে কথা জুড়িয়াছেন, স্থলবিশেষে আবার প্রকৃত ঘটনার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। অনেক স্থলে জয়ানন্দকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কাজেই চৈতন্যমঙ্গলকে খাঁটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আছে—চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে আম্বুয়া হইয়া কুলীনগ্রামে গিয়াছিলেন। তারপর তিনি দেবনদ পার হইয়া সেয়াখালা হইয়া তমলিপ্তে (তমলুকে) পৌছিয়াছিলেন। মন্ত্রেশ্বরকূলে বিষ্ণু দর্শন করিয়া সুবর্ণরেখা পার হইয়া তিনি বারাসতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারপর চৈতন্যদেব দাঁতন ও জলেশ্বর দিয়া আমরদাতে গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি বাঁশদা ও রামচন্দ্রপুর দিয়া রেমুণাতে গোপীনাথ এবং সরোনগরে সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিয়া বাঙ্গালপুর হইয়া ভদ্রকে গিয়াছিলেন। ভদ্রক হইতে তুঙ্গদা দিয়া চৈতন্যদেব জাজপুরে পৌছিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি বিরজা, নাভিগয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন। তারপর তিনি একাম্রবন বা ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের পথে তিনি পুরুষোত্তমপুর, পাটনা এবং কটকে রাজরাজেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর হইতে চৈতন্যদেব কপিলেশ্বর, কাঠতিপাড়া ও কমলপুর দিয়া এবং আঠারনালার সেতু পার হইয়া পুরুষোত্তমে গিয়াছিলেন। পথে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রকলা চৈতন্যদেবের সেবা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব পুরুষোত্তম হইতে দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তীর্থভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

মুসলমানগণ হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। জয়ানন্দ জলন্ত ভাষায় নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণের উপর পিরল্যাগ্রামবাসী মুসলমানগণের অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন ;—

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

—চৈতন্যমঙ্গল, ১১ পৃ.।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্র নামে আরো দুই খানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস

১৪২৯ শকাব্দে (১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনদাস এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ইষ্টদেব বন্দো মর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায় ॥—চৈতন্যভাগবত।

নিত্যানন্দের আজ্ঞায় বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে রচিত। ইহাতে চৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়, ইহাতে আদ্যলীলা অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে গয়াধামে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যখণ্ডে ষড়বিংশ অধ্যায়, ইহাতে মধ্যলীলা অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলন, সংকীর্ত্তন, জগাইমাধাইউদ্ধার প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। অন্ত্যখণ্ডে একাদশ অধ্যায়, ইহাতে অন্ত্যলীলার অর্থাৎ কেশবভারতীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ, শ্রীচৈতন্য নামধারণ, মথুরাযাত্রা ও পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, নীলাচলে গমন, গৌড়ে পুনরাগমন, সর্ব্বত্র নামপ্রচার, নীলাচলে পুনরায় গমন এবং তথায় অবস্থিতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মৃত্যু বর্ণিত হয় নাই, কারণ ভক্তগণ তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহাতে পুরাণাদি বহু গ্রন্থ হইতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষখণ্ড সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার বিস্তৃতির জন্য চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। কাজেই চৈতন্যচরিতামৃতকে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিলে অসঙ্গত হয় না।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের জন্মসময়ে নবদ্বীপের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপসম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায় ॥

অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥
রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থে কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে ॥
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥

—১ম খ, ২ অ.।

বৈষ্ণবগণ বিনয়ের অবতার। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বড় উদ্ধত ছিলেন। তিনি খাঁটি বৈষ্ণব হইয়াও ক্রোধে অত্যন্ত অধীর হইতেন। ধর্ম্মে তাঁহার খুব বেশী গোঁড়ামি ছিল। তিনি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারেন নাই বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব ভিন্ন সকল লোকের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে নাথি মার তার শিরের উপরে॥

বৃন্দাবনদাস দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খেতুরির মহোৎসবে গিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবত ছাড়া বৃন্দাবনদাসের রচিত নিত্যানন্দবংশমালা এবং অন্যান্য বহু পদ পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতার নাম সুনন্দা। ভগীরথ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি কবিরাজি করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। কৃষ্ণদাসের নয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল এবং ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাসের বয়স মাত্র চারি বৎসর ছিল। মাতাপিতৃহীন অসহায় এই দুইটি বালককে তাঁহাদের বিধবা পিসীমা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে কৃষ্ণদাস অতিসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বিবাহ করেন নাই।

যৌবনে কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের ভৃত্য মীনকেতন রামদাসের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পদব্রজে বহু কষ্টে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥—চৈ.চ., আদি, ১ম প.।

এই ছয় জন বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দলীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী এবং বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বৈতসূত্রকড়চা, স্বরূপবর্ণন, রাগময়ীকণা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল পুস্তক ছাড়া চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের অনুরোধে তিনি বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে নারি।
পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি॥

চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব সমাজে অতি আদরণীয় গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস, লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট মৌখিক বিবরণ অবগত হইয়া ১৫৩৭ শকাব্দে*(১৬১৫ খৃষ্টাব্দে) নয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে ১২০৫১ শ্লোকে চৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্ত করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ড সপ্তদশ পরিচ্ছেদে, মধ্যখণ্ড পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যখণ্ড বিংশ পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্ম ও বিশ্বের সম্বন্ধবিষয়ে বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মননয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্রমন॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রপরমাণ॥
—মধ্যলীলা, ৬ প.।

তারপর তিনি ভগবানের ব্যাখ্যা দিয়াছেন এইরূপ—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
—মধ্যলীলা, ৬প.।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা শেষ হইলে উক্ত গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে যাইতেছিলেন। পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণ এই গ্রন্থ অপহরণ করে। বৃন্দাবনে এই সংবাদ প্রেরিত হয়। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হন এবং শোকে প্রাণত্যাগ করেন।

---

* "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

লোচনদাস

লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস ১৪৪৫ শকাব্দে (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমান জেলার গুস্করা ষ্টেশনের পাঁচ ক্রোশ দূরে কোগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত এবং মাতামহীর নাম অভয়াদাসী। তিনি তদীয় চৈতন্যমঙ্গলে আত্মপরিচয় দিয়াছেন এইরূপ—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥

—শেষখণ্ড, ১১৯ পৃ.।

বাল্যকালে লোচনদাস ভালরূপে লেখাপড়া শিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাহি, নাহি মাতামহের পুত্র॥
যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে।
দুল্লিল লাগিয়া কেহো পড়াইতে নারে॥

—শেষখণ্ড, ১১৯ পৃ.।

তাঁহার মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত অতি কষ্টে তাঁহাকে সামান্য লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের শেষখণ্ডে আছে—

মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥

লোচনদাস চৈতন্যদেবের সহচর নরহরি দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরিদাস।
প্রণতিবিনতি করোঁ পুর মোর আশ॥—সূত্রখণ্ড।

অন্যত্র,—

মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল যো কথা।
নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
তাহার প্রসাদে যে বা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥—শেষখণ্ড।

লোচনদাস মন্ত্রগুরু নরহরিদাসের আদেশে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এই গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। তিনি লিখিয়াছেন,—

চারিখণ্ডে পুথি হৈল বৈষ্ণব কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥
সূত্রখণ্ডে আদ্য কথা অমৃতের খণ্ড।
জন্মাদি রহস্য কথা কহিল আদ্যখণ্ড॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুণার ঘর।
শেষখণ্ড কথা ছিল্ তিনখণ্ড পর॥
চারিখণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব কৃপায়॥
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥—শেষখণ্ড।

লোচনদাস যে মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পদেই ব্যক্ত করিতেছে—

শ্রীমুরারি গুপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ॥
লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্যচরিত্র।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র॥
শ্লোকবন্ধে কৈল গৌরগুণের কবিত্ব।
তাহাই হইল এবে সকলের সূত্র॥
শুনিয়া মাধুরীলোভে চিত্ত উতরোল।
নিজ দোষ না দেখিলু মন হৈল ভোল॥
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিল এখন।
দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম॥—শেষখণ্ড।

চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলাকে মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুবাদ বলা যাইতে পারে। লোচনদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত না হইলে কখনই এরূপভাবে অনুবাদ করিতে পারিতেন না। চৈতন্যমঙ্গলে যে আদৌ কবিত্ব নাই তাহা নহে। মাঝে মাঝে কবিত্ব সুন্দররূপে ফুটিয়া

উঠিয়াছে। সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মহাপ্রভুর প্রেমবিলাসের যে চিত্র লোচনদাস অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কবিনৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ;—

তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥
দীর্ঘ কেশ কামের চামর যিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গার্ভা॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥

সিন্দুরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥
অগোর কস্তূরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পারতেখে॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত তাহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥
ত্রৈলোক্যমোহিনীরূপ নিরীখে বদন।
অধরমাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥

ক্ষণে ভুজলতা বেড়ী আলিঙ্গন করে।
নবকমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদনাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥

হৃদয় উপরে থোয় না ছুয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে একমজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥—মধ্যখণ্ড।

লোচনদাস স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"আমার প্রাণভার্য্যা
নিবেদোঁ নিবেদোঁ নিজ কথা।
আশীর্ব্বাদ মাগোঁ
যত যত মহাভাগ
তবে গাব গোরাগুণ গাঁথা।"

চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া লোচনদাস দুর্ল্লভসার ও আনন্দলতিকা নামে আরো দুইখানি গ্রন্থ এবং বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন। ১৫১১ শকাব্দে (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে) ৬৬ বৎসর বয়সে লোচনদাস দেহত্যাগ করেন।

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥

এখনো এই কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ আছে এবং প্রতি বৎসর পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা ও মহোৎসব হয়।

যে বংশে জ্ঞানদাসের জন্ম হইয়াছিল তাহার নাম মঙ্গল বংশ। এইজন্য কেহ তাঁহাকে শ্রীমঙ্গল, কেহ মঙ্গলঠাকুর এবং কেহ কেহ মদনমঙ্গল বলিয়া ডাকিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন, "একসময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ মদন-মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাস পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীই তাঁহার পরিচায়ক। জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে 'গোস্বামী' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।" —বিশ্বকোষ।

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত। তিনি নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

জ্ঞানদাস বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পদ রচনা করেন। তিনি খেতুরীর উৎসবে গিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস ১৪৫৯ শকাব্দে (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। চিরঞ্জীব সেনের বাড়ী কুমারনগরে ছিল। তিনি চৈতন্যদেবের সহচর ও পরম ভক্ত ছিলেন। চিরঞ্জীব সেন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া উক্ত গ্রামে বাড়ী করেন। এই গ্রামে গোবিন্দ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের জন্ম হয়। পরে এই দুই ভাই স্বীয় জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া পদ্মাতীরে তেলিয়া-বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

গোবিন্দদাস চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, একবার গোবিন্দদাস কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া 'রাধাকৃষ্ণ' এই মন্ত্র জপ করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের লীলাময় বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন। তাঁহার পদগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত এবং অতিশয় মধুর। বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখা যায়। তিনি বিদ্যাপতির "প্রেম কি অঙ্কুর" পদটি পূর্ণ করিয়া শেষে "গোবিন্দদাস রসপূর" এই ভণিতাটি যোগ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ স্থলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতম্।"

এই সকল বাঙ্গালা পদ ছাড়া গোবিন্দদাস সংস্কৃত ভাষায় 'সঙ্গীতমাধব' নাটক এবং 'কর্ণামৃত' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহার গুরু তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস ১৫৩৪ শকাব্দে (১৬১২ খৃষ্টাব্দে) দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী মহামায়ার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহও পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। তিনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন।

গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রও 'কবিরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু ও পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায়ও অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

বলরামদাস

প্রেমবিলাসের রচয়িতা নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম বলরামদাস। বলরামদাস শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম এবং মাতার নাম সৌদামিনী। তিনি প্রেমবিলাসে আত্মপরিচয় দিয়াছেন এইরূপ,—

মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র, মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই॥
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই।
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা॥

শৈশবেই বলরামদাসের মাতাপিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কাজেই পুত্রের জন্য তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বলরামদাসের ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিলেন না। সুতরাং অনাথ ও দরিদ্র বলরামদাস দীক্ষাগুরু জাহ্নবী দেবীর গৃহে পালিত হন। তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরুর দয়া সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন,—

মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবী ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥

বলরামদাস বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রাদিও ছিল। তাঁহার একটি পদে আছে—

তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্রকলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরিপদে না করিনু আশ॥

প্রেমবিলাস ছাড়া বলরামদাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত। নিত্যানন্দের অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে 'বিজ্ঞবর' বলরাম দাস খেতুরির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি-রত্নাকরে এসম্বন্ধে আছে—

মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর।
পরমেশ্বর দাস বলরাম বিজ্ঞবর ॥

পরমানন্দ সেন

কাঁচড়াপাড়া গ্রামে পরমানন্দ সেনের বাড়ী ছিল। তিনি জাতিতে বৈদ্য। তাঁহার পিতার নাম শিবানন্দ সেন, মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত। পরমানন্দেরা তিন সহোদর, অপর দুই জনের নাম চৈতন্যদাস ও রামদাস। মহাপ্রভু পরমানন্দকে 'কবিকর্ণপূর' উপাধি দিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিতেন। বৈষ্ণবাচার-দর্পণে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আছে—

গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপুর।
কাঁচড়াপাড়ায় বাস চৈতন্যশাখা শূর ॥
বৃদ্ধ পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যার মুখে দিলা।
পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা ॥

পরমানন্দ সেন ১৪৯৪ শকাব্দে (১৫৭২ খৃষ্টাব্দে) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। ইহা ছাড়া তিনি চৈতন্যচরিত কাব্য, চৈতন্যশতক, কেশবাষ্টক, স্তবাবলী, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ* প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রেমদাস

প্রেমদাসের প্রকৃত নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। তাঁহার গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস এবং উপাধি 'সিদ্ধান্তবাগীশ'। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র এবং বাড়ী নবদ্বীপের গোকুলনগর বা কুলিয়া গ্রামে। তিনি বংশীশিক্ষায় আত্মপরিচয় দিয়াছেন এইরূপ,—

* "গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে।"—গদ্যপদ্যমিশ্রিত কাব্যের নাম চম্পূ।

কশ্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুল অবতংস
জগন্নাথ মিশ্র তার নাম।
তার পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ
তার পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥
তার ছয় পুত্র ছিলা তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম রাধাচরণ মধ্যম
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মনিষ্ঠ ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি নাম দিলা বিজ্ঞাবলী
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ ॥

প্রেমদাস ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীগোবিন্দের পূজারী নিযুক্ত হন। তিনি ১৬৩৪ শকাব্দে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ১৬৩৮ শকাব্দে (১৭১৬ খৃষ্টাব্দে) 'বংশীশিক্ষা' কাব্য রচনা করেন। বংশীশিক্ষায় এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে ॥
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষাগ্রন্থ করিল বর্ণন ॥

এই দুই গ্রন্থ ছাড়া প্রেমদাসের গৌরলীলা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক সুমধুর পদ আছে।

উদ্ধবদাস—ইহার আসল নাম কৃষ্ণকান্ত। ইনি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন।

শ্রীনিবাস—ইহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাখন্দি গ্রামে। ইহার পিতার নাম গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। ইনি পরম ভাগবত ছিলেন।

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—ইনি গদাধরের শিষ্য, বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। ইনি ছয় হাজার শ্লোকে 'রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

যদুনন্দন দাস—ইনি মালিহাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং দীক্ষাগুরুর আদেশে ১৫২৯ শকাব্দে (১৬০৭ খৃষ্টাব্দে) 'কর্ণানন্দ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের শেষ নির্য্যাসে আছে—

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদর্শ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুপাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস।
তার দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥

এই গ্রন্থ ছাড়া যদুনন্দনদাস রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি পদকর্ত্তা বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

বসু রামানন্দ—ইনি কুলীনগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র। ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

রায় রামানন্দ—ইনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। ইনি বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সাধারণ লোকে ইঁহাকে 'রাজা' বলিত। ইঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায়। মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রায় রামানন্দ পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি আর বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি খ., ১০ম প.।

রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। ইনি কবি ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী।
প্রভু যারে লজ্ঞিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥"

গৌরীদাস—ইনি শান্তিপুরের নিকট অম্বিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর অনুরক্ত অনুচর ছিলেন।

ধনঞ্জয়দাস—ইঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার ছাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে। ইঁহার পণ্ডিত উপাধি ছিল। ইনি প্রথমে বিলাসী গৃহস্থ ছিলেন। পরে গুরুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বৈষ্ণববন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে আছে,—

"বিলাস বৈরাগ্য বন্দ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥"

নয়নানন্দ দাস—ইনি গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথ মিশ্রের পুত্র। ইঁহার প্রথম নাম ছিল ধ্রুবানন্দ। গদাধর পণ্ডিত এই নাম বদলাইয়া নয়নানন্দ নাম রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ও গদাধর পণ্ডিত ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নয়নানন্দ মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে অনেক পদ রচনা করেন। ইনিও খেতুরির মহোৎসবে গিয়াছিলেন।

শ্যামানন্দ—ইঁহার বাড়ী দণ্ডেশ্বর গ্রামে। ইনি জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণমণ্ডল এবং মাতার নাম দুরিকা। কৃষ্ণমণ্ডল গৌড় হইতে উড়িষ্যায় যাইয়া দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে বাস করেন। শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি হৃদয়চৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

নরোত্তম দাস—ইনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুরের কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত গোপালপুরের রাজা ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম নারায়ণী। ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাজপুত্র হইয়াও নরোত্তম দাস ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই ইঁহার পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্ত কৃষ্ণানন্দ দত্তের পর রাজা হইয়াছিলেন। এই সন্তোষ দত্তই খেতুরিতে শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত—এই ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং এই উপলক্ষে সাত দিন ধরিয়া মহোৎসব হয়। বৈষ্ণবসমাজে ইহাই 'খেতুরির মহোৎসব' নামে প্রসিদ্ধ। এই উৎসবে বহু বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছিল।

নরহরি চক্রবর্ত্তী—ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। নরহরি চক্রবর্ত্তী 'ভক্তি-রত্নাকর' নামে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থে জীবগোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণের কথা, শ্রীনিবাস ও তাঁহার পিতা চৈতন্যদাসের বিষয়, বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ, খেতুরির মহোৎসব, শ্যামানন্দের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার, রাগরাগিণী প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আদিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বরাহপুরাণ, সৌরপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গোপালচম্পূ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, সঙ্গীতমাধব প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এবং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ছাড়া নরহরি চক্রবর্ত্তী গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীনিবাসচরিত, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গৌরচিন্তামণি, ছন্দঃসমুদ্র ও নরোত্তমবিলাস প্রণয়ন করেন।

বংশীবদন দাস—ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। ছকড়ি প্রথমে পাটুলী গ্রামে বাস করিতেন, পরে উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোলিয়ায় আসিয়া বাস করেন;—

শ্রীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলীয়ায়।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায় ॥—বংশীশিক্ষা।

এই স্থানে বংশীবদন দাস জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমদাস একটি পদে বংশীবদন দাসের যে সামান্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই—

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্টো নাম
মহাতেজা কুলীনসন্তান ॥
ভাগ্যবতী পত্নী তার রমণীকুলেতে যাঁর
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি কৃষ্ণের সরলা বাঁশী
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান ॥
দশমাস দশদিনে রাকাচন্দ্র লগ্নমীনে
চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥ ইত্যাদি।

বংশীবিলাস পুস্তকে বংশীবদনের পাঁচটি নাম দেখা যায়—

শ্রীবংশীবদন বংশী আর বংশীদাস।
শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ ॥
প্রভুর পঞ্চটী নাম গায় কবিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন ॥

বংশীবদন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এবং নবদ্বীপে প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্রাদিও জন্মিয়াছিল। বংশীবদন পদাবলী ছাড়া 'দীপান্বিতা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বংশীবদন দাসের পুত্র চৈতন্যদাসের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম, রামচন্দ্র দাস ও শচীনন্দন দাস। উভয়েই বিখ্যাত পদকর্ত্তা। শচীনন্দন দাস 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাসুদেব বা বাসুদেবানন্দ ঘোষ—ইনি শ্রীহট্ট জেলার বুড়নগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা তিন ভাই, অপর দুই জনের নাম, মাধব বা মাধবানন্দ ঘোষ এবং গোবিন্দ বা গোবিন্দানন্দ ঘোষ। ইঁহাদের পিতা কুমারহট্টে বাস করিতেন। ইঁহারা তিন ভাই উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিন ভাই-ই মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং পরম ভক্ত। তিন জনেই বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

শঙ্কর ঘোষ—ইনি নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনিও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

শিবরাম দাস—ইনি নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর দুই সহোদর। ইঁহাদের পিতার নাম গোবিন্দদাস ঠাকুর। ইঁহারা কাঁদড়ার মঙ্গল-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই জনই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা।

মোহনদাস—ইনি শ্রীনিবাসের শিষ্য এবং জাতিতে বৈদ্য। কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধে আছে,—

"শ্রীমোহনদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈতিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে ॥"

পরমেশ্বর দাস—কাউগ্রামে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি জাহ্নবীঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইনিও খেতুরির মহোৎসবে গিয়াছিলেন।

আমরা চৈতন্যদেবের সমকালিক ও পরবর্ত্তী কালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকর্ত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আরো অনেক রহিয়া গেলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহাদের আলোচনা করিতে গেলে পুস্তকের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে এবং পাঠকগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে ভাবিয়া এখানেই এই পর্ব্বটি শেষ করিয়া দিলাম।

গোবিন্দদাস কবিরাজ, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে, আসাম এবং উড়িষ্যায়ও ব্রজবুলিতে সাহিত্যে লেখা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা, মৈথিল-মিশ্রিত বাঙ্গালা; কাজেই বাঙ্গালার উপভাষা। মিথিলার সঙ্গে বাঙ্গালার সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। বাঙ্গালীরা নানাভাবে মিথিলার সঙ্গে সংবদ্ধ ছিল। এই দুই দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল। এক সময়ে বাঙ্গালা দেশ বিদ্যাপতি ও অন্যান্য মৈথিল কবির সঙ্গীতে মুখরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ মৈথিল কবিদের পদ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন এবং কীর্ত্তনের সময়ে তাহা আবৃত্তি করিতেন। কাজেই মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালার জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া, বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের পরিচয় হইয়াছিল। বস্তুত প্রাচীন বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার ভিতর প্রভেদ অতি সামান্য, কাজেই বাঙ্গালীরা অতি সহজেই মৈথিলীভাষা

বুঝিতে পারিত। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা করিবার সময়ে মৈথিল শব্দ ও রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাঙ্গালা রচনায় বহু মৈথিল শব্দ ও রূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এই দু'-এর সংমিশ্রণে ব্রজবুলির উৎপত্তি। ইহাতে আবার বহু হিন্দী শব্দও ঢুকিয়াছিল। ব্রজবুলি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। সুতরাং এই কৃত্রিম ভাষাও বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা এই কৃত্রিম ভাষায়ই ভাবের রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত পদ বাঙ্গালার শিক্ষিত এবং বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল।

'ব্রজবুলি' কথাটির অনেকেই অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 'ব্রজবুলি' ও মথুরা অঞ্চলের 'ব্রজভাষা' একই। কিন্তু আমরা তাঁহাদের মতে সায় দিতে পারিলাম না। কারণ ব্রজবুলির সহিত ব্রজভাষার কোনো সম্বন্ধ নাই, দুইটি একেবারে স্বতন্ত্র ভাষা। সুকুমার-বাবু ব্রজবুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই ভাষায় 'ব্রজবুলি' নামকরণ পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্যদিগের হস্তে এই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং বিস্তার হয়। সেই হেতু এই সাহিত্যের বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ—মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রধান অনুচর-দিগের স্তুতি ও বন্দনা—এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। শেষোক্ত বিষয়টী এই সাহিত্যের প্রধান-তম বিষয়বস্তু হওয়াতে এই ভাষার 'ব্রজবুলি' আখ্যা প্রচলিত হইল।"* ব্রজবুলি সাহিত্যে মহাপ্রভুর লীলা মুখ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা গৌণ বিষয়বস্তু। কাজেই সুকুমার-বাবুর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। আমাদের মনে হয়, 'ব্রজবুলি'র 'ব্রজ' শব্দটি নেওয়ারী 'বজে' (=তিব্বতী 'ব্রম্-জে' এবং সংস্কৃত 'ব্রহ্ম') শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'বজে' হইতে নকল সংস্কৃত 'ব্রজ' হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নেওয়ারী 'বজে' কথার মূলে সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—স্তোত্র বা বন্দনা। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। আর 'বুলি' শব্দটির অর্থ ভাষা। কাজেই 'ব্রজবুলি'র অর্থ স্তোত্রের ভাষা। মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুচরবর্গের স্তুতি ও বন্দনা এই ভাষায় রচিত হইত বলিয়া ইহাকে 'ব্রজবুলি' বলা হয়। চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্গালা ও মিথিলার প্রভাব নেপালে নোতুন যুগ সৃষ্টি করিয়াছিল। নেপালের রাজা জয়স্থিতি মল্লের রাজত্বকালে (১৩৮০—১৩৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালা ও মিথিলার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালা এবং মিথিলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি নেপালে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। প্রথমে নেপালের সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয় এবং পরে বাঙ্গালা, মৈথিলী ও নেওয়ারী ভাষায় সাহিত্য-চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু কোনো পুস্তকই এক ভাষায় লেখা হয় নাই,—কতক বাঙ্গালা, কতক মৈথিলী, কতক নেওয়ারী এবং কতক হিন্দী ছাঁদে লেখা। নেপালের কবিরা বাঙ্গালার জয়দেব ও চণ্ডীদাস এবং মিথিলার বিদ্যাপতির কবিতায়

*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ১৪৩—১৪৪ পৃ। —

অনুপ্রাণিত হইয়া বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। নেপালের অনেক রচনা যে মিথিলা ও বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই তিন দেশের ভাষায় যে আদান-প্রদান ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কাজেই নেওয়ারী অনেক কথা বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখন আমরা ব্রজবুলি ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

[ক] ব্রজবুলিতে তৎসম, অর্দ্ধতৎসম এবং তদ্ভব শব্দের বিস্তর প্রয়োগ পাওয়া যায়।

[খ] পদান্ত ও পদমধ্যস্থিত 'ক', 'গ', 'চ', 'জ', 'ত', 'দ', 'প', 'ব' প্রায়ই লুপ্ত হইয়া য়-কারে পরিণত হয়। যথা—কনয় (কনক), সায়র (সাগর), বয়ন (বদন) ইত্যাদি।

[গ] খ, ঘ, থ, ধ, ভ—ইহাদের স্থানে প্রায়ই হ-কার হয়। যেমন—সহি (সখী), মেহ (মেঘ), নাহ (নাথ), মাহ (মধ্য), শোহ (শোভা) প্রভৃতি।

[ঘ] ব্রজবুলিতে ষ-কারের খ-কারের মত উচ্চারণ ছিল। যথা—অখাড় (আষাঢ়), রোখ (রোষ) ইত্যাদি। মৈথিলী ভাষায়ও ষ-কারের এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে।

[ঙ] সংযুক্ত বর্ণের একটি লুপ্ত হয় এবং পূর্ব্বস্বর প্রায়ই দীর্ঘ হয় না। যথা—উতর (উত্তর), ছিন (ছিন্ন), পলব (পল্লব), শুধি (শুদ্ধি) ইত্যাদি।

[চ] সংযুক্ত বর্ণে শ, ষ অথবা স-কার থাকিলে তাহাদের প্রায়ই লোপ হয়। যেমন—নিশ্চল স্থলে নিচল, শাস্তি স্থলে শাতি প্রভৃতি। অনেক স্থলে শেষভূত বর্ণটি মহাপ্রাণতা প্রাপ্ত (aspirated) হয়। যথা—দিঠি (দৃষ্টি), নঠ (নষ্ট), পরথাব (প্রস্তাব), বিথার (বিস্তার) ইত্যাদি।

[ছ] ব্রজবুলিতে 'সব', 'সমাজ', 'কুল', 'গণ', 'নিকর', 'যূথ', 'জাল', 'বৃন্দ', 'মালা', 'পুঞ্জ', 'রাশি', 'মণ্ডলি' প্রভৃতি শব্দের সহিত সমাস করিয়া বহুবচন করিতে হয়।

[জ] ব্রজবুলিতে -ঈ (-ই) এবং -ইনী (-ইনি) এই দুইটি স্ত্রীপ্রত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—মুগধি, সাপী, মুগধিনি প্রভৃতি।

[ঝ] ব্রজবুলিতে প্রত্যেকটি কারকের এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি আছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিভক্তির লোপ হয়।

[ঞ] বর্ত্তমানকালে ক্রিয়াপদের উত্তর -অ,-ই,-উ,-এ,-সি,-হ,-হ প্রভৃতি প্রত্যয়, অতীত-কালে -ই,-উ,-ও,-অল (-ল) ইত্যাদি প্রত্যয়, এবং ভবিষ্যৎকালে -ব,-বি,-বে প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

[ট] ব্রজবুলিতে 'জনু' শব্দ উপমাসূচক অব্যয়। সুকুমারবাবুর মতে এই শব্দটি সংস্কৃত 'যৎ+নু' হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার এই ব্যুৎপত্তি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। প্রাকৃতের বিচিত্র ক্রমপরিবর্ত্তনফলে 'যৎ+নু' হইতে 'জনু' শব্দ উৎপন্ন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অর্থের দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'জনু' শব্দের মূল 'যৎ+নু' হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমাদের মনে হয়, এই শব্দটি সংস্কৃত 'জ্ঞা' (=জানা) ধাতু হইতে আসিয়াছে। সংস্কৃতে 'ইব' অর্থে 'জ্ঞা' ধাতুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'তস্য মুখং চন্দ্রং জানামি', অর্থাৎ তাহার মুখ চন্দ্রের মত। সংস্কৃত 'জ্ঞা' ধাতু হইতে উপমাদ্যোতক অব্যয় জনু, জনি এবং নই, নাই ও নাবই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (মৎপ্রণীত 'Studies in the Apabhramsa Texts of the Dakarava', ৮৭ পৃ. দ্রষ্টব্য)।

[ঠ] ব্রজবুলিতে অনেক ফার্সী শব্দ ঢুকিয়াছে। যেমন—আতর, আওয়াজ, কবজ, কম, কলম, কাগজ, কামান, কিতাব, কুলুপ, গুলাব, দোকান, নফর নালিশ, বাজার, সরম ইত্যাদি।

এইবার রসজ্ঞ পাঠকদিগকে গোবিন্দদাসের রচিত একটি পদ উপহার দিয়া এই প্রসঙ্গটি শেষ করিব। গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন—

যব হরি পাণি পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
কেশ পরায়লি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগয়ে নিদঁহ না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥
করইতে কোরে জোরি তনু বল্লরী
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জানি মুখ মোড়সি
জনু বিধু লুবধ চকোর॥
যব হোয়ে নাহ রত নিয়ত অবিরত
বারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দদাস কহ নাহ বহুবল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ॥

বর্ণানুক্রমিক নাম-সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২৭	;	এখানে কোনো চিহ্ন হইবে না।
১৩	২০	ভাষ	ভাষা
১৩	৩০	প্রবেশা	প্রবেশ
১৫	১	হইতেত	হইতে
১৫	৮	সত	সত্য
১৫	১৩	তাষায়	ভাষায়
২৬	১৭	<কক্থং <কাথং	>কক্থং >কাথং
২৬	২২	<কএ <কে	>কএ >কে
৩৪	১০	কিস্তু	কিন্তু
৫৮	১	'মহাল্ লাভঃ'	'মহান্ লাভঃ'
৬০	২২	'ট' বা 'ট'	'টঁ' বা 'ট'
৬৪	২৭	বর্ণর	বর্ণ
৭৬	১০	দিতেছি	এখানে 'দিতেছি' হইবে না।
১৪৮	৩	পাকিয়াছে	পাকাইয়াছে
১৫১	২৫	পরিয়াছে	পড়িয়াছে
১৫৯	২৯	লক্ষান্দ্র	লক্ষীন্দ্র
১৯৮	২০	অথববেদ	অথর্ববেদ